আমি বীরাঙ্গনা বলছি

অখণ্ড সংস্করণের ভূমিকা

আমি পাঠক সমাজের কাছে 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু দু'টি কারণে এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত রইলাম। প্রথমত, শারীরিক কারণ। বীরাঙ্গনাদের নিয়ে লিখতে গিয়ে আমার হৃদয় ও মস্তিষ্কের উপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং নতুন করে আর এ অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করতে পারলাম না। দ্বিতীয়ত, বর্তমান সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব। বর্তমান সমাজ '৭২ এর সমাজের চেয়ে এদিকে অধিকতর রক্ষণশীল। বীরাঙ্গনাদের পাপী বলতেও তারা দ্বিধাবোধ করেন না। সুতরাং পঁচিশ বছর আগে যে-সহজ স্বাভাবিক জীবন থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের নতুন করে অপমানিত করতে আমি সংকোচ বোধ করছি।

উপরন্তু অনেক সহৃদয় উৎসুক ব্যক্তি এঁদের নাম, ঠিকানা জানবার জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে বিব্রত করেছেন। আমার ধারণা একদিন যাঁদের অবহেলাভরে সমাজচ্যুত করেছি, আজ আবার নতুন করে তাঁদের কাটাঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে, নতুন করে তাঁদের বেদনার্ত ও অপমানিত করা ঠিক হবে না। এ কারণে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশে আমি অক্ষম। আমি আপনাদের মার্জনা ভিক্ষে করছি।

সম্প্রতি আমার তরুণ প্রকাশক দীপন প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড নিয়ে 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থের অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। আমি তার এ সাধু-প্রচেষ্টার জন্য আরেকবার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর আমার সহৃদয় পাঠকের প্রতি বীরাঙ্গনাদের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করছি।

তারিখ : ১০.১২.৯৭

নীলিমা ইব্রাহিম

ভূ মি কা

১৯৭২ সালে যুদ্ধজয়ের পর যখন পাকিস্তানি বন্দিরা ভারতের উদ্দেশ্যে এ ভূখণ্ড ত্যাগ করে, তখন আমি জানতে পারি প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন ধর্ষিত নারী এ বন্দিদের সঙ্গে দেশ ত্যাগ করছেন। অবিলম্বে আমি ভারতীয় দূতাবাসের সামরিক অফিসার ব্রিগেডিয়ার অশোক ডোরা এবং বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত মরহুম নুরুল মোমেন খান যাঁকে আমরা মিহির নামে জানতাম তাঁদের শরণাপন্ন হই। উভয়েই একান্ত সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এসব মেয়েদের সাক্ষাৎকার নেবার সুযোগ আমাদের করে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নওসাবা শরাফী, ড. শরীফা খাতুন ও আমি সেনানিবাসে যাই এবং মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা লাভ করি।

পরে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে নারকীয় বর্বরতার কাহিনী জানতে পারি। সেই থেকে বীরাঙ্গনাদের সম্পর্কে আমার আগ্রহ জন্মে। নানা সময়ে দিনপঞ্জিতে এঁদের কথা লিখে রেখেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, জনসমাজে এঁদের পরিচয় তুলে ধরার। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ সে আগ্রহেরই প্রকাশ।

এখানে একটি কথা অবশ্য উল্লেখ্য। চরিত্রগুলি ও তাঁদের মন-মানসিকতা, নিপীড়ন, নির্যাতন সবই বস্তুনিষ্ঠ। তবুও অনুরোধ অতি কৌতূহলী হয়ে ওদের খুঁজতে চেষ্টা করবেন না। এ স্পর্শকাতরতা আমাদের অবহেলা এবং ঘৃণা ও ধিক্কারের দান।

'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অনেক দিন ধরেই প্রস্তুত করছিলাম। প্রকাশে শঙ্কা ছিল। কিন্তু আমার স্নেহভাজনীয় ছাত্রী কল্যাণীয়া বেবী মওদুদ উৎসাহ, প্রেরণা ও তাঁর অদম্য কর্মক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে এলেন।

১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারির বইমেলার জন্য 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' ১ম

খণ্ডের পাণ্ডুলিপি ভীত কম্পিত হস্তে, সংশয় শঙ্কাকূল চিত্তে প্রকাশকের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু না, প্রজন্ম একাত্তর এই দেশপ্রেমিক রমণীদের মাতৃসম্মানে সমাদৃত করেছে। তারা আরও জানতে চেয়েছে সেই সাহসী বীরাঙ্গনাদের কথা। তাই সাহসে ভর করে এগুলাম। অনেকে সংবর্ধনা ও সম্মান জানাবার জন্য এঁদের ঠিকানা চেয়েছেন। তার জন্য আরও একযুগ অপেক্ষা করতে হবে।

যদি জীবনে সময় ও সুযোগ পাই তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের বাসনা রইল ধর্মান্ধতার কালিমা দূরীভূত করতে। আমার প্রকাশকের সঙ্গে অগণিত পাঠকের প্রতি রইলো সকৃতজ্ঞ শুভেচ্ছা।

তারিখ : ১৭.০১.৯৪

নীলিমা ইব্রাহিম

এক

প্রকৃতির মতো মনুষ্যসমাজও কতো বিচিত্র। প্রকৃতিতে কোথায়ও সমভূমি ধূসর সুজলা সুফলা আবার কোথায়ও বারি বিন্দুহীন মরুভূমি। একদিকে সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নাগাধিরাজ হিমালয় পর্বত আর নিম্নে বয়ে চলেছে মহাসমুদ্র। কোথায়ও জ্যৈষ্ঠর দাবদাহ, কোথায়ও-বা হিম প্রস্রবণ বা তুষারপাত।

একা একা বসে যখন ভাবি আমার জীবনটাও তো এমনি! প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মতো স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, ঘৃণা, লজ্জা, রোষ, করুণার সমাহার। এ জীবনে সব কিছুরই স্পর্শ আমি পেয়েছি; কখনও মৃদু কোমল স্পর্শ বা আঘাত আবার কখনো অশনি পতনের দাবদাহ। সেকথা, আমার সে অনুভূতির গভীরতাকে কখনও দ্বিতীয় ব্যক্তির শ্রবণগোচর করবো এমন সাহস আমার ছিল না। কারণ এ সাহস প্রকাশের শিক্ষা শৈশব থেকে কখনও পেয়ে আসি নি। নামতা পড়ার মতো শুধু আউড়িয়েছি আমি মেয়ে, আমাকে সব সইতে হবে; আমি হবো ধরিত্রীর মতো সর্বংসহা। প্রতিবাদের একটিই পথ, সীতার মতো অগ্নিপরীক্ষা বা পাতাল প্রবেশ। সীতা ছিলেন দেবী। তাই ও দু'টোর কোনোটারই সদ্ব্যবহার আমি করতে পারি নি। যখন চারিদিকে শুধু ছিঃ ছিঃ–ধ্বনি শুনেছি, সমাজপতি এবং অতি আপনজন বলেছেন, 'মরতে পারলি না হতভাগী, আমাদের মারবার জন্য এই কালোমুখ নিয়ে ফিরে এসেছিস?' তাদের মুখ ফুটে বলতে পারি নি, 'না মরতে আর পারলাম কই? তার পথও তো তোমরা করে দিলে না। বাঁচাবার জন্য হাত বাড়াও নি, মরবার পথেও তো সহায়তা করো নি। না সে কথা মুখে বলতে পেরেছো, না কাজে পরিণত করবার মতো সৎসাহস সেদিন তোমাদের ছিল, আজও নেই, ভবিষ্যতের কথা ভবিতব্যই জানেন।

সত্যিই আজ আমি শুধু বিস্মিত নই, আবেগাপ্লুতও যে আমার মাতৃতুল্য একজন বয়স্ক মহিলা আমার সম্মুখে এতো মমতামাখা আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু আজ দীর্ঘ বিশ বছর পর আমি দাঁড়িয়ে আছি বর্তমানের ওপর দু'পায়ে ভর করে। ভবিষ্যতের বুক ভরা আশা নিয়েও আমার অতীত নেই মনের সমস্ত দৃঢ়তা ও ঘৃণাকে সম্বল করে আমি আমার কলঙ্ক আচ্ছাদিত গৌরবময় অতীতকে ভুলে গেছি। কারণ

আমার যা ছিল গর্বের, আমার পরিবার ও সমাজের তাই ছিল সর্বাধিক লজ্জা, ভয় ও ঘৃণার।

ওহো, আমি দুঃখিত। নিজের পরিচয় দিতে আমি ভুলে গেছি। আজকাল আমার মাঝে মাঝে এমন হয়, কারণ বড্ড বেশি কাজের চাপে থাকি। এর সুবিধা দু'টো। বর্তমানকে আমার চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি ও যোগ্যতা দিয়ে সব সময়ে পূর্ণ করে রাখতে চাই, যেন অতীত সেখানে কখনও কোনো ছিদ্রপথে প্রবেশ করতে না পারে। আমার বর্তমান যেন মসীলিপ্ত না হয়। আমার নাম মিসেস টি. নিয়েলসেন। আমার স্বামী যশস্বী সাংবাদিক ও ডেনমার্কের অধিবাসী। সঙ্গত কারণে আমিও তাই। আমাদের দু'টি ছেলেমেয়ে টমাস ও নোরা। মেয়ের নাম নোরা রাখলাম কেন? সম্ভবত আমাকে দেখেই আমার শাশুড়ি নাতনির এ নাম রেখেছিলেন। তাঁর মত, শতবর্ষেরও আগে ইবসেন তাঁর দেশে যে নারীকে ব্যক্তি সচেতন করতে চেয়েছিলেন আজ পাশ্চাত্যেও নারী সে-অধিকার বা সম্মান অর্জনে সক্ষম হয় নি। তবে নোরা যেন তার কালের ওপর দাঁড়িয়ে ইবসেনের স্বপ্ন সফল করে। টমাস পেয়েছে আমার স্বভাব-জিদ্দী, একগুঁয়ে আর নোরা তার বাবার মতো, আগুনের কাছে গেলেও গরম হয় না।

১৯৭৮ সালে মিসেস হায়দার ডেনমার্কে আসেন। যে-সংগঠনের তিনি সদস্য তারা কোপেনহেগেনে একটি প্রেসকনফারেন্স করে। আমার বান্ধবী এ্যালিস একজন নারীবাদী জবরদস্ত সাংবাদিক। সেও ওখানে ছিল। নিয়েলসেনের বাংলাদেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকায় সে মিসেস হায়দারকে বারবার ও দেশের স্বাধীনতা উত্তরকালের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। মিসেস হায়দার অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত, প্রগতিশীল এবং স্পষ্টভাষী। কিন্তু তিনি সব কথার সোজাসুজি উত্তর দিচ্ছিলেন না। তিনি আমার সাথীকে বললেন, আমার দেশে গণতান্ত্রিক সরকার নেই তাই তোমাদের মতো সরাসরি আমরা কথা বলতে পারি না। আশা করি আমার এ অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতাকে তোমরা ক্ষমা করবে। আনুষ্ঠানিক প্রেস-কনফারেন্স শেষ হলে এ্যালি ও নিয়েলসেন বেশি সময় মিসেস হায়দারের সঙ্গে কাটিয়ে এলো। যে-সংগঠনের পক্ষ থেকে এ প্রেস-কনফারেন্স ডাকা হয়েছিল, এ্যালিস ঐ সংগঠনের ডেনমার্ক শাখার প্রচার সম্পাদক।

মিসেস টি. নিয়েলসেনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৭৮ সালে কোপেনহেগেনে এ্যালিসের বাড়িতে এক নৈশভোজে ইন্টারন্যাশনাল এ্যালায়েন্স অব উইমেনের বোর্ডমিটিং ও বছর কোপেনহেগেনে হয়। সহ-সভানেত্রী লরেল ক্যাসিনাডার কন্যা, পদ্মিনী ডেনমার্ক শাখার সভানেত্রী। তাঁরই অনুরোধে আমরা কোপেনহেগেনে সভা করবার সিদ্ধান্ত নিই। পদ্মিনীর স্বামী ডেনিশ, পেশায় চিকিৎসক। তাছাড়া আরও কয়েকজন স্থানীয় সদস্য আমাদের পূর্ব পরিচিত, যে

পরিচয় আজ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। এ্যালিস তাদের একজন। নৈশভোজে প্রায় পঁচিশ–ত্রিশজন ছিলেন। এ্যালিস আগ্রহ সহকারে মি. এবং মিসেস নিয়েলসেনের সঙ্গে আমার পরিচয়-করিয়ে দিলো, যদিও নিয়েলসেনের সঙ্গে আমি প্রেসকনফারেন্সে আগেই পরিচিত হয়েছি এবং তাকে আমার বেশ ভালোও লেগেছিলো।

মিসেস নিয়েলসেনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, একটু যেন চমকে উঠলাম। মহিলার বয়স বছর ত্রিশ মতো হবে। রীতিমতো সুন্দরী ও সুঠাম দেহের অধিকারিণী। কালো ঈষৎ কোঁকড়া চুলে পিঠ ছেয়ে আছে, যা এদেশে চোখে পড়ে না। বেশির ভাগেরই বব্‌কাট অথবা হাল ফ্যাশনের বয়কাট। সুতরাং চুলেই মহিলা সবার দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম, গায়ের রঙটাও ঠিক পশ্চিমী দুধে আলতায় নয়, অনেকটা ল্যাটিন আমেরিকার মেয়েদের মতো হল্‌দে ছাট আছে। চুলের সঙ্গে মিল রেখে চোখ দু'টিও বড় বেশি কালো। দৃষ্টি চঞ্চল, সম্ভবত স্বভাবেও কিছুটা চাঞ্চল্য আছে। ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে গল্প করছেন, হাসছেন একান্তভাবেই উচ্ছল প্রকৃতির। আমি কিন্তু বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছি। কোথায় কি যেন আমার মাথায় নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। উনি কি আমার পূর্ব পরিচিত? ওকে কি কোথায়ও দেখেছি। সম্ভবত মেক্সিকোতে দেখে থাকবো, কারণ ডেনমার্ক থেকে ওখানে বড় ডেলিগেশন গিয়েছিল। উনিও কিন্তু বারবার আমার দিকে চোখ ফেলছেন; কিন্তু কেন? আমার চোখের দৃষ্টি কি মনের ঔৎসুক্য প্রকাশ করছে? সে এগিয়ে এলো। হেসে বললাম, তোমাকে আমার খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। কোথায় তোমাকে দেখেছি বলতো? মনে হয় আমাকেও তুমি কিছুটা চেনো। মিসেস নিয়েলসেন বললেন, তুমি তো বিশ্বপরিব্রাজক নও। হয়তো-বা তোমার বাংলাদেশের মাটিতেই আমাকে দেখেছো। চোখ দুটো কৌতুকে হাসছে। সত্যি? গিয়েছিলে তুমি নিয়েলসেনের সঙ্গে বাংলাদেশে? আমাকে একটা মৃদু ঠেলা দিয়ে বললেন, লোকে বলে তুমি নাকি খুব জ্ঞানী, পণ্ডিত। কিন্তু একেবারে শিশুর মতো সরল। 'হাই' বলে আরেকজনের দিকে ছুটলেন তিনি। সে রাতের দেখা সাক্ষাৎ ওখানেই শেষ।

পরে এ্যালিসের সঙ্গে ওর সম্পর্কে অনেক আলাপ হয়েছে। এ্যালিসও আমার সঙ্গে একমত, খুব ইন্টারেস্টিং মহিলা। না, ইনি ডেনমার্কের নন। হয়তো-বা তোমার কথাই ঠিক, ল্যাটিন আমেরিকার কোনোও দেশের হবে। কিন্তু কথায় তো ওসব দেশের টান নেই। জিভ একেবারে পরিষ্কার মনে হয় অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজে পড়াশোনা করেছে। কিন্তু তাও নয় নীলা, কারণ উনি পেশায় নার্স, অবশ্য খুবই দক্ষ। একটা বেশ সম্মান নিয়েই আছেন এখানে। আচ্ছা নীলা, কি পেয়েছো তুমি মিসেস নিয়েলসেনের ভেতর যে ওর সম্পর্কে এতো কিছু জানতে চাইছো? বললাম, কিছু না এ্যালী। এমনিই ওকে আমার খুব ভালো লেগেছে।

১৯৮৫ সালে আবার গেলাম ডেনমার্কে। এ্যালী এসেছিল এয়ারপোর্টে ক্রিশ্চিন

আর মেটার সঙ্গে। এবার হোটেল নয়, মেটার অফিসিয়াল রেসিডেন্সটা ক্রিশ্চিন আমাদের দু'জনের জন্য রেখেছে। মেটা ঐ দশদিন ওর বাবার বাড়িতে থাকবে। মেটা আইনজীবী এবং সংসদ সদস্য। হাতে সব সময় ক্যারনের মতো একটা মোটা চুরুট। আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, চুরুট খাওয়া মহিলারা প্রায়ই পুরুষালী আরচণ করেন। হয়তো এও আমার একটা ভ্রান্ত ধারণা। কক্সবাজারে ক্ষুদ্রাকৃতি বয়স্ক মগ মহিলারা যেন পার্টিতে বসে চুরুট ফুকছে। সদ্য ক্রিশ্চিনের ছেলের বিয়ে হয়েছে। সে পার্টি থেকে জমিয়ে বেশ কিছু মুরগির রোস্ট, বীফ স্টেক, পানীয় এনে মেটার ফ্রিজে জমিয়েছে। সন্ধেবেলায় আমার অবস্থানের খবর পেয়ে ভারতীয় প্রতিনিধি, আমাদের খুবই প্রিয়, লক্ষ্মী রঘু রামাইয়া এসে উপস্থিত। ক্রিশ্চিনের মুখে আষাঢ়ের মেঘ। আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলছে না। নিজের মনে বিড় বিড় করছে, এ জানলে হোটেলেই যেতাম। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, ও নিরামিষাষী। মাছ-মাংস খায় না। ক্রিশ্চিন এতোক্ষণে আত্মস্থ হলো।

জিজ্ঞেস করলাম মিসেস নিয়েলসেনের কথা। সংক্ষিপ্ত উত্তর, ভালোই আছে। এ্যালীর খবর কি? দেখাই তো হবে কাল। একটা রাত না হয় আমার সঙ্গেই গল্প করে কাটিয়ে দিলে। ক্রিশ্চিন আমার থেকে দু'চার বছরের ছোট অথবা আমার সমবয়সী হবে। ও আমাকে ভয়ানক ভালোবাসে। পারিবারিক সুখ-দুঃখ-সমস্যার কথা আমাকে বলে খুব শান্তি পায়। তাই ওর সামনে আর কারো সম্পর্কে আগ্রহ দেখালে ও একটু বিরক্তই হয়। তাছাড়া একান্ত আড্ডা মারা আর সন্ধ্যায় রেঁস্তোরায় গিয়ে পিটজা খাওয়ায় ওর যতো সুখ। আর সেই সুখের জন্য মেটাকে ঘর ছাড়া করেছে দশদিনের জন্য।

একটা চেক ব্যাভিরিয়ন স্কার্ট পরা, সঙ্গে একটা লাল টুকটুকে ব্লাউজ-নিয়েলসেন আমাকে দেখে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু চুমুটা দিলাম আমি, ও ঠিক সহজভাবে আমার মুখ চুম্বন করলো না। আগামীকাল থেকে মধ্যদশক নারী কংগ্রেস শুরু। আজ এসেছি রেজিস্ট্রেশন করতে আর ঘর-বাড়ি দেখতে। যেন কাল হাতড়ে বেড়াতে না হয়। টি. নিয়েলসেনের হাত ধরে আছে ৫/৬ বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ে। হঠাৎ বললো, মিসেস হায়দার আমার মেয়ে, 'নোরা'। নোরা মায়ের মতো অতো সপ্রতিভ নয়। 'হাই' বলেই মায়ের পেছনে মুখ লুকালো। বললাম, টমাসের খবর কি? আরে ও এখন জেন্টলম্যান। শোনো, এবার তুমি একা আমাকে একটা সন্ধ্যা দেবে, প্লিজ। বললাম, একা? বলল, হ্যাঁ, অনেক কথা আমার তোমার কাছ থেকে জানবার আছে। বিস্ময় ক্রমশ বাড়ছে। তারপর দিন ঠিক হলো কনফারেন্স থেকে আমি ক্রিশ্চিনের সঙ্গে ওর বাড়ি 'রানু' যাবো। তার আগের দিন ও চলে গেল। আমি মিসেস নিয়েলসেনকে ঐ দিন রাতে আসতে বললাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি

হয়ে গেলেন।

আমি কিছু খাবার এবং ফল এনে রাখলাম। বাইরে খেতে হবে না। কারণ ওর কাছ থেকে আমার অনেক কিছু জানবার আছে। আজ সাত বছর ধরে অনেক সময় আমি ওর কথা ভেবেছি। কাল রাতে ক্রিশ্চিন চলে গেলে আমি তারা ভরা আকাশের দিকে চেয়েছিলাম। সম্পূর্ণ একা। ভাবছিলাম নিজের দেশের কথা, অতীত সংগ্রামের দিনগুলোর কথা। সামনে পর্বত প্রমাণ আশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, তারপর একদিন একটি মহান প্রাণের বিদায়ের মাধ্যমে সব আশা ছাই হয়ে গেল। কতো সুখ, কতো আপনজন হারিয়ে গেছে। মানুষের মুখোশ পরা কতো অমানুষ আজ আমার চারদিকে ভীড় জমিয়েছে। এই দশটা বছর তো দেহে বেঁচে আছি। অন্তরে আমি মৃত। কিন্তু কোথায় পথের কোনো বাঁকে এই বিদেশিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল? ভ্যানকুভারের শার্লী আমাকে বলেছিল গতজন্মে আমরা বোন ছিলাম। তাই এত দূরের হয়েও এতো কাছে এসেছি। ও খুব বেশি স্পিরিচুয়াল বিষয় নিয়ে চর্চা করে। অতো ধনী কিন্তু কি বিনয়ী, নিরাভরণ, অহঙ্কারশূন্য। বছরে একবার লন্ডনে এসে আমার মেয়ের কাছে আমার বড়দিনের উপহার রেখে যায়। মিসেস নিয়েলসনের সঙ্গেও কি ওইরকম কিছু? হঠাৎ আমার চোখের সামনে হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বলে উঠলো। ঐ তো, ধানমন্ডির নারী পুনর্বাসনকেন্দ্রে অপারেশন থিয়েটারের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটি। রুক্ষ চুল, রক্তিমাভ ঠোঁট ফ্যাকাশে, পরনে একখানা লালপাড় শাদা শাড়ি, ভারতের সাহায্য। একেবারে অভ্রান্ত, না এতে কোনও সংশয় নেই। ওই তারা, কতোদিন ওর কাছে গেছি, কথা জমাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু হ্যাঁ-না ছাড়া আর কোনও কথা হয় নি। এ নিশ্চয়ই সেই তারা কিন্তু জিজ্ঞেস করবো কি করে? মনে হয় ও আমাকে বলবে। কারণ যখনই ও কাছে আসে, আমার মেয়েদের মতো গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। আমি বুঝি ও আমার স্পর্শ চায়। সেকি মাতৃস্পর্শ না দেশের মাটির স্পর্শ, জানি না।

ঠিক সাতটায় দরজায় কলিংবেলের শব্দ হলো। আমি হাসিমুখে দরজা খুলে বলতে চেয়েছিলাম–হাই মিসেস নিয়েলসেন। কিন্তু বলা হলো না। হাতে একরাশ ফুল নিয়ে ও ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বুকে। আমি আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ওর মাথায়, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম কেঁদো না, অনেক কেঁদেছো আর না। আজ তো তুমি জয়ী। যাও মুখ হাত ধুয়ে এসো। ও উঠে গেল। আমি টেবিলে কিছু পানীয়, কাজু বাদাম আর আলুভাজা রাখলাম। মিসেস টি. নিয়েলসেন গুছিয়ে বসে গলা ভিজিয়ে বললো, নীলাআপা আমি প্রথম দিন দেখেই আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম। আর আপনিও আমাকে চিনেছিলেন তাই না? তারা, তারা ব্যানার্জী, মনে আছে আপনার? অতোটা স্পষ্ট করে মনে না থাকলেও, তারা নামটা মনে

হয়ে গেলেন।

আমি কিছু খাবার এবং ফল এনে রাখলাম। বাইরে খেতে হবে না। কারণ ওর কাছ থেকে আমার অনেক কিছু জানবার আছে। আজ সাত বছর ধরে অনেক সময় আমি ওর কথা ভেবেছি। কাল রাতে ক্রিশ্চিন চলে গেলে আমি তারা ভরা আকাশের দিকে চেয়েছিলাম। সম্পূর্ণ একা। ভাবছিলাম নিজের দেশের কথা, অতীত সংগ্রামের দিনগুলোর কথা। সামনে পর্বত প্রমাণ আশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, তারপর একদিন একটি মহান প্রাণের বিদায়ের মাধ্যমে সব আশা ছাই হয়ে গেল। কতো সুখ, কতো আপনজন হারিয়ে গেছে। মানুষের মুখোশ পরা কতো অমানুষ আজ আমার চারদিকে ভীড় জমিয়েছে। এই দশটা বছর তো দেহে বেঁচে আছি। অন্তরে আমি মৃত। কিন্তু কোথায় পথের কোনো বাঁকে এই বিদেশিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল? ভ্যানকুভারের শার্লী আমাকে বলেছিল গতজন্মে আমরা বোন ছিলাম। তাই এত দূরের হয়েও এতো কাছে এসেছি। ও খুব বেশি স্পিরিচুয়াল বিষয় নিয়ে চর্চা করে। অতো ধনী কিন্তু কি বিনয়ী, নিরাভরণ, অহঙ্কারশূন্য। বছরে একবার লন্ডনে এসে আমার মেয়ের কাছে আমার বড়দিনের উপহার রেখে যায়। মিসেস নিয়েলসনের সঙ্গেও কি ওইরকম কিছু? হঠাৎ আমার চোখের সামনে হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বলে উঠলো। ঐ তো, ধানমন্ডির নারী পুনর্বাসনকেন্দ্রে অপারেশন থিয়েটারের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটি। রুক্ষ চুল, রক্তিমাভ ঠোঁট ফ্যাকাশে, পরনে একখানা লালপাড় শাদা শাড়ি, ভারতের সাহায্য। একেবারে অভ্রান্ত, না এতে কোনও সংশয় নেই। ওই তারা, কতোদিন ওর কাছে গেছি, কথা জমাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু হ্যাঁ-না ছাড়া আর কোনও কথা হয় নি। এ নিশ্চয়ই সেই তারা কিন্তু জিজ্ঞেস করবো কি করে? মনে হয় ও আমাকে বলবে। কারণ যখনই ও কাছে আসে, আমার মেয়েদের মতো গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। আমি বুঝি ও আমার স্পর্শ চায়। সেকি মাতৃস্পর্শ না দেশের মাটির স্পর্শ, জানি না।

ঠিক সাতটায় দরজায় কলিংবেলের শব্দ হলো। আমি হাসিমুখে দরজা খুলে বলতে চেয়েছিলাম–হাই মিসেস নিয়েলসেন। কিন্তু বলা হলো না। হাতে একরাশ ফুল নিয়ে ও ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বুকে। আমি আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ওর মাথায়, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম কেঁদো না, অনেক কেঁদেছো আর না। আজ তো তুমি জয়ী। যাও মুখ হাত ধুয়ে এসো। ও উঠে গেল। আমি টেবিলে কিছু পানীয়, কাজু বাদাম আর আলুভাজা রাখলাম। মিসেস টি. নিয়েলসেন গুছিয়ে বসে গলা ভিজিয়ে বললো, নীলাআপা আমি প্রথম দিন দেখেই আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম। আর আপনিও আমাকে চিনেছিলেন তাই না? তারা, তারা ব্যানার্জী, মনে আছে আপনার? অতোটা স্পষ্ট করে মনে না থাকলেও, তারা নামটা মনে

পড়লো। একদিন কথাচ্ছলে বলেছিল ওর বড় বোনের রং শ্যামলা তাই ওর দাদি নাম রেখেছিলেন কালী। তারপর ওর জন্মের লগ্নে দাদি ওকে ডাকলেন তারা। একমাত্র বড় ভাইয়ের নাম স্বয়ম্ভু প্রসাদ। দাদির দেবী ভক্তির নমুনা আর কি! আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছি, আজ ওর বলার পালা। এক সময় ওর মুখ খোলাতে আমি অনেক চেষ্টা করেও পারি নি। বললো, আপনি যখন আপনার সব বান্ধবীদের নাম ধরে ডাকতেন আর আমাকে বলতেন মিসেস নিয়েলসেন, আমি তখন লজ্জা পেতাম কিন্তু প্রথমে নামটা বলতে পারি নি। এখন আমার কোনও সংকোচ থাকার কথা নয়, তবে এ বোধহয় সংস্কারের দৈন্য। সব গেছে – জাতি, ধর্ম, দেশ কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারকে সহজে বর্জন করতে আজও আমি দ্বিধান্বিত।

১৯৭১ সালের উত্তাল আন্দোলনে আমি ছিলাম রাজশাহীতে। বাবা শহরের উপকণ্ঠে ডাক্তারি করতেন। এক সময় সরকারি কর্মচারী ছিলেন। '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পর চাকুরি ছেড়ে তার গ্রামের বাড়ির কাছাকাছি শহরের উপকণ্ঠে বেশ কিছুটা জমি নিয়ে নিজের পছন্দমত ছোট্ট একটি বাড়ি করেন। মার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো বাগান করবার সুবিধে পেয়ে। দাদি ততোদিনে চলে গেছেন। বড়বোন কালীর বিয়ে হয়ে গেল। ও কলকাতায় চলে গেল স্বামীর ঘর করতে। দাদার মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষা দেবার কথা, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে এমনভাবে মেতে উঠলো যে দেওয়া হলো না। মা ক্ষুন্ন হলেন কিন্তু বাবা কেন জানি না খুশিই হয়েছেন মনে হলো। বাবা চেম্বার থেকে বেশ রাত করে আসেন। মা খুবই উদ্বিগ্ন হন, অনুযোগ অভিযোগ করেন। বাবা হেসে উত্তরে বলেন, শোনোনি শেখ মুজিব বলেছেন – তোমাদের যার যা কিছু আছে...। শুনেছি কিন্তু তোমার কি আছে, যে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে? বাবা বলতেন, ছেলে আছে, মেয়ে আছে, তুমি আছো। এখনও এই হাত দু'খানা আছে। কিন্তু রাতে মনে হয় বাবা ঠিকমতো ঘুমাতেন না। সামান্য শব্দ হলেই জেগে উঠতেন। বারান্দায় পায়চারি করতেন। তিনি কি কোনও অশুভ সংকেত পেয়েছিলেন? জানি না, কারণ তিনি জানতে দেন নি।

মার্চমাসের মাঝামাঝির পর থেকেই এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছিল। কিন্তু জনতা এতো একতাবদ্ধ যে কোনো অপশক্তিই এদের রুখতে পারবে না বলে সবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সব বিশ্বাসকে ভেঙেচুরে এলো ২৫শে'র কালোরাত্রি। পরদিন ছিল কার্ফু। এর ভেতরই কিছু লোককে আমাদের বাড়ির চারদিকে ঘুর ঘুর করতে দেখা গেল। মা ঠাকুরের নাম জপ করছেন। বাবা করছেন অশান্ত পদচারণা। ছাব্বিশে মার্চ সারাদিনই আমরা ইঁদুরের মতো গর্তে রইলাম। ২৭ মার্চ অন্ধকার থাকতেই আমরা গ্রামের বাড়িতে রওয়ানা হলাম সামান্য হাতব্যাগ নিয়ে। গাড়ি, রিকশা কিছুই চলছে না। হঠাৎ স্থানীয় চেয়ারম্যানের জিপ এসে থামলো আমাদের সামনে। বাবাকে

সম্বোধন করে বললেন, ডাক্তারবাবু আসেন আমার সঙ্গে। কোথায় যাবেন নামিয়ে দিয়ে যাবো। বাবা আপত্তি করায় চার–পাঁচজনে আমাকে টেনে জিপে তুলে নিয়ে গেল। কোনও গোলাগুলির শব্দ শুনলাম না। বাবা-মাকে ধরে নিয়ে গেল না মেরে ফেললো বলতে পারবো না। গাড়ি আমাকে নিয়ে ছুটলো কোথায় জানি না। কিছুক্ষণ হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ছিল আমার। সচেতন হয়ে উঠে বসতেই বুঝলাম এটা থানা, সামনে বসা আর্মি অফিসার। আমার সঙ্গে ভদ্রভাবেই কথা বললেন। বললাম, আমাকে বাবা-মার কাছ থেকে কেড়ে এখানে আনা হয়েছে কেন? অফিসার হেসে উত্তর দিলেন–তোমার নিরাপত্তার জন্য। দেখলাম ওখানে আরও ২/৩টি মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কখনও বা চিৎকার করছে। অবশ্য চেঁচালেই ধমক খাচ্ছে। চা এলো, রুটি এলো, কলাও এলো। আপা, সে দৃশ্য আজও আমার কাছে পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট। আমাদের মফঃস্বলের ইংরেজি শুনে অফিসারটি খুশী হলেন যে আমি ইংরেজি জানি। সারাদিন সবাই ওখানেই রইলাম। সন্ধের কিছু আগে চেয়ারম্যান সাহেব এলো। সব কিছু জেনেও আমি ওর পা জড়িয়ে ধরলাম, কাকাবাবু, আমাকে বাবার কাছে রেখে আসুন। ছোট্টবেলা থেকে আপনি আমাকে চেনেন। আপনার মেয়ে সুলতানার সঙ্গে আমি একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি, স্কুলে পড়েছি। আমাকে দয়া করুন। উনি ঝাড়া দিয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। বুঝলাম আমাকে বাঘের মুখে উৎসর্গ করা হলো। মানুষ কেমন করে মুহূর্তে পশু হয়ে যায় ওই প্রথম দেখলাম। এরপর ১৬ ডিসেম্বরের আগে মানুষ আর চোখে পড়ে নি।

অফিসারটি পরম সোহাগে আমাকে নিয়ে জিপে উঠলো। কিছুদূর যাবার পর সে গল্প জুড়লো অর্থাৎ তার কৃতিত্বের কথা আমাকে শোনাতে লাগলো। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। হঠাৎ ঐ চলন্ত জিপ থেকে আমি লাফ দিলাম। ড্রাইভিংসিটে ছিল অফিসার, আমি পাশে, পেছনে দু'জন জোয়ান। আমার সম্ভবত হিতাহিত জ্ঞান রহিত হয়ে গিয়েছিল। যখন জ্ঞান হলো দেখি মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, আমি হাসপাতালের বিছানায়। ছোট্ট হাসপাতাল। যত্নই পেলাম, সব পুরুষ। একজন গ্রামের মেয়েকে ধরে এনেছে আমার নেহায়েৎ প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য। মেয়েটি গুণ গুণ করে কেঁদে চলেছে। সন্ধ্যায় অফিসারটি চলে গেল। যাবার সময় আমাকে হানি, ডার্লিং ইত্যাদি বলে খোদা হাফেজ করল। দিন তিনেক শুয়ে থাকবার পর উঠে বসলাম। সুস্থ হয়েছি এবার! আমাদের ভেতরে সংস্কার আছে পাঁঠা বা মহিষের খুঁত থাকলে তাকে দেবতার সামনে বলি দেওয়া যায় না। আমি এখন বলির উপযোগী।

প্রথম আমার উপর পাশবিক নির্যাতন করে একজন বাঙালি। আমি বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। অসুস্থ দেহ, দুর্বল যুদ্ধ করতে পারলাম না। লালাসিক্ত পশুর শিকার হলাম। ওই রাতে কতজন আমার উপর অত্যাচার করেছিলো বলতে পারবো

না, তবে ছ'সাত জনের মতো হবে। সকালে অফিসারটি এসে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখলো তারপর চরম উত্তেজনা, কিছু মারধরও হলো। তারপর আমাকে তার জিপে তুলে নিলো, আমি তৃতীয় গন্তব্যে পৌঁছোলাম। অফিসারটির হাত ধরে মিনতি করে বললাম, আমাকে রক্ষা করবার কথা বলছেন, আমি তো রক্ষা পেয়েছি। এবার আমাকে ছেড়ে দিন। আপনি আমার ভাই। আপনার বয়সী আমার বড়ভাই আছে। হঠাৎ হিংস্র শ্বাপদের মতো এই ভালোমানুষ লোকটির চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো। বাঁ হাতে আমার চুলের মুঠি ধরে বললো, বল তোর ভাই কোথায়? বললাম, আমি তো এখানে ভাই কোথায় কি করে বলবো? অফিসারটি হঠাৎ আমার মুখে কতগুলো থুথু ছিটিয়ে দিয়ে কি সব গালাগালি দিলো। আমি নিস্তব্ধ নিথর বসে রইলাম। মনে হয়েছিল কেন আমি তাঁর চরণে প্রথম অর্ঘ্য হলাম না, এটাই তার ক্ষোভ, কিন্তু সে তো তার অক্ষমতা। আমি তো এখন জড় পদার্থ, অনুভূতি প্রায় শূন্য। কয়েকদিন পর্যন্ত আমার মস্তিক মনে হয় কাজ করে নি। যন্ত্রের মতো যা দিয়েছে খেয়েছি, যে যেখানে টেনে নিয়ে যে অত্যাচার করেছে সয়ে গেছি। সামর্থ হলে দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করেছি 'জয় বাংলা'। যদি কারও বোধগম্য হয়েছে তাহলে কিছু থুথু, কিছু লাথি উপহার পেয়েছি। আমাদের দেশ-গ্রামে প্রচলিত আছে, বিড়াল আর কচ্ছপের প্রাণ আর মেয়ে মানুষের প্রাণ একই রকম, যতোই অত্যাচার করো না কেন, ধিকি ধিকি জ্বলে, কিন্তু মরে না। আমার ও আমার মরণ-সঙ্গিনীদের ওপর এরা যে অত্যাচার করেছে, পুরুষ মানুষ হলে কবে নিঃশেষ হয়ে যেতো। অবশ্য এর পেছনে আরও একটা কারণ আছে। আমরা এদের জীবন যাপনের একটা অত্যাবশ্যক পদার্থ ছিলাম। তাই যতো অত্যাচারই করুক না কেন, আমাদের এই রক্ত-মাংসের দেহগুলোকে জিঁইয়ে রাখবার প্রয়োজন ছিল। এবার আমি যেখানে আছি ওখানে প্রায় আট-দশজন মেয়ে ছিল : বয়স তেরো থেকে ত্রিশ অথবা আরও বেশি হবে। তবে এরা সবাই প্রায় গ্রামের। একটা শহরের শিক্ষিতা মেয়ে দেখেছিলাম, সামান্য কথা বলবার সুযোগও পেয়েছিলাম। আমার চেয়ে বয়সে বড়, সুন্দরী। উনি নাকি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্রী। ওর দুই ভাই সামরিক বাহিনীতে আছে। তারা নিশ্চয়ই এতোদিনে মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করছে। আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, কোনও মতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। আমাদের জয় হবেই। তাঁর মুখেই শুনলাম ওটা জুলাই মাস। অবাক হলাম এতোদিন আমি এ নরকবাস করছি। ভগবান, যুদ্ধ আর কতোদিন চলবে। এদের দেখে তো এতোটুকু নিরুৎসাহ বা দুর্বল মনে হয় না। কিন্তু ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে সেইদিনই সন্ধ্যায় নিয়ে গেল। সম্ভবত আরো কোনও বড় সাহেবকে ভেট দেবে।

আমাদের শাড়ি পরতে বা দোপাট্টা ব্যবহার করতে দেওয়া হতো না. কোন্

ক্যাম্পে নাকি কোন্ মেয়ে গলার শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই আমাদের পরনে পেটিকোট আর ব্লাউজ। যেমন ময়লা তেমনি ছেঁড়া-খোঁড়া। মাঝে মাঝে শহরের দোকান থেকে ঢালাও এনে আমাদের প্রতি ছুড়ে ছুড়ে দিতো। যেমন দুর্গাপূজা বা ঈদের সময় ভিক্ষা দেয় অথবা যাকাত দেয় ভিখারিকে। চোখ জলে ভরে উঠতো। বার বার বাবার কথা মনে হতো। মা এবার কি শাড়ি নিবি? বলতাম, তুমি যা দেবে। আদরে মাথায় হাত রেখে বলতেন, মা আমার যে ঘরে যাবে সে ঘর শান্তি তে ভরে উঠবে। বাবা তুমি কি জানতে তোমার মেয়ে কোনও ঘরের জন্যে জন্মায় নি। তার জন্মলগ্নে শনির দৃষ্টি ছিল। সে শতঘরের ঘরনী, যাযাবর রমণী।

হঠাৎ একদিন মনে হলো এতো অত্যাচার অনাচারে আমাকে এখন দেখতে কেমন হয়েছে? আয়না তো নেই-ই কাচের জানালা-দরজাও নেই। পাছে আমরা আত্মহত্যা করি। ওরা জানে না এই লাঞ্ছিত দেহটাকে পরম মমতায় লালন করছি প্রতিহিংসা নেবার জন্যে। ঐ যে, যাকে কাকাবাবু বলতাম ওই চেয়ারম্যান, ওকে কি করবো? আচ্ছা শ্যামলদা এখন কোথায়? শ্যামলদা ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিল। ঢাকায় ছিল ফলাফলের আশায়। ও আছে, না মরে গেছে? পুরুষ তো, নিশ্চয়ই মরে গেছে, ওকে ঘিরে কতো স্বপ্ন রচনা করতাম। সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী, লাজুক প্রকৃতির ছিল শ্যামলদা। সবার সামনে আমার সঙ্গে অল্প কথা বলতো। ওর বোন কাজলী আমাদের সঙ্গে পড়তো। বলতো, জানিস দাদা তোকে ভালোবাসে। শুনে আমার কান লাল হয়ে উঠতো, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতো। সত্যি মানুষ ভাবে কি, আর হয় কি। কোথায় আছে এখন শ্যামলদা। জীবিত, না মৃত, হয়তো-বা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতে চলে গেছে। ভারতে ওর বড়বোন, ভগ্নিপতি, কাকা, কাকিমা সব আছেন। ভালোই থাকবে ও। নিজের মনেই হাসে তারা, ঐ শ্যামলের কথা ভাববার কি কোনও যৌক্তিকতা আছে? ওর তন্দ্রাচ্ছন্ন ধ্যান ভাঙে মোতি মিয়ার চিৎকারে। মোতি মিয়া এখন রেশন সরবরাহ করে। মাঝে মাঝে তির্যক ভাষায় কিছু খবরাখবর দেয়। মাস-তারিখ হিসাবের ছলে উচ্চারণ করে। সেটা সেপ্টেম্বর মাস, মোতি মিয়া হিসাব করছিল। এ বছর যেতে আর তিনমাস। সাহেবরা তার থেকে বেশিদিন থাকবে না। হ্যাঁ, যুদ্ধ জয় করে দেশে বিবি বাচ্চার কাছে ফিরে যাবে। তারা বুঝলো মুক্তি আসন্ন। কারণ আজকাল ক্যাম্পে বসেই গোলাগুলির শব্দ শোনে। এখানকার অফিসার জোয়ান সবাই কেমন যেন উদ্বিগ্ন সন্ত্রস্ত। মাঝে মাঝে বাংলা খবর কানে আসে। না, ঢাকা-রাজশাহী নয়, উচ্চারণে বোঝা যায় আকাশবাণী। কে একজন বেশ ভরাট কণ্ঠে সংবাদ পরিবেশন করেন। শেষ হতেই রাজাকাররা গালাগালি দিতে থাকে মালাউনদের। তারা ভগবানকে ডাকে ওর প্রাণটুকু যেন থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করে 'জয় বাংলা'।

পরদিন হঠাৎ ওদের ভেতর একটি মেয়ে মারা যায়। অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সকাল থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ওরা বন্ধ দরজায় অনেক চেঁচামেচি করলো। কিন্তু কেউই এগিয়ে এলো না। ব্যাপারটা বোঝা গেল না। মেয়েটার নাম ছিল ময়না। বছর পনেরো বয়স হবে। কাটা পাঁঠার মতো হাত-পা ছুড়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো, মুখখানা নীল হয়ে গেলো। বয়স্কা সুফিয়ার মা একটা ছোট কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলো কারণ ও ঘরে ওরা চাদর দেয় না। সন্ধের পর ওরা লাশটা নিয়ে গেল। আমাদের ভেতর এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। এমন কি পশুগুলোরও নারীর প্রয়োজন ফুরিয়েছে মনে হচ্ছে। তাহলে এবার হয়তো আমাদের মেরে ফেলতে পারে। তারা বুকের ভেতর কেমন যেন একটা অস্থিরতা অনুভব করলো। এতো যন্ত্রণায় এরা সবাই রয়েছে – আর পারি না। আল্লাহ্ আমাদের তুলে নাও, ভগবান মুক্তি দাও, কিন্তু তারা কখনও মৃত্যু কামনা করে নি, শুধু বেঁচে থাকবার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছে।

গোলাগুলির শব্দ ক্রমশ কমে আসছিল। বেশ শীত পড়েছে। ছোট্ট কম্বলের টুকরোটা গায়ে দিয়ে জড়িয়ে পেঁচিয়ে থাকি। তারপর একদিন ভোররাতে সব কেমন নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ মনে হলো। সুফিয়ার মা বললো, হালারা পালাইলো নাকি? ওর কথায় যেন শরীরে অসুরের বল পেলাম। দরজা ধাক্কাতে লাগলাম। চেঁচাতে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ শুনি 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু'। যে সুফিয়ার মায়ের সঙ্গে কখনও কথা বলি নি আজ মায়ের মতো ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলাম। সাতাশে মার্চের পর আর কখনও কেঁদেছি কি? মনে হয় না। হঠাৎ করে আমাদের দরজা খুলে গেল। আমরা ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম। লোক যে ক'জন এসেছে তাদের ভদ্রশ্রেণীর মনে হলো না। সুফিয়ার মা ওদের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে কথা বললো। ওরা বললো ওরা মুক্তি। কিন্তু ওদের চাহ নি দেখে বিশ্বাস হলো না। ঠিক এমনি সময় একটি জিপের শব্দ পেলাম, কারা যেন খুব উচ্চ স্বরে 'জয় বাংলা' বলে উঠলো। আমরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠলাম, 'জয় বাংলা'। জিপ থেকে নেমে এলো খাঁকি কাপড় অর্থাৎ ইউনিফর্ম পরা তিনজন আর লুঙ্গি, গেঞ্জি, প্যান্ট পরা স্টেনগান হাতে সাত আটজন। ওদের নেতা এগিয়ে এলো। আমি একেবারে অন্ধকার কোণে গিয়ে ঢুকলাম। সেই সাতাশে মার্চের দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ইউনিফর্ম পরা একজন বুঝলো আমি ভয় পেয়েছি। আমার কাছে এগিয়ে এসে কোমল কণ্ঠে বললো, আইয়ে... আমার কি হলো জানি না। প্রচণ্ড একটা তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেলাম। পরে শুনেছি ওরা মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। কাছের গ্রাম থেকে কাপড় জামা এনে বাকিদের পরিয়ে নিয়ে গেছে। আমি অচৈতন্য থাকায় সরাসরি নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

জ্ঞান হলে দেখলাম একটা ছোট্ট হাসপাতাল। তবে ওখানকার লোকজনদের

কথায় বুঝলাম উত্তরবঙ্গেই আছি। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোন্ জায়গা? মনে হলো শুনলাম ঈশ্বরদী। অকথ্য অত্যাচার আর যন্ত্রণাকে আঁকড়ে থাকার ফলে আমার বোধহয় কিছুটা মাথায় গোলমাল হয়েছিল। এরপর বলছিলাম–বাবার কাছে যাবো, বাবার কাছে যাবো। কিন্তু যখন বাবার নাম জিজ্ঞেস করলো তখন কিছুতেই বাবার নাম বলতে পারলাম না। শুধু ভেউ ভেউ করে কাঁদলাম। ফলে আমার লাভ হলো আমাকে সরাসরি ঢাকায় নিয়ে এলো। সম্ভবত আমি হেলিকপ্টারে এসেছিলাম, কারণ প্লেনে খুব শব্দ হচ্ছিল। ওখানেই আমার জ্ঞান ফিরে আসে। বুঝলাম, আমি মেডিক্যাল কলেজের মহিলা ওয়ার্ডে এসেছি। তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিকে দেখছিলাম, মনে হলো এতো লোক আমি কখনো দেখি নি। তখন ঠিক ক'টা বলতে পারবো না, তবে দুপুরের খাবার দিয়ে যাচ্ছিল। আমাকেও দিলো। একজন সিস্টার সাহায্য করলেন। মুখ ধুয়ে ভাতের থালা টেনে নিলাম। ঝরঝর করে আমার দু'গাল বেয়ে নামা চোখের জলে ভাত ভিজে উঠলো। সিস্টার পিঠে হাত বুলিয়ে হাতে ধরে খেতে বললেন। সত্যিই কি সর্বগ্রাসী ক্ষুধা আমাকে পেয়ে বসলো জানি না। ওই ভাত-তরকারি অমৃত জ্ঞানে খেলাম। মনে হলো আমি বেঁচে গেছি। কিন্তু জানতাম না তখনও যে কত মরণ আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তিন-চারদিন ওখানে থাকবার পর একজন ডাক্তার আমাকে জানালেন আমি গর্ভবতী। আমি কোথায় কার কাছে যেতে চাই? ঠোঁট চেপে বললাম, কারও কাছে নয়, আমার মতো দুস্থ মেয়েদের জন্য আপনারা যে ব্যবস্থা করবেন আমার জন্যেও তাই করুন। আপনার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই? জিজ্ঞেস করলেন মমতাময়ী চিকিৎসক। না সূচক মাথা নাড়লাম। তিনিও বুঝলেন।

প্রায় মাসখানেক পর আমি ধানমন্ডি পুনর্বাসনকেন্দ্রে এলাম, যেখানে বহুবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে থাকতে বেশ কৌতুহলী নারী-পুরুষের ভীড় হতো আমার সামনে। জিজ্ঞেস করে জানলাম–ওরা বীরাঙ্গনা দেখতে আসে। সিস্টার সবিস্তারে ব্যাপারটা আমার কাছে ব্যাখ্যা করলেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যেসব রমণী মাতৃভূমির জন্য তাদের সতীত্ব, নারীত্ব হারিয়েছে তিনি তাদের বীরাঙ্গনা আখ্যায় ভূষিত করেছেন। অন্তরের শ্রদ্ধা জানালাম সেই মহানায়কের উদ্দেশে। আমি বীরাঙ্গনা, এতোবড় সম্মান আমি পেয়েছি। আমি ধন্য কিন্তু চোখের জল কেন জানি না বাঁধা মানে না। বাবাকে দেখবার জন্য, তাদের খবর নেবার জন্য অস্থির হয়ে গেছি। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য এমন কাউকে দেখি না যাঁকে অনুরোধ করা যায়। শেষে পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যনির্বাহী অফিসার মোসফেকা মাহমুদকে বাবার ঠিকানা দিলাম। পথের দিকে তাকিয়ে থাকি, যেন খবর পেয়েই বাবা ছুটে আসবেন। কিন্তু না দিন গড়িয়ে সপ্তাহ গেল। খবর পেলাম বাড়িঘর ভেঙে

গেছে সেসব মেরামত করা নিয়ে বাবা ব্যস্ত, আসবেন কয়েক দিনের মধ্যে। শুধু উচ্চারণ করলাম, 'বাবা তুমিও'। এখন বাইরের লোক দেখলেই সরে যাই। শেষপর্যন্ত সেই যে পোলিশ লেডী ডাক্তার ছিলেন তাকে ধরলাম আমাকে কাজ শেখাবার জন্য। তিনি সানন্দে রাজি হলেন। সব চিন্তা বিসর্জন দিয়ে কাজে লাগলাম।

ইত্যবসরে আমার গর্ভপাত করানো হলো। আমি কঠিন মুখে প্রস্তুতি নিলাম। কারণ এতোদিনে নিজের অবস্থান বুঝতে পেরেছি। আপা, আপনি তো দেখেছেন মেয়েরা কিছুতেই গর্ভপাতে রাজি হয় নি। সন্তান আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছে। নারীর প্রচণ্ড দুর্বলতা, কারণ জীবনে মা হবার আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি নারীর সহজাত কামনা। কিন্তু এ সন্তান নিয়ে যাবো কোথায়? আপনার মনে আছে মর্জিনার কথা? সেই যে, পনেরো বছরের ফ্রক পরা মেয়েটি, যে কিছুতেই তার ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে চায় নি। আপনাকে দেখলেই চিৎকার করতো ওর ছেলে চুরি করবেন এই ভয়ে। শেষপর্যন্ত ছেলেকে পাঠানোও হলো। কিন্তু তারপর আপনি আর ওখানে বিশেষ আসতেন না, কেন আপা? আপনার কি কষ্ট হয়েছিল? মাথাটা নামিয়ে বললাম, তারা আমি এ জীবনে যতো কঠিন কাজ করেছি মর্জিনার ছেলেকে সুইডেনে পাঠানো বোধহয় তার ভেতর সবচেয়ে কষ্টদায়ক। বঙ্গবন্ধুকে যখন বলেছিলাম উনি বললেন, 'না আপা, পিতৃপরিচয় যাদের নেই সবাইকে পাঠিয়ে দেন। মানুষের সন্তান মানুষের মতো বড় হোক। তাছাড়া ওই দূষিত রক্ত আমি এদেশে রাখতে চাই না। ওদের খ্রিস্টান করে নেবে এই বলে অনেক পরামর্শদাতা বঙ্গবন্ধুকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। আমি পৃথিবীতে একাই লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

হঠাৎ বাবা এলেন। বাবা যেন এক বছরে কেমন বুড়ো হয়ে গেছেন। দু'হাত শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। ঠিক একদিন এমন করে আমরা ৭/৮ জন বঙ্গবন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলাম অফিসের মাধ্যমে। সেদিন আমাদের চোখের জলে বঙ্গবন্ধুর বুকটা ভিজে গিয়েছিল। বলেছিলেন, 'তোরা আমার মা, জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছিস। তোরা শ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনা। আমি আছি, তোদের চিন্তা কি? সত্যিই সেদিন মনে হয়েছিল আমাদের বঙ্গবন্ধু আছেন, আমাদের চিন্তা কি? কিন্তু বাবার বুকে তো সে অশ্রুপাত করতে পারলাম না। আমার মাথায় রাখা বাবার হাতও তো তেমন কোনও আশ্বাস দিলো না। মুখ তুলে বললাম – বাবা এখন কি তোমার সঙ্গে আমি যাবো? অফিসে বলতে হবে। বাবা একটু থেমে ইতস্তত করে বললো, না মা, আজ তোমাকে আমি নিতে পারবো না। বাড়িঘর মেরামত হচ্ছে। তোমার মামাও এসেছে। কালী আসবে জামাইকে নিয়ে। ওরা চলে গেলে আমি তোমাকে নিয়ে যাবো মা। আস্তে করে বাবার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে

মুক্ত করে নিলাম। ঠিক আছে বাবা তুমি আর এসো না। বাবা না, না বলে আমতা আমতা করতে লাগলেন। আমার হাতে একটা ফলের ঠোঙা দিলেন। ওটা স্পর্শ করতে মন চায় নি। কিন্তু ফেলে দিয়ে নিজেকে হাসির পাত্র করতে চাইলাম না। বাবা আবারও এসেছেন, কিন্তু আমাকে নেবার কথা বলেন নি। দাদা এসেছে কলকাতা থেকে আনা শাড়ি নিয়ে। এমন কি শ্যামলদাও এসে বীরাঙ্গনা দেখে গেছে। দাদা অবশ্য একটা কথা বলে গেলেন যা বাবা মুখ ফুটে বলতে পারে নি। দাদা বললো, তারা, আমরা যে যখন পারবো তোর সঙ্গে দেখা করে যাবো। তুই কিন্তু আবার হুট করে বাড়ি গিয়ে উঠিস না। আমার মুখের পেশিগুলো ক্রমশ শক্ত হয়ে আসছিল। দাদা সে-দিকে এক নজর তাকিয়ে চট্ করে বললেন, তাছাড়া আমাদের ঠিকানায় চিঠিপত্র লিখিবারও দরকার নেই। তুই তো ভালোই আছিস। আমিও চাকুরি পেয়েছি, সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছি তা দিয়ে বাড়িঘরও মেরামত হয়েছে। ওপরে দুটো ঘরও তোলা হয়েছে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালাম, ওর দিকে আর তাকাই নি। তারপর যখন দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে তখন আর আমি হতভাগিনী তারা নই, গর্বিতা মিসেস টি. নিয়েলসেন।

আমার জিভ শুকিয়ে আসছে। তারার গ্লাসটা ভরে দিয়ে নিজেরটাতেও চুমুক দিলাম। আমাকে জিজ্ঞেস করতে হলো না, ও নিজেই একটু থেমে আবার শুরু করলো, আমার ভেতর প্রচণ্ড একটা ঘৃণা ও জেদ এক সঙ্গে কাজ করছিল মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু দেখে। মর্জিনা বলেছিল ওর স্বামী সরকার থেকে ওর এ অবস্থার জন্যে টাকা পেয়েছে। বাবা, দাদাও কি তাহলে আমার সতীত্ব-মাতৃত্বের দাম নিয়েছে সরকারের কাছে থেকে। বাড়ি মেরামত করেছে, ওপরে ঘর তুলেছে, ওরা ও ঘরে থাকবে কি করে? তারা নামের একটি মেয়ে আঠারো বছর যে বাড়ির প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে ছিল তাকে ওরা অনুভব করবে না? অথচ আমি তো চোখ বুঁজলেই পশ্চিম কোণের বৃষ্টি ধোয়া কদমফুলের গাছটা দেখতে পাই। চৈত্র-বৈশাখে মালদার আম-গাছের মৌলের সৌরভ বাতাসে উপলব্ধি করি। না, বাস্তব বড় কঠিন। আমি বীরাঙ্গনা, আমাকে নিজের পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে হবে। সেই যে পোলিশ মহিলা ডাক্তার যিনি আমাকে মাতৃত্বের সর্পবেষ্টনী থেকে মুক্ত করেছিলেন, যাঁর সঙ্গে আমি আজ ছ'মাস কাজ করছি তাঁকে শক্ত করে ধরলাম। আমাকে উনি কোনও রকমে বিদেশে যাবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কিনা। বাইরে যেতে না পারলে আমি মরে যাবো। এ সমাজ আমাকে গ্রহণ করবে না। আমার পরিবারের সব আচরণ আমি ওঁকে খুলে বললাম। উনি স্তম্ভিত হলেন। ব্যথায় ওর সুন্দর মুখখানা ম্লান হলো। আমাকে কাছে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, সাহস হারিও না, তুমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তুমি তো জানো না, পঙ্গু হাসপাতালে কতো তরুণ চিরকালের

জন্য বিছানা পেতেছে। আমি তোমার জন্য চেষ্টা করবো মাই চাইল্ড। একটু ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেলেন। ওঁর শাড়িপরা হালকা শরীরটা ধীরে ধীরে চেয়ারম্যানের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বুঝলাম ওঁকে দিয়ে যা করাবার দ্রুত করাতে হবে কারণ ওঁরা আর চারমাসের বেশি থাকবেন না। গর্ভপাতের রুগী শেষ হয়েছে, এখন তো সন্তান প্রসব করানো, সে তো দেশী ডাক্তার দিয়েও হবে।

সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি নার্সিং-এর কাজ করে যাই। ডাক্তার দেখলেই হাসিমুখে উৎসাহ দেন, সবার কাছে আমার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। তারপর একদিন আমাকে জানালেন পোল্যান্ডে নার্সিং শিখবার জন্য তিনি একটি বৃত্তি যোগাড় করেছেন। আমাকে একটা আবেদনপত্র দিলেন পূরণ করে দেবার জন্য। পরদিন আমাদের বোর্ডের চেয়ারম্যান বিচারপতি সোবহানের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন এবং একখানা সুপারিশপত্রও চাইলেন। চেয়ারম্যান সাহেব খুবই সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন।

হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন, তারা, শিগ্‌গির তৈরি হয়ে এসো, আমার সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরে যেতে হবে। উত্তেজনায় আমার হাত-পা কাঁপছিল। এ মাসে এ আমার দ্বিতীয়বার পথে বেরুনো। একবার গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর ওখানে গণভবনে আর এবার সেক্রেটারিয়েটে। ইন্টারভিউ হলো। আমি কিছুতেই বাবার নাম বললাম না। ভদ্রলোক সব বুঝলেন, তবে আবেদনপত্রে নামটি লিখেছি। বাইরে এসে ডাক্তার শক্ত করে আমার হাত ধরলেন। বুঝলাম আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। এক মাসের ভেতর আমার ছাড়পত্র এসে গেল। সব খরচ এরা দেবেন। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত বলে কিছু বিশেষ সুবিধাও দেবে। জুলাইমাসের এক বিকেলে আমার আপন বলতে যা ছিল অতীতের সঙ্গে সব অতল জলে ডুবিয়ে দিয়ে আমি এয়ারফ্লোটে উঠে বসলাম। অন্তরে উচ্চারণ করলাম, 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু'। তোমার দেওয়া বীরাঙ্গনা নামের মর্যাদা আমি যেন রক্ষা করতে পারি। একদিন আমি মাথা উঁচু করে এসে তোমাকে সালাম জানিয়ে যাবো। না, মাথা উঁচু করে বহুবার এসেছি, কিন্তু তোমাকে সালাম করতে পারি নি। তুমি তখন আমার স্পর্শের অতীত।

আপা আপনাকে বিরক্ত করছি নাতো? বিস্ময়ে চমক ভেঙে বললাম – না, না বলো, আমি এতো মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম যে মনে হচ্ছে আমিও সেই '৭৩ সালে তোমার সঙ্গে এসেছি। সোফিয়া আমার খুব ভালো লেগেছিল। সুন্দর দেশ, দেশবাসীর ব্যবহার সুন্দরতর। আমাদের মতোই অতিথি পরায়ণ। ওখানে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েও দেখলাম। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে এখানে আসার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে দেখলাম অধিকাংশই বিত্তশালীর পুত্র-কন্যা, তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। কিছু ছিল রাজনৈতিক

নেতাদের আত্মীয়-স্বজন, এমনকি পুত্র-কন্যাও। আমার মতো আঘাতপ্রাপ্ত এখানে কেউ আসে নি অর্থাৎ আসবার পথ পায় নি। আমার সব কৃতজ্ঞতা ওই ডাক্তারের কাছে। আচ্ছা আপা, আপনারা কি আমার মতো কাউকে বিদেশে যেতে সাহায্য করেছেন। মাথাটা নত হলেও সত্যি কথা বললাম –না, কারণ এমন কেউ আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে আসে নি। কেন? আপনি, বাসন্তীদি, মমতাজ বেগম–আপনারা তো সব সময়েই বোর্ডে আসতেন, তবে কেন এ ধরনের চেষ্টা করেননি? তারা, দেশ ছেড়ে যাবার মতো মানসিক প্রস্তুতি সম্ভবত তাদের ছিল না। মাটি আর মানুষকে ভালোবেসেই তারা ওখানে থাকতে চেয়েছিল। বঞ্চনার স্বরূপ তখনও তারা দেখে নি। যাক্ তোমার কথাই বলো।

মাস তিনেকের ভেতরই একটি বাঙালি মেয়ে আমার পেছনে লাগলো। জানি না কিভাবে জেনেছে, অথবা আমার আচার আচরণ, মন-মানসিকতা থেকে বুঝেছে আমি সহজ স্বাভাবিক পরিবার থেকে আসি নি। আমার কোনও চিঠিপত্র এ তিনমাসে আসে নি। ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যাই। সুতরাং আমি ভালো মেয়ে নই। দু'এক করে কথাটা ইন্সটিটিউটে ছড়ালো। পোলিশ ছেলে-মেয়েরা আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে নি, কিন্তু অতিরিক্ত শ্রদ্ধা দেখিয়েছে। আমি মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলাম, তাই গর্বভরে মনে মনে উচ্চারণ করতাম আমি 'বীরাঙ্গনা'। পরে একটি বাঙালি ছেলে বললো যে ঐ মেয়েটি একজন মুসলিম লীগ নেতার মেয়ে। দেশে ফিরে যাবার অসুবিধা তাই নিজের ভোল পাল্টে একজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে ধরে ঐ মেয়েকে এখানে পাঠিয়েছে। দেখো না ও পড়ালেখা কিছুই করে না। দেশের অবস্থা শান্ত হলেই ফিরে যাবে। ছেলেদের কাছ থেকে অবশ্য খারাপ ব্যবহার পাই নি।

পরের বছর হাতে কিছু টাকা জমলো। ভাবলাম দু'একটা দেশ দেখবো আমার সঙ্গে ডেনমার্কের এক মেয়ে পড়তো ও আমাকে ওর দেশে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। বললো শুধু প্যাসেজ মানি ছাড়া তোমার আর কিছু লাগবে না। আমাদের সঙ্গেই থাকতে পারবে। ডানার কথায় নেচে উঠলাম। ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে আমি ডানার সঙ্গে কোপেনহেগেনে পা রাখলাম। ওর বাবা এয়ারপোর্টে আমাদের নিতে এসেছেন। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে ভরে দিলেন। আমার সঙ্গে হাত মেলালেন হালকা করে। চুমুও দিলেন ডানার বাবা মি. হ্যারি, খাটো কিন্তু বেশ সুঠাম স্বাস্থ্যবান দেহের অধিকারী। তবে তার চুল বেশ হালকা-মাঝখানে টাক আলো পড়লে বোঝা যায়। তবে কেশের দৈন্য পুষিয়ে নিয়েছেন লালচে মোটা গোঁফে। একখানা পিক আপ ভ্যানে এসেছেন ওর বাবা। ওদের গ্রাম শহর থেকে মাত্র বাইশ কিলোমিটার দূরে। বাবা-মেয়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে নিজেদের ভাষায়, যার একবর্ণও আমি বুঝি না। আমি বাইরে তাকিয়ে একটা অনন্ত নীল আকাশ, শ্যামল

বনানী আর আমারই মতো উড়ে যাওয়া ক'টা পাখি দেখলাম।

বাড়িটা আমার খুব পছন্দ হলো। দেড়তলা বাড়ি। পাকা গাঁথুনি তবে ছাদটা আমাদের দেশের টালির ছাদের মতো ঢালু। ওটা শীতের দেশের উপযোগী করে করা যেন বরফ না জমে। দেড়তলায় নিচু ছাদের একটা ঘর। দু'পাশে হালকা দু'টো খাট বিছানো। সম্ভবত আমি আসবো বলে ঠিক করে রাখা হয়েছে। টয়লেট অবশ্য একতলায়। সামনে দু'পাশে বেশ জমি এবং জমির সীমানায় একটি ছোট্ট ঘর। যাই হোক, হাত ধুয়ে, লাঞ্চ খেতে বসলাম। ডানার মা, বাবার তুলনায় একটু বয়স্কা মনে হয়, বছর ষোলো বয়সের এক ভাই আর বছর চারেকের সবচেয়ে ছোট ভাই। ডানার বাবা ব্যাংকে কাজ করেন মা স্কুলের শিক্ষিকা। বড়ভাই সামনের বার স্কুল ফাইনাল দেবে আর ছোটটা একেবারে কিন্ডারগার্টেনে। বড়ভাই সম্ভবত উইলিয়াম, ছোটটির নাম স্যালী। ওর মা বলেলন, ও কিন্তু জন্মেছিল তোমার দেশে। আমরা যখন ওকে নিয়েছি তখন এর বয়স সতেরো দিন, তাইনা? বলে স্বামীর সমর্থন চাইলেন। খাওয়া খুব সাদাসিধা। রুটি, বাঁধাকপি আছে সেদ্ধ আলু দিয়ে বিরাট একটা কাঁচের বাটি ভর্তি সালাদ, আর পাতে বিফস্টেক। সঙ্গে ওয়াইন, তবে উইলিয়াম আর স্যালীকে দুধ দেওয়া হলো। খাবার পর একটু বিশ্রাম নিতে গেলাম।

পাঁচটায় ওর বাবা ওকে ডেকে ওঠালেন। চা খেয়ে নিয়ে গেলেন একটা লং ড্রাইভে। সন্ধ্যায় স্থানীয় একটা ছোট্ট ক্লাবে গান বাজনার আসরে উইলিয়াম গীটার বাজালো। ওর বাবা-মা সহ আমরা সবাই নাচলাম। সোফিয়াতেই মাস দু'য়েকের ভেতর এটা রপ্ত করে নিয়েছিলাম। ড্রিঙ্কস ওর বাবা কিনে সবাইকে দিলেন, স্যালী খেলো অরেঞ্জ জুস আর পটেটো চিপস্। দেখতে দেখতে সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন দাওয়াত এলো তোমার বান্ধবী এ্যালিনের বাড়ি থেকে। আমি আগেই বলেছি আর তুমিও জানো এ্যালী সাংবাদিক। ডানাদের সঙ্গে ওদের কি যেন একটা আত্মীয়তা আছে, ও দেশের লোক ওটার হিসাব রাখে না, তবে সেই সূত্রে পারিবারিক সম্পর্ক এবং ঘনিষ্ঠতা বেশ নিবিড়।

এ্যালীর এ্যাপার্টমেন্ট কোপেনহেগেনে। ডানাই ওদের ছোট গাড়িটা চালিয়ে এলো। তখন সন্ধে সাতটা। আকাশে সূর্য মনে হয় মাঝখানে। একেবারে দুপুরের মতো আলো, ঐ পথের আলো বোধহয় আমার জীবনের আলোর রশ্মি দেখিয়েছিল। এ্যালীর এ্যাপার্টমেন্ট বেশ ছোটই। ঢুকতেই বসবার মতো ছোট্ট একটু জায়গা। খান চার পাঁচ গদী মোড়া চেয়ার। তারপর ঢুকতেই খাবার ঘর, মাঝারি টেবিল, টেবিল ঘিরে ছ'টা চেয়ার, একপাশে রান্নার ব্যবস্থা চুলা, ও-পাতিল রাখার জায়গা। বাঁ দিকে দরজা নেই কিন্তু পাতলা পর্দার ব্যবধান আছে এবং ওটাই বসবার জায়গা। দু'তিনজন গল্প করছিলেন আমাদের দেখে হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখলেন। এ্যালী

আমার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথম ব্যক্তি হ্যানসেন এ্যালীর স্বামী, দ্বিতীয় মহিলা ক্রিস্টিন আইনজীবী, তৃতীয় জন সাংবাদিক নিয়েলসেন। আমার হাতটা ওর হাতের ভেতর কি একটু কেঁপে উঠেছিল? নাকি ওটা বুকের কাঁপুনির প্রতিক্রিয়া।

বাড়ি ফিরলাম প্রায় রাত একটায়। আজ ঢাকার রাস্তার কথা ভাবি। রাত একটা দূরের কথা, গতবার তো দুপুর একটায় আমাদের চোখের সামনে মতিঝিলে এক ভদ্রলোককে ছুরি মেরে তাঁর ব্রিফকেস নিয়ে গেল। অবশ্য এতো ১৯৭৪ সালের কথা বলছি, ঢাকাও তখন এমনটি ছিল না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ডানা বললো, তারা, তোমার ভালো লাগেনি না? আমি ওর কাঁধে একটা চাপ দিয়ে বললাম, এতো ভালো সন্ধ্যা আমি আমার জীবনে উপভোগ করি নি। ডানা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। বললো, আমাদের আরও অনেক ভালো বন্ধু আছে কিন্তু এখন সামারে সবাই বাইরে গেছে ছুটি ভোগ করতে। তবে ঐ যে আইনজীবী মহিলাকে দেখলে, উনি ঠিক আসবেন আমাদের বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। উনি সমাজসেবামূলক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশ, তাদের মেয়েদের অবস্থা, এসব জানতে চাইবেন। আর আশা করি নিয়েল আসবে নিজের গরজে। কেন, নিজের গরজে কেন? হয়ত অলক্ষ্যে আমার মুখে কিছুটা লজ্জার ছাপ পড়েছিল। ডানা হেসে বললো এখন বুঝলে তো নিজের গরজ।

স্বপ্নের মতো কুড়িটা দিন কাটিয়ে এলাম যেন বাবা-মা-ভাই-বোনের সঙ্গে। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, যাদের তিন-চারটি সন্তান আছে তাদেরও পালক পুত্র আছে এবং বুঝবার উপায় নেই কে পালিত আর কে গর্ভজাত। এক মহিলা ডানার মাকে তাদের পালিত পুত্রের যে প্রশংসা করলেন আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আবার এক সকালে ওর বাবা আমাদের এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে গেলেন, সঙ্গে ওর মা। নিয়েল এসেছিল, কথা ও বেশি বলে না। শুধু বলেছিল সোফিয়াতে দেখা হবে শিগ্‌গির। ও ডানার গালে চুমু খেলো, আমার শুধু হাতটাই ধরেছিল। তাকিয়ে রইলাম আমি যতোদূর দৃষ্টি যায়। ঢাকা ছেড়ে আসবার দিন একবারও চোখে জল আসে নি। আজ যেন কিসের অভাবে আমার সমস্ত বুকজুড়ে সুখের অনুভূতি নামলো আমার দু'গাল বেয়ে। ডানার বাবা-মা জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন, আবার আসতে বললেন, এ তোমার নিজের বাড়ি যখন অসুবিধা হবে চলে এসো। হ্যাঁ, আজ ওবাড়ি আমার নিজের বাড়ি। ওটাই ডেনমার্কে আমার বাপের বাড়ি আপা। আপনি তো দেখেছেন ওরা কেমন মানুষ। আর স্যালীর জন্য কেমন একটা মমতা অনুভব করি। স্যালী তো এখন পড়ছে। বড় হবে, উপার্জন করবে, বিয়ে করলে একটা পূর্ণ সুখী জীবন পাবে। আপা, আপনার মনে আছে এখান থেকে নার্সরা গিয়ে নিয়ে এসেছিল এদের।

বঙ্গবন্ধুর কতো সমালোচনা হয়েছে তখন। উনি নাকি বলেছিলেন কার ধর্ম কি হবে জানি না, তবে মানুষের মতো বাঁচতে পারবে। সত্যিই তাই, স্যালী জানে ও ডেনিশ আর এখানকার জন্মানো একজন নাগরিকের সঙ্গে সব কিছুতে ওর সমান অধিকার।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে আপনি এসেছিলেন মেক্সিকো যাবার পথে। পদ্মিনী ও আপনারা আর কয়েকজন গেলেন, আমি তখন এখানে এসে গেছি। অর্থাৎ নিয়েল চেষ্টা করে কোপেনহেগেনের বড় একটা হাসপাতালে আমার চাকুরির ব্যবস্থা করে দিল। নার্সদের কোয়ার্টারে জায়গা পেলাম। উইকেন্ডে কিছু কিনে নিয়ে ডানাদের বাড়িতে যাই আমরা দু'জনে মিলে। সারাদিন থেকে নিয়েল আমাকে সন্ধ্যায় নামিয়ে দিয়ে যায়। ওর সঙ্গে সিনেমা দেখি, অপেরাতে যাই, আর ঘরে সময় পেলেই ডেনিশ ভাষা রপ্ত করি। কথাটা শিখতে খুব বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু লেখাপড়ায় যথেষ্ট সময় লেগেছে আমরা ঠিক করেছিলাম ঐ সামারে আগস্ট মাসের শেষের দিকে বিয়ে করবো। এর ভেতর বহুবার নিয়েলদের বাড়িতে গেছি। ওর বাবা প্রথিতযশা চিকিৎসক, মা আমারই মতো নার্স থেকে এখন মিডওয়াইফ–এ তো আর আমার দেশ নয়! নার্স, মিডওয়াইফ এদের যথেষ্ট সম্মান সমাজে। বড় এক বোন আছে ওর। বিয়ে করে ওরা এখন অস্ট্রেলিয়াতে ঘর করছে। ছোট ভাইও ডাক্তার। যখন তখন ওদের বাড়িতে যাই। আমি ওদেরই একজন। ওর বাবা-মা সব বিবেচনা করে ১৬ আগস্ট বিয়ের দিন ঠিক করলো। মহাসমারোহে যখন বিয়ের পর প্রকৃত বীরাঙ্গনার গর্ব নিয়ে মধুচন্দ্রিমায় গেছি তখন সেই ছোট কুঞ্জকাননে বিবিসির সংবাদে শুনলাম বঙ্গবন্ধু নেই। মনে আছে নিয়েলের বুকে মাথা দিয়ে আমি শিশুর মতো কেঁদেছিলাম আমার পিতৃবিয়োগের ব্যথা-বেদনায়। উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, এই বীরাঙ্গনা তুই আমার মা সে মুখ আমি আজও ভুলি নি। আমি বঙ্গবন্ধুর মা এই অহংকারই আমাকে জীবনযুদ্ধে জয়ী করেছে। ভাবলাম–না, নিজেকে আর বাঙালি বলে পরিচয় দেবো না। আমরা পিতৃহন্তা!

নিয়েলের ভালোবাসা ওদের স্নেহ-মমতা আমার অতীতকাল মুছে ফেললো। আশি সালে নিয়েল হঠাৎ প্রস্তাব দিলো ও একটি ছেলে দত্তক নিতে চায় যদি আমার সম্মতি থাকে। সমাজকল্যাণ দপ্তরে দরখাস্ত, হাঁটাহাঁটি অনেক চেষ্টা চরিত্র করে টমাসকে পেলাম। ও আইরিশ। গৃহযুদ্ধে বোমা পড়ে ওর বাবা-মা নিহত হয়। কেমন করে ও ডেনমার্কে এসেছে আমি ঠিক জানি না। তবে ওর মা ওকে হাসপাতালে দেখে নিয়েলকে জানান। কারণ ওকে এ বয়সে দত্তক দেবে না। ওখানে ইচ্ছে করলেই কিন্তু দত্তক নেওয়া যায় না। বিবাহিত দম্পতি এক সঙ্গে থাকতে হবে, বাচ্চা মানুষ করার মতো আর্থিক সঙ্গতি থাকতে হবে, উপযুক্ত লোকের দেওয়া চরিত্র সম্পর্কিত প্রশংসাপত্রও লাগবে। সবই হলো। আমরা টমাসকে দত্তক নেবার মতো সক্ষম

দম্পতি বলে বিবেচ্য হলাম। টমাসকে পেয়ে নিয়েল মহাখুশি। আমি একটি মেয়ে প্রত্যাশা করেছিলাম। ওকে সাজাবো, আদর করবো, মনের মতো করে বড় করবো। আমার শাশুড়ি তো মুখ ফুলিয়ে রইলেন। যাক কয়েক ঘণ্টার ভেতর টমাস আমাদের ব্যস্ত করে তুললো। বার বার নিয়েলকে বাইরে যেতে হলো ওর প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আনতে। আমার সমস্যা ছিল ভাষার ব্যবধান। পরদিন ওকে নিয়ে খেলনার দোকানে গেলাম তারপর চকোলেট কিনতে। মুহূর্তে আমরা খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম। দু'বছর পর নিয়েল একটা আমন্ত্রণ পেলো দিল্লী থেকে। আমাকেও সঙ্গে নিতে চাইল টমাসসহ। রাজি হলাম। আমাকে দেখলে কেউ চিনতে পারবে না। আমি তো স্কার্ট ব্লাউজ অথবা জিনস্ পরি, চেহারাও বদলে গেছে। ঠিক করলাম যাবো।

১৯৮২ সালে দিল্লীতে এলাম। সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়ে যেন দেশের আকাশ-বাতাস স্পর্শ করলাম। হোটেল অশোকা নির্ধারিত ছিল। এসে উঠলাম। নিয়েলের একটা মিটিং ছিল সন্ধ্যা ছ'টায় ঐ হোটেলের লাউঞ্জে। আমি কলকাতায় দিদিকে ফোন করলাম। বললাম স্বামীর সঙ্গে এসেছি ছেলেকে নিয়ে। সায়েব বিয়ে করেছি শুনে দৌড়ে জামাইবাবুকে ডেকে আনলো। জামাইবাবু মনে হয় ফোনের ভেতর দিয়েই আমাকে টেনে নেবেন। বললাম তিনদিন নিয়েলের কনফারেন্স তারপর কলকাতা যাবে। যাবার আগে ফ্লাইট নাম্বার জানিয়ে ফোন করতে বললো! আমি নিয়েলকে সব বললাম। নিয়েল খুব খুশি হলো। বললো এবার বাঙালি জামাই হয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে। নিয়েল ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। টমাস ইংরেজি গোটা কয়েক শব্দ জানে। তার বেশি এখনও আয়ত্ব করতে পারে নি।

দিল্লী থেকে দিদির জন্য শাড়ি আর জামাইবাবুর জন্য শাল কিনলাম। বাবার জন্যেও একখানা শাদা শাল কিনতে চাইলাম কিন্তু না যদি ও পর্যন্ত পৌছাতে না পারি তাহলে একটি বাড়তি দুঃখ থেকে যাবে। বাচ্চারা ক'জন কতো বড় হয়েছে জানি না। থাক, কলকাতায় কতো কিছু পাওয়া যায়। এই দিদিকেই পোল্যান্ড থেকে ফোন করেছিলাম। দিদি ছিঃ বলে ফোন ছেড়ে দিয়েছিল। না, আমার অতীত মৃত। আমি বর্তমান মিসেস টি. নিয়েলসেন।

দিদি, জামাইবাবু ঠিকই এয়ারপোর্ট এসেছেন। দিদি বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো। আমার চোখে এখন আর জল আসে না। সব ঝরে ভাণ্ডার শুকনো হয়ে গেছে মনে হয়। সোজা ওদের বাসায় গিয়ে উঠলাম ভবানীপুরে। ফ্ল্যাটটা মোটামুটি মন্দ না। আমরা অবশ্য হোটেলেই থাকবো দিল্লী থেকে বুকিং করে এসেছি। হোটেল পার্ক স্ট্রীটে। চা খেয়ে দিদিকে বললাম সে কথা। দিদি কিছুতেই শুনতে চায় না। জামাইবাবু বুঝলেন। বললো, ওরা ক্লান্ত, যাক মুখ-হাত ধুয়ে স্নান সেরে এসে রাতে এখানে খাবে আবার সকালে উঠেই চলে আসবে। রাগ হলো। দিদি পাশের ঘরে

টেনে নিয়ে বললো, তুই ভাগ্যবতী, বড় সুন্দর জামাই হয়েছে তোর। আর ছেলেটাও যেন কার্তিক। হ্যাঁরে রাজশাহী যাবি না। আমি কেঁপে উঠলাম। বললো, কাল বাবাকে ফোন করেছিলাম। বাবা-মা দু'জনেই বারবার করে তোদের যেতে বলেছেন। কোনও অসুবিধে হবে না। জামাই মনে মনে হাসলেন কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে কিছু বলবে। বাবার নাম্বার নিলাম ওর কাছ থেকে। ভাবলাম নিজেই ফোন করে সঠিক অবস্থা জেনে নেবো। যে লাঞ্ছনার জীবন পেছনে ফেলে এসেছি, স্বামী-সন্তান নিয়ে সে কালি আর গায়ে মাখবো না।

পরদিন সকালে বাবাকে ফোনে পেলাম। বাবা হাউ মাউ করে শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন। শুধু বারবার বলতে লাগলেন মাগো, আমায় ক্ষমা কর। বললাম আগামী পরশু ঢাকা যাবো। তুমি কষ্ট করে ঢাকায় এসো না, আমি ঢাকা পৌঁছে ফোন করবো। মাকে ফোন দিতে বললাম মার গলা পেলাম,শুধু মা মা করে কয়েকবার ডাকলেন এবং ডুকরে কেঁদে উঠলেন। নিয়েলকে সব বললাম। ও অবশ্য আগেই ঢাকায় প্রোগ্রাম করে রেখেছিল কারণ '৭১ সালের পর ও আর ঢাকায় যায় নি। তাই ও আনন্দে রাজি হয়ে গেল। এয়ারপোর্টে বাবা, দাদা আর ওর এগারো বছরের ছেলে জয় উপস্থিত ছিল। এতো সাদর অভ্যর্থনার পরও দাদার শ্বশুরবাড়িতে উঠতে রাজি হলাম না। হোটেল বুকিং নিয়েল আগেই করে এসেছিল। তাই সবাই শেরাটনে গেলাম, খাওয়া দাওয়া সেরে বাবাকে চলে যেতে বললাম। আমরা ক'দিন ঢাকা থেকে যাবো। বাবা কিছুতেই রাজি হলেন না, বললেন একা ফিরে গেলে মা তাকে বাড়ি ঢুকতে দেবেন না। অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য ওরা চলে গেলে আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে সাভার গেলাম জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে, ফিরে এসে বত্রিশ নম্বরের সামনে দাঁড়ালাম। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ফিরে এসেছেন। পুলিশ পাহারা আছে, তবে ঢুকতে দেয়। ভাবলাম ফিরে যাবার পথে নিয়েল অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই এ বাড়িতে আসবে, তখন আমিও অনুমতি পাবো ঢুকবার জন্য। টমাসকেও দেখানো দরকার। আমি কখনও ভুলি না ও ডি ভ্যালেরার দেশের ছেলে। জিদ্দীও হয়েছে খুব। গেটের সামনে থেকে কিছুটা ধুলা তুলে নিজের ও টমাসের কপালে মাখালাম। নিয়েল নিজেই নিজের কপালে ধুলো ছোঁয়ালো। ও বঙ্গবন্ধুকে দেখেছে, কথা বলেছে। তাই ও যথেষ্ট আবেগতাড়িত ছিল। শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ফিরে এসে যাত্রার প্রস্তুতি নিলাম। এবার রাজশাহী পর্ব। আমার জীবনের সর্বকঠিন অগ্নিপরীক্ষা।

ফিরবার পথে বাবা অনর্গল কথা বলে চলেছেন। একপাশে টমাস, এক পাশে দাদার ছেলে জয়। মনে হলো টমাসের নামকরণ যদি আমি করতাম তাহলে হয়তো জয় রাখতাম। মেয়ে হলে রাখবো জয়া। সেখানেও পরাস্ত হয়েছি। শাশুড়ি আগেই নাতনির নাম ঘোষণা করেছেন তারার মেয়ে হবে নোরা, মায়ের মতোই দৃঢ়চেতা

সংস্কারমুক্ত, তাঁর আবেগ ও যুক্তি কোনোটাকেই আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি। আমি বাবার দিকে তাকিয়েই আছি। ট্রেন চলছে দ্রুত গতিতেই। বাবা টমাসের সঙ্গে কখনও বাংলা কখনও ইংরেজিতে কথা বলছেন। নিয়েল নিচু গলায় দাদার সঙ্গে আলাপ করছে। আমি দীর্ঘ দশ বছর পর ফিরে গেছি শৈশবে। মনটা এখন বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাদা একটা বুদ্ধির কাজ করেছিল। বাড়িতে কাউকে জানায় নি আমরা কোন ট্রেনে আসবো। এটা দাদার আত্মরক্ষার প্রয়াস কিনা জানি না তবে অতিরিক্ত হৈ চৈ নিয়েল পছন্দ নাও করতে পারে।

খুব ধীর পায়ে গেট ঠেলে সবার আগেই ঢুকলাম। বাড়ির চেহারা পাল্টে গেছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের চিহ্ন বর্তমান। বাবা বাগানের যত্ন বাড়িয়েছে মনে হয়। তেমনই বেড়ার গা দিয়ে সারিবদ্ধ রজনীগন্ধা আর দোলনচাঁপা। আর চাইতে পারলাম না। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। গাড়ির শব্দ পেয়ে মা বেরিয়ে এলেন। প্রণাম করবার জন্য মাথা নিচু করতেই মা সন্তানহারা জননীর মতো আর্তনাদ করে উঠলেন। মাকে টেনে ভেতরে নিলাম। নিয়েলও আমার মতো নিচু হয়ে মায়ের পা ছুঁতে গেল। মা জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বেঁচে থাকো বাবা। এরপর সবটুকু যত্ন, ভালোবাসা, আদর সোহাগ পেলো টমাস। মা বললেন টমাস তার বাবা-মা কারও মতো হয় নি। হয়েছে তার দাদুর মতো অর্থাৎ আমার বাবার মতো। হবে না কেন রক্তের ধারা বইছে না! ওদের আনন্দ গর্ব নিয়ে ওরা থাকুক, এর থেকে ওদের বঞ্চিত করবো না। বউদি সম্ভবত আমার চেয়ে বছর দু'য়েকের বড় হবে। মুখখানা মিষ্টি। এবার মুখ-হাত ধুয়ে ব্যাগ খুলে যার জন্য যা এনেছি সব বের করলাম। সবাই খুশি।

পাড়ায় খবর রটে গেল। বাড়ি প্রায় ভরে উঠলো। নিয়েল সবার সঙ্গে হাত মেলালো কেমন আছেন, ভালো ইত্যাদি বলে অসংখ্য হাততালি পেলো। দাদাকে ডেকে বললাম নিয়েলের জন্য স্থানীয় কোনও রেস্টহাউজ বা হোটেলে দু'দিনের জন্যে ব্যবস্থা করে দিতে। ওর সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। দাদা বুঝলো, ঘণ্টাখানেকের ভেতর নিয়েল ওর ছোট পিঠ ব্যাগটা নিয়ে চলে গেল। ভুললে চলবে না ও সাংবাদিক। শহর না ঘুরে পাঁচজনের সঙ্গে কথা না বলে ওর শান্তি হবে না। টমাসের টিকিটিও দেখছি না। মনে হয় বাড়ির চৌহদ্দির ভেতরেও নেই।

বউদি মাঝে মাঝে চায়ের কথা জিজ্ঞেস করছে। গরমে আমার প্রাণ বেরুচ্ছে। মা আমাকে ওপরে নিয়ে এলেন। বললেন, শুধু শুধু জামাইকে হোটেলে পাঠালি এই দেখ তোদের জন্য ঘর গুছিয়ে রেখেছি। সঙ্গে বাথরুমও আছে। হঠাৎ মনে পড়লো বাবা বলেছিলেন সরকারি সাহায্য পেয়েছেন। তাই দিয়ে ওপরে ঘর তুলেছেন। আমার নারীত্বের মূল্য এই ঘর! আমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি অতীতকে কখনও আর সামনে আনবো না। ঠিক আছে এতোবড়

মূল্য যখন দেশের মুক্তির জন্যে দিয়েছি তখন অভাবগ্রস্ত পিতা না হয় একটু স্বাচ্ছন্দ্য পেলেন। আজ মনে হচ্ছে গৃহদাহের অচলার বাবা কেদার বাবুর কথা। আমি তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করেছি—মহিম, অচলা, সুরেশ, বৃক্ষলতা, পশু-পক্ষী সবাইকে। আমিও, হ্যাঁ আমিও, তাই করলাম মা। মা হঠাৎ ঘুরে বললেন কিরে ডাকলি কেন। বললাম না তো, এমনিই মাঝে মাঝে তোমাকে ডাকি। ঘরে বসিয়ে মায়ের কতো কথা। জামাই কি ওসব জানে। বললাম, তুমি ভেবোনা মা। তোমার জামাই, তার-বাবা-মা-আত্মীয়স্বজন সবাই জানে। সবাই আমাকে খুব ভালোবাসে আর সম্মান করে। ওরা অনেক বড়, অনেক উদার তা না হলে এমন স্বভাব হয়, মা নিশ্চিত হলেন।

সন্ধ্যাবেলায় দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোদের সেই মকবুল চেয়ারম্যানের খবর কি রে? নিয়েল একবার ওর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। ও তো নেই '৭২-এর ১৮ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। একটা বড় করে নিশ্বাস নিলাম। কিছু প্রতিকার হয়েছে তাহলে। দাদা ভারাক্রান্ত গলায় বললো, কিন্তু হলে কি হবে, ওর ছেলেটা এখনই বাবার পথ ধরেছে। এখন তো রাজাকার পুনর্বাসন চলছে, ও লাইন দিয়েছে। হয়তো-বা কিছুদিনের মধ্যে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী হয়ে যাবে।

না, আমি নির্বাসিত হলেও রাজাকার আলবদর নির্বাসিত হয় নি। বরং আমাদের উপর অত্যাচার চালাবার জন্য পুরস্কার পেয়েছে ও পাচ্ছে। তবে দেশের অবস্থা কিন্তু খারাপ মনে হলো না। বিশেষ করে পথে-ঘাটে-দোকানে-বাজারে অনেক মেয়ে ও মহিলা দেখলাম, যা '৭১-এর আগে চোখে পড়ে নি। দাদা বললেন ত্রিশলক্ষ মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হওয়ায় অনেক পরিবারের মহিলাদের পথে বেরুতে হয়েছে উপার্জনের তাগিদে, বাঁচবার আশায়। ভাবলাম মুক্তিযুদ্ধ নারীমুক্তি সহজ করেছে কিন্তু পুরুষেরা মনে হয় আরও বীর্যহীন পৌরুষহীন হয়ে পড়েছে, নইলে রাজাকার আলবদর মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী? তারার মনে হয় বিশ্বপৌরুষ যেন আজ নারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় থেমে যাচ্ছে। সময় স্বপ্নের মতো কেটে গেল। নিয়েল উপভোগ করলো আর টমাসের তো কথাই নেই। পাটালি গুড়ের আমসত্ত্ব থেকে শুরু করে আমড়া, চালতা পর্যন্ত ভক্ষণ করা হয়েছে ওর। সারাদিন পুকুর, বাগান, মায়ের পূজোর ঘর, রান্নাঘর করে বেড়ালো। এক নতুন জগৎ দেখে গেল।

বাবাকে আগেই বলেছি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। কারণ আমাকে আনতে যাবার কারণ স্পষ্ট, কিন্তু দিয়ে আসাটা আমি সহ্য করতে পারবো না। নিয়েল স্থানীয় প্রেসক্লাবেই সময় কাটালো, তবে তার মুখ দেখে বুঝলাম ও ওর প্রত্যাশিত সংবাদ বা ইপ্সিত মন মানসিকতা খুঁজে পায় নি।

আসবার আগে দাদা এবং বাচ্চারা স্টেশনে এলো। বাবা আর মা গেটের বেড়া

ধরে দাঁড়ানো। প্রণাম করতেই বাবা শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। শুধু অস্পষ্ট উচ্চারিত একটি শব্দই আমার বোধগম্য হলো। বাবা আমার কাছে ক্ষমা চাইছেন, কিন্তু কেন? বাবার কি আর কিছু করবার ছিল? সেদিনের বাঙালি-দেহে স্বাধীন হলেও মনটাকে তো পরিচ্ছন্ন করেতে পারে নি। কই একজন বীরাঙ্গনার খোঁজ তো আমি অর্ধবিশ্ব প্রদক্ষিণ করেও পাই নি। ছিঃ ছিঃ ধিক্কার দিলাম আমি নিজেকে নয়, বাঙালির জরাব্যাধিগ্রস্ত সামাজিক ন্যায়নীতি বোধকে। ওদের কাছে মানুষের চেয়ে প্রথা বড়!

মা জড়িয়ে ধরে হাতে কি যেন একটা গুঁজে দিলেন, বললেন, টমাসের বউকে দিস, বলিস ওর দিদিমা দিয়েছে। মুঠি খুলতে দিলেন না। বললাম মা, এখুনি কেন, আমি আবার আসবো। বললেন–এসো, তবে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। তোমাকে দেখবার জন্যই প্রাণটুকু বেরিয়ে যায় নি। দেরি হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত এগিয়ে গেলাম গাড়ির দিকে। বাঁক ফিরতেই হারিয়ে গেলেন বাবা-মা, আমাদের বাড়িঘর, আমার শৈশবের লীলাভূমি তারুণ্যের স্বপ্নসাধ ঘেরা জন্মস্থান। কিন্তু কেন যেন আর ভাবতে পারছি না। সারাটা পথ টমাস শুধু আমাদের দু'জনকে ক্রমাগত বিরক্ত করে গেল। কেন আমরা ফিরে যাচ্ছি, কোপেনহেগেন কেন? কেন দাদুর বাড়ি থাকছি না, ইত্যাদি। নিয়েল শুধু সান্ত্বনার স্বরে বললো, তারা মন খারাপ করে না, আমরা আবার আসবো। আমি শুধু জানি, আসবার জন্য তারা ব্যানার্জী কাঁদবে, কিন্তু মিসেস টি. নিয়েলসেন নাড়ির বন্ধন কেটেই এবার ফিরে যাচ্ছে? কেন একথা ভাবলাম বলছি তোমাকে আপা।

ফিরে এসে ভেবেছিলাম খুব মন খারাপ হবে। কিন্তু সামলে নিলাম। শুধু ফিরবার পথে ট্রেনে হাতের মুঠি খুলে দেখলাম মা তার গলার হার দিয়েছেন তাঁর নাতি টমাসের বউয়ের জন্য। জন্ম থেকে এ হার মায়ের গলায় দেখেছি। ভাবি, সত্যিই কার্যকারণ দিয়ে মানুষের মনকে বিচার করা যায় না। কোথায় জন্মেছে টমাস আর কোথা থেকে এলো তার এই দিদিমা! জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু উপহার রেখে গেল মা এই পালক নাতির জন্য, অবশ্য টমাসের প্রকৃত পরিচয় আমার পরিবার কেন, আমাদের পরিচিতরাও অনেকেই জানেন না।

কিছুদিন পর নোরার জন্ম হলো। আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে নোরা মনে হয় যাদু করলো। ওরা মাঝে মধ্যে শুক্রবার বিকেলে আসতেন আর রবিবার ডিনার শেষে যেতেন। অবশ্য পরে নোরাই শুক্র-সোম করতো দাদা দাদির বাড়িতে।

তোমার তো এখন পরিপূর্ণ স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, আদর, ভালোবাসা, কর্মক্ষেত্রের সাফল্য, যশ, খ্যাতি। তোমার তো আর কিছুরই অভাব নেই। তুমি সব ভুলে নিজেকে এখন সম্পূর্ণ একজন সুখী ও সার্থক নারী বলে ভাবতে পারো। এখন তোমার কিসের অভাব ও অস্বস্তি তারা? গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

গভীর রাতের তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে তারা যেন হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললো, আপা দেশ স্বাধীন হয়েছে, কেউ গাজী-কেউ শহীদ। কেউ বীরউত্তম,বীরশ্রেষ্ঠ, কেউ মন্ত্রী, কেউ রাষ্ট্রদূত সবার কতো সম্মান সুখ্যাতি। আর আমি? আমি কিছু চাই নি, চেয়েছিলাম শুধু আমার নারীত্বের মর্যাদা আর প্রিয় জন্মভূমির বুকে আশ্রয়। স্বদেশে আমার সত্যিকার পরিচয় নেই, তারা ব্যানার্জী মরে গেছে। সেখানে সেদিন সম্মান মর্যাদা সবই পেলো মিসেস টি. নিয়েলসেন আর টমাসের মা। আমি কোথায়? ওদের কাছে আমি ঘৃণ্য, নিন্দিত, মৃত।

আর বাংলার মাটি–তাকেও তো আমি হারিয়েছি। আমি আজ ডেনমার্কের নাগরিক। আমাকে তো কেউ বাঙালি বলবে না। তোমার কাছেও তো আমার দু'বছর লাগলো নিজের পরিচয় তুলে ধরতে। আমার এ সংকোচ, এ লজ্জাবোধ কেন বলতে পারো? সমগ্র জীবনে আমার চলার পথে অপরাধটা কোথায়? যে বাবা, ভাই আমাকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি তারাই বিচারকের আসনে বসে আমাকে অপবিত্র অশুচি জ্ঞানে পরিত্যাগ করলেন। কি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা ভাবলে ঘৃণা হয়। আর যে আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন সে এক ছদ্মবেশধারী বিদেশিনী। আপা আমি যখন ছোট্ট ছিলাম তখন আমাদের বাড়ির পাশে একজন সরকারি উকিল ছিলেন। প্রায়ই দেখতাম সুন্দর এক তরুণী সেজেগুজে মাথায় ঘোমটা দিয়ে ও বাড়িতে আসতো। এদের বাড়ির মেয়ে মিলি ছিল আমার বন্ধু। কৌতূহলবশে একদিন জিজ্ঞেস করলাম মিলিকে ওই মহিলার কথা। মিলি বললো, ও তো বাবার মক্কেল শরীয়ত উল্লাহ্‌র বউ। ওকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল গুণ্ডারা। চার-পাঁচ–দিন পর ও ফিরে এসেছে। ওর স্বামী তাই মামলা করেছে গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে।

এবার আমার অবাক হবার পালা। বললাম, ও থাকে কোথায়? কেন, ওর স্বামীর বাড়িতে। ওমা ওর স্বামী ওকে ঘরে নিলো? হ্যাঁ নিয়েছে। বউটা আমার মাকে বলেছে, জানেন মা, আমরা মুসলমান, আমাদের ধর্মে বাজারের মেয়েও বিয়ে করে আনা যায়। আমার স্বামী বলে, তোমাকে রক্ষা করতে না পেরে এক গুনাহ্ করেছি আবার ত্যাগ করবো? মরলে আল্লাহ্‌র কাছে আমার তো মুখ দেখাবার পথও থাকবে না।

আমি যখন পুনর্বাসন কেন্দ্রে ছিলাম, কতো স্বামী-ভাই-বাবা এসেছেন মুসলমান সমাজের কিন্তু মেয়ে, বউকে কেউ ফিরিয়ে নেন নি। একজন আর্মি অফিসারও ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন; বউকে বললেন মাসে মাসে টাকা দিতে পারে কিন্তু ঘরে নিতে পারবেন না। মনে হয় তিনি এতোদিনে জেনারেল হয়ে গেছেন তার বীরত্বের পুরস্কার পেয়েছেন, আর সুলতানা সম্ভবত টান বাজারে জীবনযুদ্ধের শেষ লড়াইয়ে ব্যস্ত। ভাবি ওই মিলিদের বাড়ির সেই শরীয়তউল্লাহ্‌রা কি সব মুক্তিযুদ্ধে মরে গেছে। আমার কি মনে হয় জানো, মুসলমানরা লেখাপড়া শিখে বেশি বেশি ভদ্র

হয়েছে, হিন্দুদের অনুকরণ করে তাদের সমান হয়েছে। তাই তারাও ঘর পায় নি আর সুলতানারও স্বামী সন্তান জোটে নি।

হঠাৎ হাতঘড়িটা দেখে বললো তারা, কি সর্বনাশ! তিনটে বাজে যাও যাও তুমি শুতে যাও। ছিঃ ছিঃ আমি তোমাকে এতো কষ্ট দিলাম। হেসে বললাম, আমরা তো তোমার প্রাপ্য তোমাকে দিই নি। আমাকে কষ্ট দেবার অধিকার তো তোমার আছে। না না, তবুও হ্যাঁ, তোমাকে শেষ কথাটা বলে যাচ্ছি নীলা আপা, আমি নিয়েলকেও বলে রেখেছি আমার মৃত্যুর পর আমাকে কেউ বাংলাদেশে নেবার চেষ্টা করো না। জন্ম দিলে জননী হওয়া যায় কিন্তু লালন পালন না করলে মা হওয়া যায় না। আমি জন্মেছিলাম সোনার বাংলায়, লালিত হচ্ছি ডেনমার্কের কঠিন ভূমিতে। তবুও সেই মাটিতেই হবে আমার শেষ শয্যা। দেশে ফিরে আমি সামান্য একটি অজ্ঞাত উপেক্ষিত মেয়ে। কিন্তু প্রতি নিশ্বাসে আমি অভিশাপ দেই বাঙালি সমাজকে তার হীনমন্যতার জন্যে, মাকে অসম্মান, অপমান করাবার জন্য। একটি মাত্র মানুষ ও দেশে জন্মেছিল, তার স্নেহস্পর্শে আমি ধন্য হয়েছি। আমি তো তুচ্ছ অনাদরে কন্যা। তোমরা পিতৃঘাতী, সমস্ত বিশ্ব আজ তোমাদের ধিক্কার দিচ্ছে কুচক্রী পিতৃহন্তা, লোভী ইতর। বিশ্বসভায় তোমাদের স্থান নেই। ওখানেই সোফায় আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরে তারা শুয়ে পড়লো।

তারপর দেখা হয়েছে নব্বইয়ে। টমাস সাংবাদিক, নোরা ডাক্তার হবার পথে। নিয়েলের মা মারা গেছেন। বাবা আছেন। ওরা পালা করে দেখাশোনা করে। কিন্তু তারা কেমন যেন নিভে যাচ্ছে। ওকে আড়াল করে নিয়েল আমাকে বললো, অনেক ডাক্তার দেখিয়েছে। দেহ সুস্থ। আমার মা মারা যাবার পর ও কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র টমাসের সঙ্গে কথা বলে আর আমরা জিজ্ঞেস করলে জবাব পাই। নীলা, তুমি ওকে একটু বোঝাও। সন্ধ্যায় দু'জনে বসে আছি মুখোমুখি। তারা হঠাৎ উঠে এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কেন? কেন? সবাই সব কিছু পাবে আর আমি শুধু হারাবো? কেন? কেন নীলা আপা, বলো? আমি ওর মাথাটা বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর ও উঠলো। মুখ ধুয়ে কফি করে নিয়ে এলো। আগের মতোই তারা জ্বলছে, ওর চোখের আলো আবার যেন আমার সারা দেহমন আলোকিত করে দিলো। নিয়েল ঠিকই ধরেছে ও, ওর মা এবং শাশুড়ি উভয়ের সমন্বয়ে যাকে পেয়েছিল তাকে হারানোর পর থেকেই এ রক্তক্ষরণ। এতো কষ্ট ও সহ্য করেছে যে তারও সীমারেখায় যেন পৌঁছে গেছে ওর সহিষ্ণুতা।

নববর্ষে কার্ড পাই। ভালো আছি, মঙ্গল চাই। বিনিময়ে আমারও ওই একই শুভেচ্ছা ভালো থেকো, আনন্দে থেকো।

দু ই

আমি মেহেরজান বলছি। নাম শুনে তো আপনারা আনন্দিত ও পুলকিত হবেন কারণ ভাববেন আমি গওহরজান বা নগরজানের ঘরানার কেউ। দুঃখিত, তাদের সঙ্গে এ জীবনে আমার যোগাযোগের কোনও সূত্র ঘটে নি, তবে ঘটলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিলা না। জীবনটা তো সরল সমান্তরালরেখায় সাজানো নয়। এর অধিকারী আমি সন্দেহ নেই, কিন্তু গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেন —কি বললেন আল্লাহ্, পাগল হয়েছেন! বাঙালি মেয়ের জীবন পরিচালিত হবে আল্লাহ্‌র নির্দেশে! তাহলে এদেশের মৌলবী মওলানারা তো বেকার হয়ে থাকবেন, আর রাজনীতিবিদরাই-বা চেঁচাবেন কি উপলক্ষ করে? না এসব আমার নিজস্ব মতামত, অভিযোগের বাঁধা আটি নয়।

আমি নিজে সচেতন ও দৃঢ় বিশ্বাসী যে আমি একজন বীরাঙ্গনা। আমার রাষ্ট্র আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, আমার পিতামাতা হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সমাজের জুলুমবাজির ভয়ে আমি তাদের ঘরে যেতে পারি নি। তবে আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন আপনাদের দৃষ্টিতে আমি বীরাঙ্গনা না হলেও নিঃসন্দেহে বারাঙ্গনা নই। এ কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি যে সব কিছুর ওপরে আমি একজন অঙ্গনা। পুরুষের লালাসিক্ত জান্তব দৃষ্টি আমি দেখেছি, ভর্ৎসনা অত্যাচার সয়েছি আর তাতেই জীবনের দীর্ঘ আটমাস আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছি, উপলব্ধি করেছি, আমি অঙ্গনা এই-বা কম কি? নারীজন্ম তো কম কথা নয়, আমরা জীবন সৃষ্টি করতে পারি, স্তন্য দানের ক্ষমতা আমাদের আছে। দশমাস গর্ভে ধারণের পরও লালন পালনের দায়িত্ব আমাদের । আমিও তাই এক সন্তানের জননী। নাই-বা পেলাম স্বামীর সোহাগ, সুখের সংসার তবুও তো নিজের পায়ে সম্মানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি।

যেভাবে এখন আপনাদের কাছে কথা বলছি আমি কিন্তু ওরকম অহংকারী নই। আসলে নিজেকে তো প্রকাশ করবার সুযোগ সুবিধা পাই নি, মাথাটা নিচু করেই সবার দৃষ্টি বাঁচিয়ে সংসারে ন্যূনতম স্থান অধিকার করেই কোনও মতে টিকে ছিলাম। কিন্তু আমার মাতৃতুল্য এক মহিলার মুখে শুনলাম আমি একজন মহিয়সী নারী।

জোয়ান অব আর্কের মতো দেহে না দিলেও আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নারীত্ব আমি দেশের জন্য উৎসর্গ করেছি। তবুও কোনো মিনারে আমাদের নাম কেউ খোদাই করেনি। সম্ভবত লজ্জায়। কারণ রক্ষা তো করতে পারে নি আমাকে সর্বনাশের হাত থেকে, হাততালি দেবে কোন মুখে? আমার অবস্থানের জন্য আমি উপেক্ষিত হয়েছি নির্মম নিষ্ঠুরভাবে কিন্তু জানি না কোন ঐশ্বরিক শক্তির বলে আমিও কখনও মাথা নোয়াই নি।

আমার জন্মস্থান ঢাকা শহরের কাছেই কাপাসিয়া গ্রামে। বাংলার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঐ গ্রামেরই বীর সন্তান তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী। এ কারণে ওই গ্রামের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের ঘোরতর সমর্থক। স্কুলে-পথে-ঘাটে আমাদের সবার মুখে 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' কিন্তু জয়ের এ জোয়ার বেশিদিন স্থায়ী হলো না। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বিনামেঘে বজ্রপাত। হঠাৎ নরসিংদী বাজারে প্লেন থেকে গুলিবর্ষণ করে সমস্ত বাজারে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। আমার বাবার ছোট্ট একটি দোকান ছিল ওই বাজারে। বাবা দর্জির কাজ করতেন। সঙ্গে ছিলেন দু'জন সহকর্মী। মোটামুটি যে আয় হতো তাতে আমাদের সংসার ভালোভাবেই চলে যাচ্ছিল এবং আমরা চার ভাইবোন সকলেই পড়াশোনা করছিলাম। এক ভাই কলেজে পড়ে, থাকে নরসিংদীতে বাবার সঙ্গে। আমি, মা, আমার ছোট দু'ভাই থাকতাম কাপাসিয়ায়। ধীরে ধীরে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। আহত এবং পলাতক ইপিআর বাহিনীর সদস্যরা এ বাড়ি ও বাড়ি আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। সম্ভবত এ সংবাদ গোপন ছিল না। তখনও প্রকাশ্যে রাজাকার বাহিনী আত্মপ্রকাশ করে নি। গোপনে সংবাদ আদান প্রদান চলছিল। একদিন হঠাৎ বিকেলের দিকে গ্রামে চিৎকার উঠলো মিলিটারি আসছে, মিলিটারি! মানুষজন দিশেহারা। সবাই নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে দৌড়োতে লাগলো। দেখতে দেখতে মনে হলো গ্রামের চারিদিকে আগুনে ছেয়ে গেছে। মাঝে মাঝে গুলির শব্দ। বাবা ও বড়ভাই নরসিংদীতে ওই আধপোড়া দোকানের মেরামতের কাজে ব্যস্ত। বাড়িতে আমি, মা ও ছোট দুই ভাই লালু আর মিলু। লালু গিয়েছে স্কুলের মাঠে ফুটবলখেলা দেখতে, এখনও ফেরে নি। মা ঘর বার করছেন।

এমন সময় একটা জলপাই রঙ-এর জিপ এসে বাড়ির সামনে বিকট আওয়াজ করে থামলো। মিলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আর আমার হাত ধরে মা শোবার ঘরে ঢুকলেন। কে যেন বাংলা বলছে, হ সাব, এইডাই মেহেরজানগো বাড়ি, বহুত খুব সুরত লেড়কী। আমার দেহ অবশ হয়ে আসছে। এমন সময় দরজায় লাথি। দ্বিতীয় লাথিতেই দরজা ভেঙে পড়লো। কয়েকজন লোক লুঙ্গিপরা ওদের সামনে। আমাদের টেনে বাইরে নিয়ে এল। ক্ষীণদেহে যথাসাধ্য বাধা দিতে চেষ্টা করলাম। চুল ধরে

আমাকে জিপে তোলা হলো। মা আর্তনাদ করতেই মাকে ও মিলুকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করলো শয়তানরা। আমাকে যখন টানা হেঁচড়া করছে দেখলাম মায়ের দেহটা তখনও থরথর করে কাঁপছে। গাড়ি স্টার্ট দেবার পর দেখলাম মিলুর মাথাটা হঠাৎ কাত হয়ে একদিকে ঢলে পড়লো। বুঝলাম মা ও মিলু চলে গেল। হঠাৎ করে আর্তনাদ করে উঠতেই ধমক খেলাম। 'চোপ খানকী' বোবা হয়ে গেলাম। আমাকে ঐ সম্বোধন করলো কি করে? আমি ভদ্রঘরের মেয়ে, অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। হঠাৎ কেমন যেন শক্ত কঠিন হয়ে গেলাম। আমার এই মানসিক স্থবিরতা কেটেছে অনেক দিন পরে। সেখান থেকে হাত ও জায়গা বদল হয়ে কখনও একা কখনও আরও মেয়েদের সঙ্গে ঘুরতে লাগলাম। মাঝখানে মনে হতো বাবা আর বড়ভাই বেঁচে আছে কি? লালু? লালু কি পালাতে পেরেছিল? আবার ভাবতাম কে বাবা, কে ভাই, লালুই-বা কে আর আমিই-বা কে? নিজেকে একটা অশরীরী কঙ্কালসার পেত্নী বলে মনে হতো। কিন্তু তবুও এ দেহটার অব্যাহতি নেই। মাস দুই পর ওদের নিজেদের প্রয়োজনে আমাদের গোসল করতে দিতো। পরনের জন্য পেতাম লুঙ্গি আর সার্ট কিম্বা গেঞ্জি, শাড়ি দেওয়া হতো না। ভাবতাম বাঙালির শাড়িকে ঘৃণা করলে আমাদের তো সালোয়ার কামিজ দিতে পারে। ময়মনসিংহ কলেজের এক আপাও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। বললেন তা নয় শাড়ি বা দোপাট্টা জড়িয়ে নাকি কিছু বন্দি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে তাই ও দুটোর কোনোটাই দেওয়া হবে না। তাছাড়া আমরা তো পোষা প্রাণী। ইচ্ছে হলে একদিন হয়ত এ লুঙ্গি সার্টও দেবে না। আপা নির্বিকার ভাবে কথাগুলো বললেন। দৃষ্টি উপরের দিকে অর্থাৎ ছাদের দিকে। উনি বেশির ভাগ সময়ই একা একা উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মনে হতো যেন বাইরের আলো দেখবার জন্য ছিদ্র খুঁজছেন। ক'দিন পর আপা অসুস্থ হলো। শুয়ে থাকতো, ওকে শাড়ি পরিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো ডাক্তার দেখাবার জন্য। আপা আর ফিরলো না। ভাবলাম আপা বুঝি মুক্তি পেয়েছেন, অথবা হাসপাতালে আছেন। কিন্তু না, আমাদের এখানে এক বুড়ি মতো জমাদারণী ছিল, বললো, আপা গর্ভবতী হয়েছিল তাই ওকে মেরে ফেলা হয়েছে। ভয়ে সমস্ত দেহটা কাঠ হয়ে গেল। এতে আপার অপরাধ কোথায়? আল্লাহ্ একি মুসিবতে তুমি আমাদের ফেললে। কি অপরাধ করেছি আমরা? কেন এই জানটা তুমি নিয়ে নিচ্ছো না? এখানেই চিন্তা থেমে যেতো।

কেন জানি না মরবার কথা ভাবতাম না। ভাবতাম দেশ স্বাধীন হবে আবার বাড়ি ফিরে যাবো। বাবা মা বড়ভাই লালু মিলু আবার আমরা হাসবো খেলবো গল্প করবো। কিন্তু আমি যে মাকে আর মিলুকে মরতে দেখে এসেছি। কিন্তু এমনও তো হতে পারে মিলিটারী গ্রাম থেকে চলে গেলে মাকে আর মিলুকে গ্রামের লোক বাঁচিয়ে তুলেছে, বাবাকে খবর দিয়েছে। হতেও তো পারে! ভাবনার আদি অন্ত ছিল না। দিন-রাতের

ব্যবধানও ছিল শুধু শারীরিক অবস্থা ভেদে। প্রথম রাত্রি যেতো পশুদের অত্যাচারে, বাকি রাত দুঃখ কষ্ট মর্মপীড়া, দেহের যন্ত্রণা এ সব নিয়ে। কতো ডেকেছি আল্লাহ্‌কে, হয়তোবা সে ডাক তিনি শুনেছেন, না হলে আজও বেঁচে আছি কি করে?

মাঝে মাঝে কারও ব্যাধি মৃত্যু বা শারীরিক লাঞ্ছনা ছাড়া দিন এমনি করেই গড়িয়ে যাচ্ছিল। বন্দিদের ভেতরে নানা বয়সের ও স্বভাবের মেয়ে ছিল। চৌদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে থেকে চল্লিশ বছরের যৌবনোত্তীর্ণ মহিলাও ছিলেন। কেউ প্রায় সব সময়েই কাঁদতো, কখনও নিরবে কখনো সুর করে, তবে জোরে না। আওয়াজ বাইরে গেলে কঠোর শাস্তি পেতে হতো। কেউ না কেঁদে শুধুই চুপ করে থাকতো। মনে হতো বোবা হয়ে গেছে। কেউ কেউ গল্প করতো, হাসাতোও। নিস্তরঙ্গ জীবনে এমনি মৃদু কম্পন কখনও কখনও অনুভূত হতো।

খাবার আসতো টিনের বাসনে। বেশির ভাগ সময়েই ডাল-রুটি অথবা তরকারি নামের ঘ্যাট-রুটির সঙ্গে দেওয়া হতো। ভাত কখনও দেয় নি। যে মেয়েলোকটা খাবার দিতো সে বলতো কার কি জাত, তাই গোশ্‌তো দেওয়া হয়না। মনে মনে হাসলাম কারণ শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত তো পড়ে ফেলেছি। বিশ বছর ঘর করা সহজ কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে দেওয়া বড় কঠিন কাজ। তাই বিছানায় নিতে বাধা নেই কিন্তু গোমাংসে বোধ হয় বাধা আছে। না, পাকিস্তানিদের যতোটা হৃদয়হীন ভাবতাম ওরা প্রকৃতপক্ষে তা নয়। নইলে এমন করে জাত বাঁচাবার মহানুভবতা দেখানো কি সোজা কথা? যাক যার যা জাত তা অন্তরে রেখে দাও; দেহ তো মহাজনের ভোগে উৎসর্গ হয়েছে।

প্রথম প্রথম বাইরের কোনও খবর পাই নি। কিন্তু এ জায়গাটায় এসে এমন একটা জমাদারণী পেলাম যে ফিসফিস করে অনেক খবর আমাদের বলতো। প্রথমে জানলাম জায়গাটার নাম ময়মনসিংহ। কাছেই কমলগঞ্জ নাকি এক গঞ্জে খুব যুদ্ধ হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। যুদ্ধ যে হচ্ছে সেটা টের পেলাম এই শয়তানদের কথাবার্তা থেকে। আমরা যারা প্রথম দিকে একসঙ্গে ছিলাম তারা কিন্তু একসঙ্গে নেই। একেক সময় একজন অথবা একাধিক জনকে বেছে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো। জানতামও না কে কোথায় যাচ্ছি, কেনই-বা যাচ্ছি। তবে আজকাল আমাদের ক্যাম্পের থেকেই গোলাগুলির শব্দ শোনা যেতো। ভাবতাম এদিক ওদিক যা হয় একটা হয়ে গেলেই হয়। হয় বাঁচবো না হয় মরবো, এমনভাবে মরে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেই বাঁচি।

একদিন হঠাৎ করে ভোররাতে সব কিছু ফেলে আমাদের জিপে করে কোথায় যেন নিয়ে গেল। যেখানে এলাম সেখানে কিছু তাঁবু আর আমাদের জন্য কাঁচা বাঁশ ও দরজার বেড়া দেওয়া একটা বড় ঘর ও সঙ্গে টয়লেট। তবে বেড়ার ফাঁক দিয়ে

বেশ আলো দেখা যায়। দিন-রাত বোঝা যায়। চারিদিকে নিঝুম মনে হয়, দিনের বেলা এখানে লোকজন প্রায় থাকেই না। কিন্তু কুমুদিনী বললো ওসব কথা মাথায় এনে পালাবার চেষ্টা করো না। জান খোয়া যাবে। ওরা একটু দূরেই গাছপালা দিয়ে ঝোপের মতো করে ওখানেই থাকে। ওখান থেকেই তোপ দাগে। ভাবলাম তাহলে কি ওই হেডকোয়ার্টার মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে গেছে? আল্লাহ্ তাই যেন হয়। এখন সকাল-বিকাল বেশ শীত শীত করে, রাতে কম্বল গায়ে দিতে হয়। কখনও কখনও দিনেও ঠাণ্ডা লাগে। তাতে মনে হয় নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাস হবে। ইস্ কতোদিন হয়ে গেল। এসেছি মে মাসে, আর আজ বছরের শেষ। আর কতো?

গোলাগুলির শব্দ প্রায় বন্ধ। রোজই রাতে ভারী ট্যাঙ্কের শব্দ পাই। মনে হয় এখান থেকেও জিনিসপত্র সরাচ্ছে। তাহলে যাচ্ছে কোথায়? কিন্তু না, সব আশা ব্যর্থ করে দিয়ে আবার আকাশ থেকে বোমা পড়ার শব্দ! কারা বোমা ফেলেছে? এ তো যুদ্ধ নয়, এক পক্ষই বোমা ফেলে চলেছে।

কোনও কথা কোথাও গোপন থাকে না। ফিসফিসানীর মাধ্যমে জানলাম ভারতীয়রা বোমা ফেলছে। কিন্তু ওরা কেন? আমরা আবার কার হাতে গিয়ে পড়বো? এ ক্যাম্পে একজন বয়স্ক হাবিলদার ছিল। প্রায় ষাটের কাছে বয়স। জাতিতে পাঠান হলেও লোকটার মনে মায়া মমতা আছে। আমার সঙ্গে কেন জানি না ভালো ব্যবহার করতো। আমি ভোগ্যপণ্য হলেও এতোদিন আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। কিন্তু আজ তিনদিন ওকে খুবই গম্ভীর ও ভারাক্রান্ত দেখছি। সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, খান সাহেব তোমার কি হয়েছে? বললো, পিয়ারী যুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। খুশি হয়ে বললাম, এবার তাহলে তোমরা দেশে ফিরে যাবে? খুব আনন্দ হচ্ছে না? কিন্তু আমাকে কোথায় ফেলে যাবে? লায়েক খান মাথা নেড়ে জবাব দিলো, না বেগম, দেশে ফিরে যাবো না। তোমার দেশেই আমার কবর হবে। আমরা হেরে গেছি। কয়েক দিনের ভেতর হয় আমাদের মেরে ফেলবে, না হয় বন্দি করবে। মুক্তির হাতে পড়লে বাঁচবার কোনো আশা নেই। আনন্দে উত্তেজিত হলেও বুদ্ধিহারা হলাম না। বললাম, খাঁ সায়েব আমাকে শাদি করো, আমি তোমাকে মুক্তির হাত থেকে বাঁচাবো। লায়েক খান বোকা নয়, মাথা নেড়ে বললো, তা হবে না বিবি। ওরা আমাদের একজনকেও রাখবে না। পাঠান পুত্র বিষাদভরা কণ্ঠে বললো, তাছাড়া তুমি বেঁচে যাবে। দেশওয়ালার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, ঘর বসাবে, সুখে থাকবে। তুমি খুব ভালো মেয়ে। দেখো আমার কথা সত্যি হবে।

এবার জিদ ধরলাম, না তোমার আমাকে বিয়ে করতে হবে। কারণ জানতাম, এ না হলে আবার না জানি কাদের হাতে গিয়ে পড়বো। আমার সমাজ আমাকে নেবে না এ আমি জানি। কারণ যেদিন ধরে এনেছিল সেদিন যখন কেউ এগিয়ে আসে নি

আজও কেউ হাত ধরে নিয়ে যাবে না। কিন্তু বাবা, বড় ভাইয়া, লালু ওরা আসবে না! হঠাৎ দেখি আমার দু'গাল বেয়ে চোখের জলে বন্যা নেমেছে আর পিতৃস্নেহে লায়েক খান আমাকে কাছে নিয়ে চোখের জল মুছে দিচ্ছে। কাছে নিয়ে বললো, ঠিক আছে, এখন তো যুদ্ধ শেষ। ক্যাম্পের মৌলবী সাহেবকে বলে দেখি যদি রাজি হয়। আর কেউ জানবে না, শুধু তুমি আমি আর মৌলবী সাহেব।

ঠিক সন্ধ্যার আগে মৌলবী সাহেব নিকাহ্ পড়িয়ে দিলেন। তিনি এদেশীয় মনে হলো। বেশি কিছু পাওয়ায় খুব খুশি হয়েছেন। বললেন, ভালোই হলো তোর জন্যে, খান সাহেব ভালোমানুষ, তোকে ফেলবে না। পরদিনই ছোটাছুটি, চেঁচামেচি কিছু গুলির শব্দ। এদিক ওদিক লোকজন দৌড়োচ্ছে কিন্তু সিপাহীরা যার যার হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি আমার স্বামীর কোমর ধরে ঝুলছি। কিন্তু কি আশ্চর্য! মানুষটা আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল না। কে যেন লাউড স্পীকারে হুকুম দিলো, ওরা সব হাতিয়ার ফেলে দিলো যার যার পায়ের কাছে। কিছু মুক্তি বাহিনীর লোক, কিছু বিদেশী সিপাই মনে হলো। কারণ ওরা হিন্দিতে হুকুম করছিল। জানালো বন্দি মেয়েরা মুক্ত। ওদের অভিজ্ঞতা আছে তাই কিছু শাড়ি সঙ্গে এনেছে। সবাই পরে পরে যে যেদিকে পারলো ছুটলো।

আমি শাড়ি পরলাম কিন্তু লায়েক খানের হাত ছাড়লাম না। এতোক্ষণে বুঝলাম হিন্দী ভাষীরা ভারতীয় সৈন্য। একজন বললো, মা, তোমার ভয় নেই, তুমি বললে তোমাকে তোমার ঘরে পৌছে দেবো। আমার স্বামী করুণ নয়নে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম আমার কোনো ঘর নেই, ইনি আমার স্বামী। আমাদের ধর্মমতে বিয়ে হয়েছে। এঁকে যেখানে নেবেন আমিও সেখানে যাবো। সেপাই হাসলো, পাকিস্তানি জওয়ানদের সঙ্গে আমাকেও বন্দি হিসেবে নিয়ে ট্রাকে তুললো। অফিসার একজনও ছিল না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সব পালিয়েছে। অবশ্য পরে শুনেছি পথে অনেকেই মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে তাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। তারা এই পশুদের কাছ থেকে যে অত্যাচার পেয়েছে তার প্রতিশোধ নিয়েছে নির্মমভাবে। তবে ভারতীয় সৈন্যরা পেলে বন্দি করেছে, মারে নি কারণ যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেছে, বন্দিকে ওরা মারবে না। এটা নাকি যুদ্ধের নীতি বিরুদ্ধ। জানি না সবই খানের কাছ থেকে শোনা কথা।

এবার আমাদের গন্তব্যস্থান সোজা ঢাকা সেনানিবাস। পথে আরও ট্রাক, জিপ চললো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। ঢাকায় ব্যারাকে পৌছোলাম। ওদের অফিসাররা সুন্দর সব বাড়িতেই আছে। আমাদের ব্যারাকেই রাখলো। কিন্তু হাবিলদার একটি আলাদা কামরা পেলো তার জরুর জন্য। আমি বেঁচে গেলাম। কেমন করে তাই ভাবছি।

লায়েক খানের শোকরানা নামাজ পড়া বেড়ে গেল কারণ ও ভাবতেও পারে নি

যে জানে বাঁচবে। শুধু বার বার বলে আমার তকদীরে ও বেঁচে আছে। আর বেঁচে যখন আছে তখন দেশে একদিন না একদিন ফিরবেই আর বিবি বাচ্চার সঙ্গে দেখা হবেই। সব শুনে থেকে থেকে বুকটা কেঁপে ওঠে তাহলে আমাকে কোথাও ফেলে দেবে। ও আমাকে আশ্বাস দিলো মোসলমানের বাচ্চা যখন হাত ধরেছে তখন ফেলবে না। এটা তর্কের সময় নয়, কারণ উপস্থিত আমার সমূহ বিপদ। নইলে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল এ পর্যন্ত তোমরা কতজনের হাত ধরেছো আর ছুঁড়ে ফেলেছো। কিন্তু জিভ, ওষ্ঠ সব আমার এখন বন্ধ।

আমরা পৌঁছোবার পরদিনই আমাদের নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ কলেজের দু'জন উচ্চ শিক্ষিত মহিলা ছিলেন। এখানে প্রায় ত্রিশজন আমরা সব সময়েই একসঙ্গে থাকতাম ও শলাপরামর্শ করতাম। আপারা বললেন, নাম-ঠিকানা সব ঠিকঠাক মতো দিতে, দেশের লোক জানুক এ পশুরা আমাদের কি করেছে।

চারদিনের দিন বাবা এসে হাজির। আমাকে ডেকে নিয়ে একটা ঘরে বসালো। বাবা এলেন, একি চেহারা হয়েছে বাবার। জীর্ণ-শীর্ণ দেহ। এই ক'মাসে অর্ধেক মাথা শাদা হয়ে গেছে। কয়েক সেকেন্ড দু'জনেই নীরব রইলাম তারপর ছোটবেলার মতো দৌড়ে বাবার কোলে আছড়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ দু'জনেই শুধু কাঁদলাম। তারপর বাবার কাছে শুনলাম আমাকে নিয়ে যাবার প্রায় ঘণ্টা দুই পরে বাবা আসেন। বড়ভাই আর আসে নি, ওখান থেকেই মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে চলে যায়। বাবা এসে লালুকে পাগলের মতো কাঁদতে দেখেন। মা ও মিলুকে হাসপাতালে নিয়ে যান। খোদার রহমতে মিলু ধীরে ধীরে ভালো হয়ে ওঠে কিন্তু মা হাসপাতালেই মারা যান। চোখ মুছে শোক ভুলে বাবাকে উঠে দাঁড়াতে হয়। অন্নের যোগাড় করতে নরসিংদীতে আসতে হয় দোকান চালাতে। শেষের দিকে দোকান প্রায়ই বন্ধ থাকতো। আমার কথা বলে অনেকে সহানুভূতি দেখাতো, অনেকে টিটকারী দিতো, আমি নাকি ইচ্ছে করে লাফিয়ে জিপে উঠেছি। যারা আমার সন্ধান দিয়েছিল তারাই বাবাকে বেশি নির্যাতন করেছে। কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যেই সব পালিয়েছে। বড়ভাই পাগলের মতো ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে আবার কি ঘটায় কে জানে। আমার দু'চোখের পানিতে তখন আমার বুকের শাড়ি ভিজে গেছে।

বাবা বললেন, চল মা তোর নিজের ঘরে ফিরে চল। বড় দুর্বল হয়ে পড়লাম। মনে হলো বাবার সঙ্গে ছুটে যাই আমাদের সেই আনন্দময় গৃহে, যেখানে লালু, মিলু, বড় ভাই আজও আমার পথ চেয়ে আছে। কিন্তু না, এই মানুষটিকে আর আঘাত দিতে আমার মন চাইলো না। বাবাকে বললাম, তুমি ফিরে যাও, আমি এদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলে দেখি। ওরা আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা করবে। বাবা

নাছোড়বান্দা; বললেন, আমি কারও কোনো অনুগ্রহ চাই না, তুই আমার মেয়ে আমার কাছেই থাকবি। যেমন এতো বছর ছিলি। অনেক কষ্টে সেদিন বাবাকে ফিরিয়েছিলাম। আমরা একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, শুধু পাকিস্তানি দস্যু নয়, নিজেদের দুর্বৃত্তদেরও চিনেছি এ দুর্দিনে। যারা আমাদের জায়গা দেবে তাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে? নিজেরা তো মরেছি, ওরা তো এমনি মরে আছে, ওদের আর মেরে লাভ কি?

তবুও বাড়ি ফেরার লোভটাকে কিছুতেই ছাড়তে পারছিলাম না। সেই শোবার ঘরের কোণের শিউলী গাছটা, মা রোজ সকালে ওজু করে এক বদনা পানি ওর গোড়ায় ঢালতেন। ডিসেম্বর মাস, না ফুল এখনও শেষ হয় নি। পাড়ার মেয়েরা হেনা, রাবু সব আসতো ফুল কুড়াতে। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম ওরা কি আছে না আমার মতো হারিয়ে গেছে? আর কখনও ওই ফুল ছুঁয়ে দেখবো না। আমি তো আজ সবার কাছে অপবিত্র, অস্পৃশ্য! মনে পড়লো রান্না ঘরের মেঝেতে পিড়ি পেতে রাতে সবাই একসঙ্গে খেতে বসতাম। মা সবাইকে দিয়ে পরে নিজে খেতেন। আমার খাওয়া হলে উঠে যেতাম পড়াশোনার তাগিদে। মা খেতেন। বাবা বসে বসে মায়ের সঙ্গে গল্প করতেন। কুপির আলো মায়ের মুখের একপাশে এসে পড়তো, আলোর শিখাটা কাঁপতো মায়ের মুখও, যেন কেঁপে কেঁপে উঠতো। হঠাৎ ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলাম, মা, মাগো। সঙ্গীরা সান্ত্বনা দিতো। তবুও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সীমা ছিল না।

তারপর একদিন তিনজন আপা এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে। খুঁটে খুঁটে সব শুনে বললেন, কেন তোমরা পাকিস্তানে চলে যাচ্ছো? দেশ তোমাদের দায়িত্ব নেবে। প্রধানমন্ত্রী তোমাদের বীরাঙ্গনা খেতাব দিয়েছেন শোনোনি? নীরা আপা, সবচেয়ে শিক্ষিত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। তিনি আপাদের সঙ্গে যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক করলেন। ইতিমধ্যে আগত তিন আপার নাম জেনেছি নওসাবা, শরীফা আর নীলিমা। এরা এসেছে আমাদের ফিরিয়ে নিতে। হঠাৎ করে ঐদিন আবার বাবাও এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের ভেতর অধিকাংশই বিবাহিত ছিলেন, তাঁদের স্বামী এসেছে, কথা বলেছেন, কেউ কেউ শাড়ি উপহার দিয়ে গেছেন, কিন্তু ফিরিয়ে নিতে পারবেন না একথা অসংকোচে জানিয়ে গেছেন। কারণ তাদের সমাজ আছে, সমাজে আর পাঁচজন আছে। তাদের ভেতর তো এ ভ্রষ্টা কলঙ্কিনীদের নিয়ে তোলা যাবে না। স্বামীর ইচ্ছা আছে তবে উপায় নেই। এসব মন্তব্য থেকে আমরাও আমাদের অবস্থান জেনে নিয়েছিলাম। স্বামী যখন ঠাঁই দিতে পারে না, তখন কোন রাজপুত্র আমাদের যেচে এসে ঘরে নেবে। সুতরাং না, আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অটল। আমার বয়স ছিল সবচেয়ে কম। আমি বললাম– আপনারা যে আমাকে থাকতে বলছেন আমি কোথায় থাকবো?

এক আপা বললেন, কেন, তোমার বাবা তোমাকে নিতে এসেছেন, বললাম- বাবার ঘাড়ের বোঝা হবো না। এক আপা বললেন, বেশ তো তুমি আমার কাছেই থাকবে। হঠাৎ কেন জানি না আমি জ্বলে উঠলাম, আপনার কাছে থাকবো? প্রতিদিন চিড়িয়াখানার জীবের মতো আমাদের দেখবার জন্য আপনার বাড়ির দরজায় দর্শনার্থীর ভীড় হবে। আপনি গর্বিত মুখে আমাকে দেখাবেন কিন্তু তারপর আমার ভবিষ্যৎ কি হবে? ঐ আপা আমার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, পাকিস্তানে যেতে চাও? ওখানে কি পাবে। ওখানে তো তোমাকে নিয়ে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেবে এরা। তাতে তোমার কোনো সুবিধা হবে? সুবিধা এই হবে আপা ওখানে পতিতাবৃত্তিই করি আর রাস্তাই ঝাড়ু দেই লোকে আমাকে চিনবে না, স্বামী সন্তান অন্তত সামনে দাঁড়িয়ে টিটকারী দেবে না। ওরা ক্ষুব্ধ হয়ে চোখ মুছে চলে গেলেন। শুনেছি কলকাতা থাকতেই নীরা আপাকে তাঁর ভাইয়েরা ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। জানি না, তিনি কোথায় কতোটা সুখ ও সম্মানের জীবন যাপন করছেন।

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন। চারদিকে স্বাধীনতার উৎসব। শুধু অন্ধকার গুহায় সর্বস্বান্ত আমরা ক'জন বন্দিনী নিঃস্ব রিক্ত। আজ নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দেবার সম্বলটুকুও আমরা খুইয়ে বসে আছি। কেন এমন হলো? শুধু আমরা নারী বলেই অপবিত্র আর রাজাকার আল-বদরেরা পাপ করেও আজ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। এ তোমার কেমন বিচার আল্লাহ্? তবে তোমার কাছে নাকি সব সমান? আল্লাহ্র কানে শুধু পুরুষের বক্তব্যই পৌঁছোয়, দুর্বল ভীরু নারীর কণ্ঠ সেখানে নীরব।

যাক শেষ পর্যন্ত ভারত হয়ে পাকিস্তানে এসে পৌঁছোলাম। এখন লায়েক খানের একমাসের ছুটি। এরপর সে জানতে পারবে কোথায় সে থাকবে। ইতোমধ্যে আমি বুঝতে পেরেছি আমি সন্তান সম্ভবা। আমার স্বামীও বুঝেছেন। আমাকে অভয় দিয়ে বললেন তার প্রথম স্ত্রী কখনও গাঁয়ের বাইরে আসবে না। তাই ও আমাকে সাথেই কর্মস্থলে রাখতে পারবে। এতোদিন ছিল নিজের চিন্তা এখন এই ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব আমাকে চঞ্চল করে তুললো। আমরা রাওয়ালপিন্ডিতে লায়েকের এক দোস্তের বাড়িতে উঠলাম। ওরা লোক খুব ভালো। আমাকে বেশ আদর করেই গ্রহণ করলেন। কোনও জিজ্ঞাসা কোনও সন্দেহ বা ইতস্ততভাব ওদের ভেতর দেখলাম না। লায়েক খান ওদের কাছে আমাকে দিন পনেরোর জন্যে রেখে দেশে গেল বিবি বাচ্চাকে দেখতে। আমি মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। কিন্তু লাল খানের স্ত্রী আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন-লায়েক খান অত্যন্ত পরহেজগার মানুষ। তাকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ নেই। তাছাড়া পাঠানেরা কথার খেলাপ খুব কমই করে। ভাষা বুঝি না কারণ ভাঙা ভাঙা উর্দু বুঝলেও পোশতু আমার বোধগম্য হতো না তখন। ইশারা ইঙ্গিতে লাল খানের স্ত্রীর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। প্রথম দর্শনেই

ও বুঝতে পেরেছে আমি মা হতে চলেছি। বললো, আল্লাহ্ করুক, তোমার একটা মেয়ে হোক। দেখোনা, আমার দু'টো ছেলে আমার কাছেও আসে না। বাপের সঙ্গে সঙ্গে অফিসে বাজারে গাঁয়ের খেতি খেলায় সব জায়গায় যায়। একটা মেয়ে থাকলে আমাকে ঘর গেরস্থালির কাজে কতো সাহায্য করতে পারতো, আমার সঙ্গে সঙ্গে তো ফিরতো। ভাবলাম নারীর দুর্ভাগ্যের কথা ও জানে না, তাই ও মেয়ে চায়। মেয়ে হলে আমি হয়ত গলা টিপেই মেরে ফেলবো। লায়েক খানের মুখেও শুধু মেয়ে মেয়ে। অবশ্য মেয়ের বিয়েতে ওরা টাকা পয়সা পায়, আর ওদের দেশে মেয়ের সংখ্যা কম তাই এতো কন্যাপ্রীতি।

ঠিক সময় মতো লায়েক খান ফিরে এলো এবং তদ্বির করেই তার পোস্টিং যোগাড় করলো। থাকতে হবে করাচীতে। লায়েকের কোনও চিন্তা নেই ওখানেও ওর অনেক পেশোয়ারী দোস্ত আছে। দেখলাম ও বেশ বন্ধুবৎসল। লাল খানের বউকে একটা রূপার হার উপহার দিলো, অবশ্য বন্ধুর হাত দিয়ে। এরা পরস্পরকে ভাইবোনের মতো দেখে, দরজার আড়ালে থেকে কথাও বলে তবে সামনে আসে না। গলাগলি করে হেসে কেঁদে বিদায় নিলাম।

অতঃপর এলাম করাচীতে। লায়েক খান দেশ থেকে বেশ খোশ মেজাজেই ফিরে এসেছে। বউয়ের কথা অবশ্য আমাকে কিছু বলে নি, কারণ জানে আমার শুনতে ভালো লাগবে না। ওর দুই ছেলে বড় জনের বয়স ১৭ বছর। আর তার পরের ছেলের বয়স ১৪ বছর। মেয়ে সবচেয়ে ছোট। তার নাম ফাতিমা। এই মেয়ের গল্পই সে সব চেয়ে বেশি করে। আমিও জিজ্ঞেস করি, সেও উত্তর দিয়ে খুশি হয় এবং তার কথাবার্তায় বুঝলাম আমার কথা বিবিজান এখনও জানেন না, জানাবার মতো সাহস এবৃদ্ধের নেই। মাঝে মাঝে আমারও ভয় হয়, কে জানে জানতে পারলে আমার গলা কাটবে কিনা, তবে ভরসা বিবিজান গাঁয়ের বাইরে আসেন না। শেষ পর্যন্ত ছেলে হলো আমার। দিব্যি স্বাস্থ্যবান আর বাপের মতোই সুপুরুষ। মেয়ে হয় নি বলে খোদার কাছে শুকরিয়া জানালাম। যাক দুর্দিন এলে ছেলেকে বুকে নিয়ে গাছতলাতেও পড়ে থাকতে পারবো

ধীরে ধীরে আশে পাশের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ হলো। লায়েক খানকে সামরিক বাহিনী থেকে পেনসন দেওয়া হলো। ও করাচীতে একজন সামরিক অফিসারের বাড়িতে নাইট গার্ডের চাকুরি নিলো। বড়বাড়ি। আউট হাউজের এক পাশে ছোট একটা ঘর, পাকের ঘর, গোসলখানা তাদের জন্য বরাদ্দ হলো। বাড়িতে আরও নোকর নোকরানী আছে, তাদের সব থাকবার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। স্বামীর কাছে জানতে পারলাম বাড়ির মালকীন বাংলাদেশের মেয়ে। লায়েক খানের কাছ থেকে সব শুনে তিনি আমাকে দেখতে চেয়েছেন। একদিন সাহস সঞ্চয় করে স্বামীর সঙ্গে

গেলাম তাঁকে সালাম জানাতে। স্বামী বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো, আমি ভেতরে ঢুকলাম। সুন্দর অমায়িক ব্যবহারে সালমা বেগম আমাকে অতি সহজেই আপন করে নিলেন। বাড়িঘরের কথা, বাবা-মার কথা সব জিজ্ঞেস করলেন। ওদের চিঠি লিখতে বললেন তাঁর ঠিকানায়। কতো কথা যে তাঁর অন্তরে জমেছিল তাই ভাবি। শেষ পর্যন্ত আমি ওঁর ঘরে কাজ নিলাম। আমি ওঁর কাজ করবো। ওদের সন্তানাদি নেই। জামা-কাপড় ধোঁয়া, ইস্ত্রিরি করা, বিছানা করা, ঘর গোছানো, পার্টি হলে তার ব্যবস্থা করা এমন কি মাঝে মাঝে বাংলাদেশের মতো মাছ-তরকারিও আমি তাঁকে রান্না করে দিতাম। ওঁর কাছে বাংলা বইও ছিল অনেক। সেগুলোও মাঝে মাঝে চেয়ে নিতাম। আমার জীবনে এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে গেল।

সালমা বেগমের উৎসাহে ও সাহসে দেশে আব্বাকে চিঠি লিখলাম সব কিছু জানিয়ে এবং তাঁদের খবরা খবরও জানতে চাইলাম। ঠিকানা সালমা বেগমের। এক মাসের ভেতর বাবার চিঠির উত্তর পেলাম। তাঁরা ভালো আছেন। নাতিকে দোয়া জানিয়েছেন। দেখতে না পারার জন্য দুঃখ করেছেন। ব্যবসা বড়ভাই ও লালু চালাচ্ছে। আব্বা আর দোকানে যান না। যা জমি-জিরাত আছে তাই তদারকি করেন। মিলু এবার ম্যাট্রিক দেবে। এ বছর বড়ভাই বিয়ে করেছেন। তখন আমার ঠিকানা জানলে আমাকে নিশ্চয়ই দাওয়াত পাঠাতেন। তাঁর শরীর ভালো না। তিনি আম্মার কাছে যাবার প্রতীক্ষায় আছেন। সমস্ত চিঠিতে কেমন যেন একটা ক্লান্তি ও শূন্যতার সুর। আমি থাকলে বাবাকে মায়ের জন্য এতো কাতর হতে দিতাম না। কিন্তু কি আশ্চর্য বাবা আমাকে একবারের জন্যও যেতে লেখেন নি। ভালো লাগলো দেশের লোকেরা এখনও পাকিস্তানিদের জঘন্য অত্যাচারের কথা মনে রেখেছে ভেবে। আজ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি বৃদ্ধ অশিক্ষিত লায়েক খানের গৃহিনী কিন্তু যদি সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশে থাকতাম তাহলে সম্ভবত একটা ভদ্র পরিবারে থাকতে পেতাম। না হয় অর্থ-সম্পদ নাই পেতাম। তারপর সমুদ্রে ডুবে যাই আমি। তবুও এই বাঙালি মহিলাকে পেয়ে আমি যেনো নতুন আলো পেয়েছি জীবনের।

আমি আবদার ধরলাম ছেলের নামকরণ করবো আমি। স্বামী রাজি হলেন। আকিকায় ছেলের নাম রাখা হলো তাজ খান। সবাই খুশি সুন্দর নাম আর আমি মনে মনে স্মরণ করলাম এক পরম সাহসী মহান বাঙালি বীর যোদ্ধাকে। যিনি যুদ্ধজয় করেও, জয়ের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কে জানে বিধির বিধান বুঝতে পারি না।

দিন দ্রুত কেটে যাচ্ছে। এর ভেতর আমি সেলাই শেখার কেন্দ্র থেকে নানা রকম সুচিশিল্প শিখে ফেলেছি। ঘরে বসেই কাজ করি, বেশ ভালো আয় হয়। সালমা বেগম আমাকে তাঁর পরিচিত মহলে কাজ করবার সুযোগ করে দিলেন। লায়েক খান

মনে হয় খুশিই হলো কিন্তু কোনও দিন আমার কাছ থেকে একটি পয়সাও নেয় নি। দিতে গেলে বলেছে তোমার খাওয়া পরার দায়িত্ব আমার। আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারি নি। এখন তো ঘাড়ের উপর দু'সংসার। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে তোমার জীবনটা আমি বরবাদ করে দিয়েছি। আমি ওর মুখ চেপে ধরতাম, বলতাম তুমি আমাকে উদ্ধার না করলে আমি ভেসে যেতাম। তোমার জন্য আমি স্বামী পেয়েছি, সংসার পেয়েছি, তাজের মতো বুক জুড়ানো সন্তান পেয়েছি। সালমা বেগমের জন্য আমি অর্থ পেয়েছি বাইরে ইজ্জত পেয়েছি। একটা মেয়ে আর কি চায়। তবুও আমার স্বামী একটা কথাই বলতো, তোকে নিয়ে আমি ঘর বসাতে পারলাম না অর্থাৎ নিজের দেশে নিজের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলো না। আমি ভাবতাম এ আমার শাপে বর হয়েছে। ঘর বসালে তোমার জীবনে ক্ষেতির কাজ আর গম পিষতে পিষতে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যেতো। এ তো ভালোই আছি একরকম। তাজের বয়স যখন পাঁচ, স্বামী আবদার জুড়ালো ওকে একবার দেশে নিয়ে যাবেন। সালমা বেগমের পরামর্শ চাইলাম, উনি বললেন যেতে দে, কি আর হবে? ছেলেই তো, মেয়ে হলে ভয়ের কথা ছিল। দু'সপ্তাহের জন্য তাজ বাপের হাত ধরে মাথায় জরির টুপি পরে সেজে গুজে চলে গেল তার নিজের ঠিকানায়। মনকে সান্ত্বনা দিলাম আজ না হলেও দশ বছর পরে তো লায়েক চলে যাবে। তখন তাজ তো, সগর্বে বলবে আমি আগে পাঠান পরে পাকিস্তানি। যেমন একদিন আমরাও সগর্বে বলেছিলাম, আমরা আগে বাঙালি পরে মুসলমান, পাকিস্তানি আর সব। মনে হলো লায়েক খানের আমানত যা আমি গর্ভে ধারণ করেছিলাম, এ পাঁচ বছর প্রতি মুহূর্তের স্নেহ দিয়ে বড় করেছি তাকে আজ তার হাতেই ফিরিয়ে দিলাম। কেমন যেন সব কিছুই আমার কাছে শূন্য হয়ে গেল।

আমার সব কথাই সালমা বেগমকে বলতাম কারণ তাঁরও তো ভেতরে একটা গভীর ক্ষত আছে। যার রক্তক্ষরণ শুধু আমিই উপলব্ধি করি, তার বংশ নেই। অন্য সময় তো তিনি হাসি-খুশি পতি পরায়ন স্ত্রী, সন্তান না পাবার দুঃখ সম্পর্কে বলতেন, মেহের আমার খুব বেশি দুঃখ নেইরে, কি হতো সন্তান থাকলে? ওরা তো আমার হতো না, আমার পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করতো, লুকিয়ে থাকতো। ওর এক ভাইয়ের ছেলেকে কাছে রেখেছিলাম। পেটের ছেলে কেমন হয় জানি না কিন্তু সোহেল আমার বুক জুড়ে ছিল। একদিন টাকা পয়সার কি ব্যাপার নিয়ে দু'ভাইয়ে মনোমালিন্য হলো। আমার জা আর দেওর এসে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে গেল। মেহের, যাবার সময় তার আর্ত চিৎকার আম্মি আম্মি আমার আজও কানে বাজে। এখন সে আমেরিকায় পড়াশুনা করে। চিঠিপত্র লেখে। কিন্তু যে বাঁধন ছিঁড়ে গেছে তাকে আর আমি জোড়া লাগাতে চাই না। হঠাৎ এমন হলো কেন বেগম সাহেবা? মুচকি হাসলেন

সালমা বেগম। মেহের, দুনিয়াটা বড় রুক্ষ বড় শুকনো। আমি অথবা ওর চাচা মরে গেলে আমাদের সব সম্পত্তিই সোহেল পেতো তেমন ব্যবস্থা সাহেব করবেন বলেছিলাম। কিন্তু আমার দেওর হঠাৎ একদিন এসে বললো, তোমার পিণ্ডির বাড়িটা সোহেলকে দিয়ে দাও। বাড়িটায় একটা ভালো হোটেল চলছে, ভাড়াও অনেক পাই আমরা। উনি বললেন, হঠাৎ এ কথা কেন? দেওর বললেন, খোদা না খাস্তা তোমার কিছু হলে ভাবিকে বিশ্বাস কি? বাংলা মুলুকের মেয়ে ওর ঈমানের ঠিক আছে? আমার স্বামী হঠাৎ প্রচণ্ড রকম রেগে গেলেন। মানুষটা খুবই শান্ত ও ধীর স্বভাবের। কিন্তু কঠোর ভাষায় ভাইকে বকাবাকি করলেন। ওকে বোবা বানিয়ে দিয়ে ছেলের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। ভেতরে এসে আমার হাতটা ধরে বললেন, সালমা, ধৈর্য ধরো, দুঃখ করো না, আমার ঘরে সন্তান নেই। যদি বুক দিয়ে আমরা ভালোবাসতে পারি, তবে সারা পৃথিবীর এতিম আমাদের সন্তান। করাচীর দু'তিনটা এতিম খানায় এরপর থেকে উনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেন। আমি বললাম, বেগম সাহেবা ঈদের দিনে অনেক লোক আসে বাচ্চা নিয়ে ওরা কারা? আরে ওরাই তো এতিমখানার বাচ্চারা। ঈদের সময় তিনদিন পালা করে ওদের খাওয়াই। কাপড় জামা কিনে দিই। ওটাই আমার সারা জীবনের সব চেয়ে বড় উৎসব। এখন কিন্তু আমার খারাপ লাগে না। মেহের তোকেও বলে রাখি এমনি করে লায়েক খানও একদিন ওর বাচ্চাকে টেনে নিয়ে যাবে। ওরা সব কিছুর ওপর ওদের কওমের মর্যাদা দেয়। মাথা নিচু করে বললাম, তবুও বেগম সাহেবা আমি অন্তত ওকে লেখাপড়া করাবার চেষ্টা করবো আর আশা করি তাজের আব্বারও ওতে আপত্তি হবে না। না হলেই ভালো, জবাব দিলেন সালমা বেগম।

একদিন কথা প্রসঙ্গে সালমা বেগমকে বললাম, এখানে তো কতো হাউজিং আছে। আমার মতো গরীবরা মাস মাস টাকা দিয়ে ঘর নেয়। আমাকে যদি একটা ব্যবস্থা করে দিতেন কারণ আমি জানি লায়েক খান আর খুব বেশিদিন থাকতে চাইবে না। তখন আমার কি উপায় হবে। আমার তো বেশ কিছু টাকা জমেছে। দরকার হলে আমি আরও বেশি করে কাজ করবো। সালমা বেগম চেষ্টা করবেন বললেন এবং মাসখানেক পর সত্যিই খবর আনলেন একটা হাউজিং-এর দু'কামরার ঘর, সঙ্গে ডাইনিং ও ড্রইংরুম এবং পাকঘর ও বাথরুম। প্রথমে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে। পরে কিস্তিতে শোধ দিলে হবে। মোট দাম পড়বে আড়াই লাখ টাকা।

সালমা বেগমের কাছে আমি টাকা জমাই। সেখানে চল্লিশ হাজার টাকা জমেছে। আমি ভাবতেও পারি নি আমার এতো টাকা হয়েছে। বললেন, বাড়ি তুমি দেখে এসো, টাকার দায়িত্ব আমি নেবো। তবে একটা কথা এ বাড়ি নেওয়ার ব্যাপারে তুমি লায়েক খানকে কিছু জানিও না। পুরুষ বড় লোভী আর স্বার্থপর জাত। তাছাড়া ওরা

পাঠান, রাগলে না পারে এমন কাজ নেই। সব টুকুই তোমাকে গোপনে করতে হবে। এখন বাড়ি নিয়ে ভাড়া দিয়ে দিও, তার থেকেই তোমার বাকি দেনা শোধ হয়ে যাবে। কথাটা আমার মনে ধরলো। আমি সালমা বেগমের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বাড়ি দেখে এলাম। আমার জন্য যথেষ্ট। আর বস্তির মতো নয়। বেশির ভাগই গরীব কেরানি, মাস্টার, সুতরাং পরিবেশ খারাপ নয়। সালমা বেগম দলিল তৈরি, লেখাপড়া, রেজিস্ট্রি ও পরের সব কাজই ওঁর সায়েবের অফিসের একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে করিয়ে দিলেন। আমি শুধু সঙ্গে সঙ্গে রইলাম এই পর্যন্ত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি বাড়িটুকু নিয়ে আমার মনে হলো আমি শক্ত হয়ে দাঁড়াবার মতো এক টুকরো জমি পেয়েছি। লায়েক খান আজকাল বেশ ঘন ঘন দেশে যায়। বলে শরীর এখন আর নোক্‌রী করবার মতো নেই। সায়েবকে বলে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বললাম, আমার তাজের কি অবস্থা হবে? নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলো লায়েক খান, আমি বেগম সায়েবাকে বলে যাবো তোমাকে এখানেই রাখবেন আমি মাস মাস তোমার খোরাকি পাঠাবো। আর তাজ আমার ছেলে ওদের ভাইদের সঙ্গে বড় হবে। তাছাড়া ওর আম্মি ওকে খুবই পেয়ার করে। ওর জন্যে ভেবো না। কতো সহজে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু আমি তাজকে ছেড়ে থাকবো কি করে? তোমাকে থাকতেই হবে কারণ ওকে তো ওর বেরাদারীর সবাইকে জানতে হবে, চিনতে হবে। আমি ওকে কারও বাড়িতে নোকরী করতে দেবো না।

মৃদু কণ্ঠে বললাম, যাবে কবে? এখনও ঠিক করি নি দু'চার ছ'মাস আরও দেখবো তারপর যাবো। কিন্তু তাজের স্কুলের কি হবে? বলেছি না, ওর ভাইয়েরা আছে, ওর জিম্মাদরি নেবার লোকের অভাব হবে না। আমি পাথর হয়ে গেলাম। ঐ শিশুকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে আর আমার খোরাকি পাঠিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত করবে। আমার সাহস থাকলেও প্রকাশের ক্ষমতা নেই। এ বিদেশ বিভুঁইয়ে আমি একটা বাঙালি মেয়ে। বয়স কম, সুতরাং উদ্ধত আচরণ করার শক্তি কোথায়? সালমা বেগম অবশ্য এমনি একটা ঘটনার আভাস আমাকে বার বার দিয়েছেন। উনি দীর্ঘদিন আছেন। এদের আচার ব্যবহার রুচি তাঁর তো কিছুই অজানা নেই। স্বামীর কর্তৃত্ব আমার দেশেও আছে, কিন্তু এমন ভয়ানকভাবে নয়। একটা পয়সার জিনিস কিনতে হলে স্বামীর অনুমতি লাগবে, ঘর থেকে এক পা বেরুতে হলে স্বামীর হুকুম আবশ্যক। দাসী আর কাকে বলে। নিজেকে সামলাতে দু'একদিন লাগলো। তারপর সালমা বেগমের কাছে গিয়ে একেবারে ভেঙে পড়লাম। উনি স্বান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এমন যে হবে তা আমি তোমাকে আগেই বলেছি। ওর বয়স হয়েছে, এখন বউয়ের সেবা যত্ন চায়। তাছাড়া তুমি ওরটা যতোই করো ওরও একটা পারিবারিক নিয়ম কানুন আছে। তোমার কাছে ও একেবারে খোলামেলা হতে পারে না। ও ভুলতে

পারে না তোমার সঙ্গে ওর ব্যবধানটা। সুতরাং শক্ত হও, নিজেকে বাঁচাবার কথা ভাবো। ধীরে ধীরে আমার মানসিক উত্তেজনা কমে এলো। সালমা বেগমের কথার সত্যতা উপলব্ধি করলাম। সত্যিই তো আমার কি হবে? ভেবে আর কি করবো, যা হবার তাই তো হবে। জীবনে তো চড়াই উৎরাই কম হলো না। কষ্ট পেয়েছি কিন্তু যেভাবেই হোক প্রতিরোধ করতেও তো সক্ষম হয়েছি।

এরপর স্বামী চুপচাপ। যে যার কাজকর্ম করে চলেছি। দিন দেখতে দেখতে যায়। তাজ দশ বছরে পড়লো। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছে। স্কুলের বাস এলে ও যখন ওঠে, আমি এক দৃষ্টে চেয়ে থাকি। লায়েক খান কি ভাবে জানি না, তবে আমি তো জানি যে ও আমারই সন্তান। গৌরবর্ণ সুঠাম দেহের বালক রীতিমতো বাড়ন্ত গড়ন দেখে মনে হয় তেরো চৌদ্দ বছর বয়স। লেখাপড়াতেও বেশ ভালো। আমি ওকে পুরোপুরি সাহায্য করতে পারি না কারণ ও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, তবে যতটুক পারি করি। ও নিজেই খুব মনোযোগী ছাত্র। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ও এখনই কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারে। বুকটা কেঁপে ওঠে, যখন ভাবি এসব ফেলে প্রচণ্ড রোদে ও ফসলের ক্ষেতে কাজ করছে। মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে কিন্তু আমার আর উপায় কি? একদিন হঠাৎ তাজের আব্বা বললো, আগামী সপ্তাহে শুক্রবার আমরা যাবো। তাজকে তৈরি করে দিও। আমি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে দৌড়ে পাশের ঘরে গেলাম। কানে এলো লায়েক খানের কণ্ঠ, কেঁদে কোনও লাভ নেই, শেরের বাচ্চা, শেরই হবে, কুকুর বিড়াল হবে না। কথাটা আমার অন্তরে কোথায় যে বিঁধলো ওই মূর্খ তা জানে না। বেশ বুঝলাম আজ নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে ও আমার বাপ ভাইদের গালাগালি দিলো। একবার ভাবলো না, আমি ইচ্ছে করলে ওকে শিয়াল-কুকুর দিয়ে খাওয়াতে পারতাম। বুঝলাম মানুষের জন্মভূমির টান বড় গভীর, তাকে ভুলে থাকলেও ভোলা যায় না। আজ আমার ও লায়েক খানের মধ্যে সেই শেকড়ের দ্বন্দ্ব বেড়েছে। কিন্তু তাজ? দুই নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে সে কি করবে?

তাজ স্কুল থেকে ফিরলে আমি ধীরে ধীরে তাকে সব কথা বললাম। তার আব্বা তাকে আগেই বলেছে সে বয়স্ক মানুষের মতো ভ্রূ কুঁচকালো, কোনও শব্দ করলো না। যাবার আগের দিনে চোখের জলে আমি যখন তার জিনিসপত্র গোছাতে গেছি, তাজ রক্তচক্ষু করে আমাকে নির্দেশ দিলো—আমার কোনও জিনিস ধরবে না। ওর কাছ থেকে এই আমার প্রথম ধমক; থমকে গেলাম, তারপর আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। যাবার দিন তাজ যথারীতি তৈরি হলো স্কুলে যাবার জন্য, দেশে নয়। ওর আব্বা কি যেন বললো, ছেলে উত্তর দিলো আমার পরীক্ষার পর যখন আমাদের স্কুল বন্ধ হবে তখন যাবো। বড় আম্মাকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। তারপর জানি না কি দিলো বাপকে, বললো, ফাতিমা বাহিনজিকে আমার কথা বলে দিও, আর আমার

সালাম জানিও। লায়েক খান একটা কথাও বললো না, সত্যিই শেরকা বাচ্চা শের আমি সেটুকুই বুঝলাম। লায়েক খান চলে গেল। আমাকে শুধু বললো, তোমার বেটা লায়েক হয়েছে সাবধানে রেখো। তুমিও সাবধানে থেকো। ওর স্কুল বন্ধ হলে চিঠি লিখতে বলো, আমি এসে ওকে নিয়ে যাবো। চোখের জলে তাকে বিদায় দিলাম। আমি চাই নি সে যাক, কিন্তু তার প্রথম জীবনের প্রেম, বয়স্ক দুই ছেলে, অতি আদরের ফাতিমা—এদের ফেলে সে আর থাকতে পারছিল না, তার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল।

এরপর সালমা বেগমকে জিজ্ঞেস করলাম আমি কি করবো? তিনি পরামর্শ দিলেন আমার নিজের বাড়িতে চলে যেতে। কারণ তাদের নতুন লোককে তো ওই কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হবে। সালমা বেগমই সব বন্দোবস্ত করে দিলেন। তাজ মহাখুশি, তার মায়ের নিজের বাড়ি এ-কথা তো সে ভাবতেই পারে নি। তাজ মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, আম্মু, আজ আর আমরা কারও বাড়ির নোকরের ঘরের বাসিন্দা নই। আমরা আমাদের নিজেদের মাকানে থাকি, কেরায়া নয়। আমার চোখের পানি বাধা মানলো না। বললাম, আব্বু, এসবই করেছি তোমার জন্য। তোমাকে ও যদি জোর করে নিয়ে যেতো, আমি পাগল হয়ে যেতাম। হয়তো পথে পথে ঘুরতাম। মা ছেলের চোখের জল এক হয়ে মিশে গেল। সে আনন্দঘন মুহূর্তটির কথা আমি এখনও ভুলতে পারি না।

দিন যায় কিন্তু সব সময়ে যাবার গতি ও রীতি এক হয় না। কখনও দ্রুত লয়ে, কখনও মন্দাক্রান্ত তালে। মার দিন কিন্তু দ্রুতলয়ে কখনও যায় নি। আমার আশ্রয়দাতা স্বামী আমাকে একা ফেলে চলে যাবার পর থেকে কেন যেন একটা আত্ম-প্রত্যয় আমাকে ভর করেছে। ভাবলাম আমি যদি সত্যিই লায়েক খানের স্বাভাবিক বিবাহিত স্ত্রী হতাম, তাহলে ওকি আমাকে এভাবে ফেলে যেতে পারতো? না, সে আমায় বিয়ে করে নি, আমি বোঝা হয়ে ঘাড়ে চেপেছিলাম। এতোদিন যে সে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে সেই তো যথেষ্ট। সবার ওপরে তাজের পিতৃত্ব গ্রহণ করে আমাকে সত্যিই বীরাঙ্গনা করেছে, সব চেয়ে আশ্চর্য ওই লম্বাচওড়া বয়স্ক পাঠানের মনে কখনও কোনও সন্দেহ উঁকি দেয় নি। অথচ ভয়ে শংকায় আমি দশমাস কতো বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি। কিন্তু তাজ ভূমিষ্ঠ হবার পর আমার দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব মুছে গেছে। একেবারে লায়েক খানের নাল নকশা।

তাজ লাফিয়ে লাফিয়ে স্কুলের সিঁড়ি ডিঙিয়ে গেল। আমিও সালমা বেগমের সহায়তায় প্রাইভেট পড়ে কলেজে ভর্তি হয়ে ক্লাশ না করেও বিএ পাশ করে ফেললাম। এদিকে বাড়িতে ছোটখাটো সেলাইয়ের একটা শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছিলাম।

পরে সেখানে থেকে নানা পোশাক-এমব্রয়ডারী, জরির কাজ, লেসের কাজ ইত্যাদি করাই প্রায় দশজন মেয়েকে নিয়ে। ওরা মাসে প্রায় পাঁচশ টাকা করে উপার্জন করে আর আমার পাঁচ সাত হাজার হয়।

তাজ যখন আইএসসি পরীক্ষা দেবে, সেবারের ছুটিতে ওর বাপ এলো না। চিঠি এলো বাপের তবিয়ত খারাপ। তাজ যেন যায়। তাজ বড়মার জন্য কাপড়-জামা, বোনের জন্য পোশাক সব আমাকে দিয়ে কেনালো। আমি ওর বাবাকে একটা কুর্তা আর নিজ হাতে কাজ করা টুপি দিলাম। ছেলে দু'সপ্তাহ থেকে এলো। খুব খুশি। বড়মা কি কি খাইয়েছে, ভাইয়েরা কোথায় কোথায় নিয়ে গেছে, বোন কতো আদর করেছে ওর মুখের কথা যেন আর শেষ হয় না। সব শেষে বললো কুর্তা আর টুপি পেয়ে ওর আব্বা খুব খুশি হয়েছে কিন্তু শরীর খুব খারাপ। বললো, আর হয়তো একা করাচী আসতে পারবে না, তোমার সঙ্গে দেখাও হবে না। তোমার কাছে মাফ চেয়েছে। দেখলাম চোখে পানি। ঠিক বুঝলাম না। শুধু আমাকে বললো বেটা, তোমাকে ফৌজী অফিসার হতে হবে। আমি তো আনপড়া বলে সিপাহী হয়েই জিন্দেগী পার করলাম। কিন্তু তোমাকে বড় হতে হবে। তাজও চোখ মুছল।

ছ'মাসের ভেতরেই লায়েক খান চলে গেল। বড় ছেলে এসে তাজকে নিয়ে গেল। আমি পাথর হয়ে গেলাম। শুধু আমাকে বললো, বড়মা বলেছে আপনি আব্বাকে মাফ করে দেবেন। না হলে তার গোর আজাব হবে। আমি মনে হয় ডুকরে কেঁদে উঠেছিলাম। তাজ জড়িয়ে ধরলো আমাকে, বড় ছেলেও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ছেলেকে বললাম, তোমার আম্মা আমার বড়বোন, তাকে আমার সালাম জানিও। যখনই ইচ্ছে হয়, করাচী বেড়াতে আমার কাছে এসো। ওরা চলে গেল।

লায়েক খান আমাকে চিরমুক্তি দিয়ে গেল। কিন্তু মুক্তি চাইলে কি মুক্তি পাওয়া যায়? ওই যে ওপরে একজন বসে আছেন স্টিয়ারিং হুইল ধরে, তিনি বান্দার জীবনের গতি যে দিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, সেদিকেই যেতে হবে।

বাপের কৃত্য করে তাজ ফিরে এলো। মনে হয় রাতারাতি ওর বয়স অনেক বেড়ে গেছে। আগে রাতদিন ধরে কতো গল্প করতো, কথা যেন আর শেষ হতে চাইতো না। এবার চুপ করে বসে থাকে, আমাকেও তেমন কিছু বলে না। মনে হয় ওর বাপের মৃত্যু ওর আর আমার মাঝখানের ব্যক্তিত্বের ব্যবধান সৃষ্টি করে গেছে। ও ওর শেকড় খুঁজে পেয়েছে।

আজকাল আমার একবার দেশে যেতে খুব ইচ্ছে করে। বাবা নেই, বড় ভাই বিয়ে করেছে। ছোটটাও করবে শীগ্‌গির। ও আমাকে লিখেছে, আগে থাকতে জানাবে আমি যেন ওর বিয়েতে যাই। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের এখন দোতলা দালান বাড়ি। নরসিংদীর দোকান এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। নদীর

ওপর পুল হয়েছে। আধা ঘন্টায় ঢাকা যাওয়া যায়। কল্পনার চোখ মেলে শীতলক্ষ্যাকে দেখি, নরসিংদীর গাছপালা, নদী, নৌকা, বড় বড় মাছ সবই তো তেমন আছে শুধু আমি নেই। আমিতো হারিয়ে গেছি, সবাই ভুলে গেছে। কিন্তু আমি ভুলতে পারি না কেন? কেন আমার মাটি আমাকে এমন করে টানে। না, ভাইয়ের বিয়ে নয়, তার আগেই আমাকে একবার যেতেই হবে। অবশ্য তাজের সঙ্গে পরামর্শ করেই যাবো।

তাজ ফৌজীতে যোগ দিলো। ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে। আইএসসিতে ভালোই ফল করেছিলো। সহজেই সুযোগ পেয়ে গেল। ট্রেনিং থেকে ছুটিতে যখন আসতো ওর সুন্দর সুঠাম দেহে ইউনিফর্ম পরা ওকে দেখলে সত্যিই লায়েক খানের জন্য আমার দুঃখ হতো। ভঙ্গীও পাকিস্তানিদের মতো দুর্বিনীত। আমার বার বার একাত্তরের কথা মনে হতো, প্রয়োজনে আমার ছেলেও কি অমন বন্য জানোয়ার হবে? না, না, ওর দেহে তো আমার রক্তও আছে, আর ওর বাবা তো সত্যিই পশু প্রকৃতির ছিল না, তাহলে আমাকে ঠাঁই দিয়েছিল কেমন করে? না, তাজকে আমি যে তাজের নামে উৎসর্গ করেছি। ও যেন দেশ ও দশের জন্য নিজেকে উৎসর্গীত করতে পারে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি ওকে বাংলাদেশ যাবার ইচ্ছার কথা জানালাম। আশ্চর্য, ও খুব খুশি। বললো, তুমি যাও ঘুরে এসো আমাকে তো এখন যেতে অনুমতি দেবে না। চাকুরিতে যোগ দেবার পর আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো। তুমি ঘুরে এসো। একান্ত সহযোগিতা ও সহমর্মিতার স্পর্শ পেলাম ছেলের কথায়। ভাবতে লাগলাম কেমন করে কি করবো।

এমন সময় সুযোগ জুটে গেল। হঠাৎ সালমা বেগম ফোন করলেন। মেহের, দুপুরের পর একবার আসতে পারো? বাংলাদেশ থেকে একটি মহিলা প্রতিনিধি দল এসেছে এখানে একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে। আমি সাত-আট জনকে রাতে খেতে বলেছি। তুমি এলে...। আমি কথা শেষ করতে দিলাম না। আমি নিশ্চয়ই আসবো আপা। উনি বললেন, একটা কাজ করো, বাড়িতে ব্যবস্থা করে এসো যেন রাতে ফিরতে না হয়। তাই-ই হলো। আমি মনে হয় পাখির মতো উড়ে গেলাম। কারা আসছেন জিজ্ঞেস করেও লাভ নেই। আমি ঢাকায় শুধু সুফিয়া কামালের নাম শুনেছি তবে চোখে দেখি নি। আমি সুন্দর করে আমাদের প্রিয় মাছ রান্না করলাম। আমরা তো মাছ ভালোবাসি। আমি এতো দুঃখেও, এক টুকরো মাছ না হলে, ভাত খেতে পারি না।

ওঁরা এলেন ছ'জন আর এখানকার চারজন মোট দশজন। সালমা বেগম আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন ওর ছোট বোন বলে। প্রতিবাদ করবার সুযোগ পেলাম না। বললেন, কুটির শিল্পের ওপর খুব ভালো কাজ করছি। দশ-বারোজন মেয়ের রুটি-রুজি আমার ওখান থেকে হচ্ছে। সবাই সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন। কিন্তু

আমার দৃষ্টি আটকে গেল সেই আপার দিকে, যিনি ঢাকা ছাড়বার আগের দিন আমাকে হাতে ধরে বলেছিলেন, তুমি যেয়ো না, আমি রাখবো তোমাকে। সেই স্নেহময় কণ্ঠ আর মিনতিভরা দৃষ্টি আমি আজও ভুলতে পারি নি। এখন বয়স হয়ে গেছে। চুল অনেক শাদা হয়ে গেছে, কিন্তু সেই সৌম্য মুখশ্রী ঠিক তেমনই কোমল ও সতেজ । উনিও বার বার আমার দিকে দেখছেন। হঠাৎ দ্রুত আমার কাছে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, আপনি মেহেরুন্নেসা? হেসে মাথা নিচু করে বললাম, আপা, সেদিন কিন্তু আদর করে কাছে নিয়ে তুমি সম্বোধন করেছিলেন। বললেন, তোমার সঙ্গে কথা না বলে আমি পাকিস্তান ছাড়বো না। সালমা বেগমের উনি নাকি শিক্ষক, তাই এতো সমাদর। সালমা বেগম আমার কাছে একটা সুতির কাজ করা শাড়িও চেয়েছেন সন্ধেবেলা। তাহলে সেটা কি ওই আপার জন্য?

খাওয়া দাওয়া পর্ব চুকলো। কফি খেয়ে প্রায় সাড়ে বারোটায় সবাই হোটেলে ফিরে গেলেন। সালমা বেগমের সঙ্গে আপার কি আলাপ হলো জানি না, উনিও আমাকে 'খোদা হাফেজ' বলে সবার মতোই বিদায় জানিয়ে গেলেন। সালমা বেগমের স্বামী হংকং গেছেন কি একটা ব্যবসায়ের কাজে। আমি রাতে ওঁর ঘরের নিচেই শুলাম। উনি অনেক টানাটানি করলেন ওর সঙ্গে খাটে শোবার জন্য। কিন্তু উনি উদারতা দেখালেও আমার তো সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয়। বললেন, কাল সকালে আপা পারলো না, দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবেন আর তোমার সঙ্গে কথা বলবেন, ওঁদের সমিতির মেয়েদের তোমার কাছে এসে কাজের ট্রেনিং নিতে পাঠানো যায় কিনা। সবই বুঝলাম। উনি জানতে চান, আমি আত্মপরিচয়ে বেঁচে আছি না মুখোশ পরে চলছি।

পরদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমি আপার কাছে সব কাহিনী বললাম। উনি থেকে থেকে আমার হাত দুটো চেপে ধরছিলেন। যখন আমার বলা শেষ হলো তখন দু'জনের চোখেই জল। বললেন, মেহের সেদিন তোমার জন্য দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমি দায়মুক্ত যে বাংলাদেশের মাটিতে আমি তোমার কবর রচনা করি নি। কারণ যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত বা লাঞ্ছিত কোনও মেয়েকে আমরা প্রকাশ্যে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নি। জানো মেহের ১৯৭৩ সালে ফ্রান্স থেকে একজন মহিলা স্থপতি এসেছিলেন ঢাকায়। আমার সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলাপ করেন। ওদের বিগত মহাসমরে উনি জার্মান সৈন্যদের হাতে বন্দি হন এবং ওঁর ওপর যে পাশবিক অত্যাচার চলে তার ফলে তিনি মা হবার ক্ষমতাও হারান। পরবর্তীতে অবশ্য উনি বিয়ে করেছেন। স্বামী স্থপতি কিন্তু সব হারানো মেয়েদের দুঃখ ও বেদনা উনি জানেন। তাই আমার দেশের এ ধরনের মেয়েদের কোনও রকম সাহায্য সহযোগিতা করতে পারলে উনি খুশি হবেন। এতো বছর পর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েও মাতৃত্বের

বঞ্চনায় তিনি মলিন ও বেদনার্ত। কিন্তু আমার দেশে তো প্রকাশ্যে মাথা উঁচু করে তেমন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সম্মানের অধিকারী হয়ে কেউ বেঁচে নেই। খুব খুশি হলাম তোমাকে দেখে আর তোমার ভেতরের শক্তির পরিচয় পেয়ে। তুমি ঢাকায় এসো, আমি বিশেষ প্রতিনিধি দলে তোমাকে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্যে সালমাকে বলে গেলাম। আপা চলে গেলেন। আমার নিজ হাতে করা একখানা শাড়ি ওঁর হোটেলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। উনি ফোনে ধন্যবাদ দিলেন।

চারমাস পর আমাদের যাবার সুযোগ এলো। বড় ভাইকে লিখলাম। উনি খুব খুশি। দিন তারিখ ফ্লাইট নম্বর জানালে উনি এয়ারপোর্টে থাকবেন। না, বিস্তারিত কিছুই আমি ওঁকে জানাই নি।

কিন্তু যাবার আগে আরেক লাঞ্ছিত রমণীর সাক্ষাৎ আমি পেলাম। জানি না আমরা কি শুধু বঞ্চনা সইতেই পৃথিবীতে এসেছি? যাবার দু'দিন আগে সালমা বেগম আমাকে ডেকে পাঠালেন। মুখখানা খুব ম্লান। বললেন, বোন মেহের! ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললাম, কি হয়েছে আপা? ম্লান হেসে বললেন, কিছু না। বসো, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। ইতস্তত করলেন, ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করে থেমে বললেন, মেহের তোমাকে আমি আজ কিছু কথা বলবো, সম্ভব হলে কারও কাছে প্রকাশ করো না। আমি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। আমার পাশে এসে বসলেন, পিঠে হাত রাখলেন, অনুভব করলাম দুর্বল কোমল হাতখানার মৃদু কম্পন। বললেন, মেহের তোমাকে আমি বিনা স্বার্থে বাংলায় পাঠাচ্ছি না। তোমাকে আমি একটা ঠিকানা ও ফোন নম্বর দেবো এক ভদ্রলোকের। তুমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই প্যাকেটটা তাকে দেবে। আর কিছু বললে শুনে আসবে। পারবে? আমি আবেগে কেঁদে ফেললাম, আপা এটা কি কোনও কঠিন কাজ? মেহের, ওই যুবক আমার ছেলে-আনন্দ। আমার বয়স যখন ১৭/১৮, কলেজে পড়ি, আনন্দের বাবার সঙ্গে খুব ধুমধাম করে আমার বিয়ে হয়। আমার বাবা ছিলেন জেলা জজ, মধ্যবিত্ত বিবেকবান মানুষ, আর ওরা ছিল ধনী ব্যবসায়ী। বাবা এ বিয়েতে রাজি ছিলেন না কিন্তু ঐশ্বর্যে মেয়ে সুখে থাকবে এটা আমার মাকে প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত করে তুলেছিল। ফলে বিয়ে হয়ে গেল। স্বামী রূপবান, ধনী, মার্জিত রুচি। সুতরাং আমার সুখী হবার পথে তিলমাত্র বাধা ছিল না। বছরখানেক সুখেই কাটলো। আনন্দকে আমি গর্ভে ধারণ করলাম। আমার স্বামী এটা পছন্দ করলেন না। প্রথমে মৃদু তারপর বেশ কঠিন ভাবেই গর্ভপাত করানোর জন্য জিদ করতে লাগলেন এবং আমার প্রতি নিরব তাচ্ছিল্য ও উদাসীনতা প্রকাশ পেতে লাগলো। আমি নিরুপায় হয়ে আমার শাশুড়িকে জানালাম। তিনি কঠোর ভাষায় ছেলেকে ভর্ৎসনা করলেন। ফল হলো বিপরীত। এক বছরেই স্বামী সোহাগিনীর পাট আমার চুকলো। আনন্দকে

বুকে নিয়ে একদিকে মাতৃকর্তব্য অন্যদিকে নিজের পড়াশোনায় মনোযোগী হলাম। এতোদিনে এ সত্য বুঝেছি যে জীবনে আমাকে একা চলার প্রস্তুতি নিতে হবে।

হায়দার সাহেব ছিলেন আমার স্বামীর ব্যবসায়ের বড় অংশীদার, তাই উনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং ক্রমে সবই জানতে পারলেন। তিনি ওকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করেন। আমার স্বামী তখন বহুভোগের সন্ধান পেয়েছেন। তারপর ১৯৭০ সালের এক রাতে আনন্দকে আমার শাশুড়ির বিছানায় রেখে আমি হায়দারের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে আসি। হায়দার আমাকে তার বড় বোনের বাড়িতে নিয়ে তোলে। সম্ভবত আগেই তাদের ভেতর কথাবার্তা হয়েছে। আমি এখান থেকেই আমার স্বামীর কাছে তালাক প্রার্থনা করলে আশাতীত দ্রুততার সঙ্গে তালাকনামা এসে যায়। তখন সংগ্রাম তুঙ্গে। হায়দারও আগে থেকেই ব্যবসা গুটিয়ে এনেছিল। সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। ছ'মাস বাদে আমাদের বিয়ে হয় কিন্তু সন্তান হলো না। ১৯৮২ সালে আমি লোক মারফত আনন্দের একটি চিঠি পাই। সম্বোধন 'মা'। চিঠিখানা এনেছিলেন হায়দারের এক বাঙালি বন্ধু। এরপর থেকে তার মাধ্যমে আমাদের চিঠিপত্র ফটো সব আসে। ঘুরে গিয়ে সামনের টিপয় থেকে এক সুন্দর সুঠাম দেহী যুবকের ফটো তিনি আমাকে দেখালেন। এই আনন্দ। একবারে মায়ের মুখ।

না, ওর বাপ আর বিয়ে করে নি। তাঁর প্রয়োজনও ছিল না। তিনি বেঁচে গেলেন। আমার কলঙ্কে তাঁর সমাজ ছেয়ে গেল। অবশ্য পিতৃকুলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। বাবা নেই, এ ধাক্কা সামলাতে পারেন নি। কিন্তু ভাই-বোনেরা সবাই আমার কাছে আসা যাওয়া করেন। আসে নি শুধু আনন্দ। সে নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে আসবে না। ব্যবসা সে করবে না। মাস্টারি অথবা অন্য কোনও চাকুরি করবে, মাকে নিবিড়ভাবে কাছে পেতে চায়।

ভাবছি আমার সান্ত্বনা আমার 'বীরাঙ্গনা'র প্রশংসাপত্র; কিন্তু এই রূপবতী গুণবতী, বিদূষী মহিলার জীবনে কি আছে? হায়দারের প্রেম ও আনন্দের কল্পলোক ছাড়া। হায়দার সম্পর্কে সালমা বেগম বলেন, আমি আমার দুঃখের বোঝা দিয়ে তার জীবন বরবাদ করেছি। মেহের, ওকি কখনও আমাকে ভালোবেসেছে? ও দিয়েছে আমাকে করুণা, সহানুভূতি। তবে আমি ওকে ভালোবেসেছি। আজ বলতে কোনও দ্বিধা নেই, ওই আমার জীবনে প্রথম ও শেষ ভালোবাসার পুরুষ।

প্যাকেটে কাজ করা একটি মুগার পাঞ্জাবী আর সালমা বেগমের নিজের হাতে বোনা জরদা ও গোলাপী রং মেশানো একটি গরম পুলওভার। গত একমাস ধরে আমি তাকে এটা অত্যন্ত যত্নে বুনতে দেখেছি। আমি চোখ মুছে তাঁর দেওয়া প্যাকেটটা নিয়ে এলাম।

ঢাকা বিমানবন্দরে পা রাখলাম। এখানে এই আমার প্রথম আসা। বন্দি হিসেবে গিয়েছিলাম বেনাপোলের পথে ট্রাকে করে। অভ্যর্থনা জানাতে মহিলারা বিমানবন্দরে এসেছেন রজনীগন্ধা নিয়ে।

উঠলাম হোটেল শেরাটনে। রুমে গিয়েই বড়ভাইকে ফোন করলাম ওঁর নরসিংদীর দোকানে। পেয়েও গেলাম। উত্তেজনায় আমার গলা কাঁপছিল। বললাম এখানে দু'দিনের অনুষ্ঠান আছে। তুমি বৃহস্পতিবার সকালে এসো আমি তোমার সঙ্গেই বাড়ি যাবো। শেষ পর্যন্ত গলা কেঁপে মনে হয় কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। মা নেই, বাবা নেই, এ কোন শূন্যপুরীতে সে যাবার পরিকল্পনা করেছে। সেমিনার হল, রিসেপশন হল, বিভিন্ন বাড়িতে ডিনার খাওয়া হলো। আপার সঙ্গে বার বার দেখা হলো, খুশিতে তাঁর বার্ধক্যের মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভাবখানা অন্তত একটি মেয়েতো জয়ী হয়েছে। সে যেভাবেই হোক। তার বীরাঙ্গনা নাম কি সার্থক করতে পারেনি? অবশ্যই পেরেছে। যেখানেই যাই সবার কাছে বলেন, আমার ছাত্রীর ছোট বোন। এতো সমাদর আমার ভাগ্যে ছিল আমি কখনও ভাবি নি। কিন্তু সেই বড় কাঁটাটা যেন আমার মর্মমূলে বিদ্ধ হয়ে নিয়ত আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে, তার থেকে তো আমার মুক্তি কোনও দিনই ঘটবে না। সে আমার ওই পাসপোর্ট খানা, ওয়াইফ অফ লায়েক খান, জাতীয়তা-পাকিস্তানি। না, না, আর ভাবতে পারি না। আল্লাহ্ আমি না চাইতে তুমি আমাকে সব কিছু দিয়েছো, কিন্তু যা হারিয়েছি তার কি হবে। আত্মরক্ষার জন্য ছলনা গ্রহণের এই আমার আজীবনের শাস্তি।

পরদিন সকালে আনন্দ এলো। পা ছুঁয়ে সালাম করতেই আমি ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম। এ তো আমার তাজ! কতো স্বপ্ন। ও আগামী মাসে আমেরিকার কেম্ব্রিজে যাচ্ছে অর্থনীতিতে পিএইচডি করতে। ভালো কাজ পেলে মাকে এবং হায়দার আঙ্কেলকে নিয়ে যাবে। আন্টি, আঙ্কেলকে বলবেন আমি তাকে খুব ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, কারণ তিনি আমার মাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কার্ডিগানটা মায়ের হাতের করা শুনে বার বার হাত বোলালো। আমিও ওর জন্যে একটা গলা উঁচু পাঞ্জাবী এনেছিলাম। তাজও এগুলো খুব ভালোবাসে, খুব পছন্দ হলো আনন্দের। বললো, আন্টি আপনি যাবার দিন আমি এয়ারপোর্টে দেখা করবো। না, না করতেই আমার হাত চেপে ধরলো, কিছু খেলো না, আমাকে খুশি করবার জন্য একটা আপেল তুলে নিয়ে গেল।

নির্ধারিত দিনে বড়ভাই এলো। সেই লুঙ্গি-শার্ট পরা বড়ভাই নয়। সুন্দর সাফারী পরা, হাতে সদ্য খোলা রোদ চশমা। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলাম তারপর দু'জন দু'জনকে ধরে কান্নার বেগ সামলাতে পারলাম না। আমি ঠিক করেছিলাম সোজা গাড়ি নিয়ে যাবো, কিন্তু বড়ভাই ওর জিপগাড়ি নিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে সবই

স্বপ্ন দেখছি। সকাল ৯টায় বেরুলাম। কি জনাকীর্ণ রাস্তা, বাস, ট্রাক, রিকশা, প্রাইভেট কার, বেবী ট্যাক্সির ভোঁ ভোঁ শব্দে কান ঝালাপালা। কতো দ্রুত এগিয়ে এলাম; শীতলক্ষ্যার বিরাট ব্রিজ। মুহূর্তে নদী পার হয়ে এলাম। নামলাম গিয়ে বাড়ির সামনে। লালু, মিলু এবং সঙ্গে ভাবি ও তার বাচ্চা মেয়ে সবাই গেটের কাছে দাঁড়ানো। সে ঘর দুয়ার কিছুই নেই। সুন্দর দোতলা বাড়ি, ছিমছাম, গোছানো। মনে হয় বউ বেশ সংসারী। ঘরে ঢুকে সময় লাগলো স্বাভাবিক হতে। বাবা, মার কথা বলতে পারলাম না। যে জায়গাটায় মা পড়েছিলেন তা আজ বাড়ির নিচে। হঠাৎ দেখা গেল শিউলীগাছটা নেই। বললাম লালু ওই কোণের শিউলীগাছটা কইরে? ঝড়ে পড়ে গেছে আপা, অপরাধী কণ্ঠে জবাব দিলো লালু। মনে হলো ওরা কেটে ফেলেছে তাই এই কুণ্ঠা। গাছটা আমার খুব প্রিয় ছিল সে কথা মিলুও জানে। ভাইয়ের মেয়েটা খুবই সুন্দর হয়েছে। সবাই বললো দেখতে অনেকটা আমার মতো হয়েছে। ওর জন্য এবং ভাবির জন্য শাড়ি এবং তিন ভাইয়ের জন্য পাঞ্জাবী এনেছিলাম। বের করে দিলাম। পাড়া-পড়শী কারও কথাই আমি জিজ্ঞেস করলাম না, ওরাও গায়ে পড়ে কিছু বললো না। সারাদিনই গেট এবং সামনের ঘরের দরজা বন্ধ রইল। মানে আমার আসবার কথা এরা কাউকে বলে নি। শান্ত, সুন্দর জীবনে কেই-বা শুধু শুধু যন্ত্রণার দায় আনতে চায়! লালু, মিলুকে পাকিস্তান যাবার দাওয়াত দিলাম। সন্ধ্যায় বেরুবো। ওরা আমাকে একটা রাত থাকবার জন্য অনুরোধ করেছিল কিন্তু আমি পারলাম না। আমার নিশ্বাস আটকে আসছে। শুধু ভাবছি কেন এলাম এ শ্মশানে, শূন্য ভিটায় নিজের কঙ্কাল দেখতে।

আসবার আগে বড়ভাই আমাকে একটি ছোট্ট লাল রঙের ভেলভেটের বাক্স দিলো। বাবা তাজের জন্য হার রেখে গেছেন। ওটা হাত পেতে নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালাম। তারপর দ্রুত হেটে এসে জীপে উঠলাম। চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমি এতোক্ষণে স্বস্তি বোধ করলাম, বুঝলাম এ মাটিতে মুখ দেখাবার মতো শক্তি আমার নেই। আমি জীবনের সব পেয়েছি কিন্তু মাটি হারিয়েছি। মনে মনে বললাম, আর কখনও আসবো না। হে আমার জন্মভূমি, আমাকে ক্ষমা করো। মরতে পারার সৎসাহসের অভাব, জীবনের প্রলোভনের বিনিময়ে আমি তোমাকে হারিয়েছি। এ আমার অপরাধ। তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইবো না কারণ ক্ষমা আমি পাবো না। আমি নামহীন গোত্রহীন ভেসে আসা একটি দুস্থ, লাঞ্ছিত রমণী।

হোটেলে ফিরে এসে প্রচুর পানিতে গোসল করে স্থির হলাম। বড়ভাই চোখের জলে বিদায় নিলেন। ভাবি আসবার সময় একটা দামি শাড়ি দিলেন।

কাল সকালে চলে যাবো। এসেছিলাম প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে, ফিরে যাচ্ছি শান্ত সমাহিত হৃদয়ে। মনে হচ্ছে যেন জন্মভূমির সঙ্গে দেনা-পাওনা আমার চুকে গেছে।

এয়ারপোর্টে আনন্দ এলো। আমার হাতে দু'টো প্যাকেট দিলো ওপরে লেখা মা। বললো খালাম্মা, মাকে বলবেন এ ঢাকাই শাড়ি আমার নিজের উপার্জনের টাকায় কেনা, একথাটা বলতে ভুলবেন না। দেখা হবে করাচীতে, পা ছুঁয়ে সালাম করে দ্রুত চলে গেল। মনে হলো কিছুটা নিজেকে সামলাতে পারলাম। আমি তাকিয়ে রইলাম ওই নিঃস্ব, মাতৃহারা, সব হারানো মানুষটার দিকে।

ফিরে এলাম নিজস্ব বৃত্তে। এই আমার কর্মস্থল, আশ্রয়। তাজ হার পেয়ে মহাখুশি, গলায় পরে বসলো। বললো, নানার সঙ্গে সব সময় আমার কোলাকুলি হবে। ওর জন্য আনা পাঞ্জাবী ওকে দিলাম। শুধু শুনতে চায় গল্প কিন্তু আমার সব কথা তো ফুরিয়ে গেছে। সালমা বেগম খুশিতে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন। হায়দার সাহেবের চোখও শুকনো ছিল না। আমি এখন ছোটবোনের মতো ওঁর সামনে বের হই। মনে হলো এঁদের জন্যে আমার যাওয়াটা সার্থক হয়েছে।

নাই-বা পেলাম জাতীয় পতাকা, নাই-বা পেলাম আমার সোনার বাংলা, কিন্তু আমি জাতির পিতার স্বপ্ন সফল করেছি। একজন যুদ্ধজয়ী বীরাঙ্গনা রূপে বাংলাদেশ ছুঁয়ে এসেছি। এটুকুই আমার জয়, আমার গর্ব, আমার সকল পাওয়ার বড় পাওয়া।

তি ন

আমি রীনা বলছি। আশাকরি আমার পরিচয় আপনাদের কাছে সবিস্তারে দেবার কিছু নেই। আমাকে নিয়ে আপনারা এতো হৈ চৈ করেছিলেন যে ত্রিশ হাজার পাকিস্তানি বন্দি হঠাৎ ভাবলো বাংলাদেশ থেকে কোনো হেলেনকে তারা হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য খুব বেশি বিস্মিত হন নি কারণ আমার মতো আরও দু'চারজন এ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েছিলেন। অবশ্য পাকিস্তানিরা কিন্তু আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল না, আমরা স্বেচ্ছায় ওদের সঙ্গে যাচ্ছিলাম। কারণ বাংকার থেকে আমাকে যখন ভারতীয় বাহিনীর এক সদস্য অর্ধ উলঙ্গ এবং অর্ধমৃত অবস্থায় টেনে তোলে তখন আশেপাশের দেশবাসীর চোখে মুখে যে ঘৃণা ও বঞ্চনা আমি দেখেছিলাম তাতে দ্বিতীয়বার আর চোখ তুলতে পারি নি। জঘন্য ভাষায় যেসব মন্তব্য আমার দিকে তারা ছুড়ে দিচ্ছিল... ভাগ্যিস বিদেশীরা আমাদের সহজ বুলি বুঝতে পারে নি।

ওরা খুব সহানুভূতির সঙ্গে আমাকে টেনে তুলে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পে নিয়ে গেল। গোসল করে কাপড় বদলাবার সুযোগ দিলো। জিজ্ঞেস করলো, কিছু খাবো কিনা? মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালাম। তারপর ওদের সহায়তায় জিপে উঠলাম। আমি ভালো করে পা ফেলতে পারছিলাম না, পা টলছিল, মাথাও ঘুরছিল। ওরা দ্রুত আমাকে আরও তিনজনের সঙ্গে গাড়িতে তুলে নিলো। ওদের কথায় বুঝলাম আমরা ঢাকা যাচ্ছি। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমি জীবিত না মৃত? এমন পরিণাম কখনও তো ভাবি নি। ভেবেছিলাম একদিন বাংকারে মরে পড়ে থাকবো আর প্রয়োজনে না লাগলে ওরাই মেরে ফেলে দেবে। লোকসমাজে বেরুবো, এতো ঘৃণা ধিক্কার দেশের লোকের কাছ থেকে পাবো তাতো কল্পনাও করি নি।

ভেবেছিলাম যদি মুক্তিবাহিনী আমাদের কখনও পায়, মা-বোনের আদরে মাথায় তুলে নেবে। কারণ আমরা তো স্বেচ্ছায় এ পথে আসি নি। ওরা আমাদের বাড়িতে একা ফেলে রেখে দেশের কাজে গিয়েছিল এ কথা সত্যি; কিন্তু আমাদের রক্ষা করবার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল কার ওপর? একবারও কি আমাদের পরিণামের কথা

ভাবেনি? আমরা কেমন করে নিজেকে বাঁচাবো, যুদ্ধের উন্মাদনায় আমাদের কথা তো কেউ মনে রাখে নি। পেছনে পড়েছিল গর্ভবতী স্ত্রী, বিধবা মা, যুবতী ভগ্নী কারও কথাই সেদিন মনে হয় নি। অথচ তাদের আত্মরক্ষার তো কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। বৃদ্ধ পিতা-মাতা মরে বেঁচেছেন, গর্ভবতী পত্নীর সন্তান গর্ভেই নিহত হয়েছে। যুবতী স্ত্রী, তরুণী ভগ্নী পাকদস্যুদের শয্যাশায়িনী হয়েছে। অথচ আজ যখন বিজয়ের লগ্ন এসেছে, মুক্তির মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে তখনও একবুক ঘৃণা নিয়ে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করছে সামাজিক জীবেরা। একটা পথই এসব মেয়েদের জন্যে খোলা ছিল—তা হলো মৃত্যু। নিজেকে যখন রক্ষা করতে পারে নি, তখন মরে নি কেন? সে পথ তো কেউ আটকে রাখেনি। কিন্তু কেন মরবো? সে প্রশ্ন তো আমার আজও। মরি নি বলে আজও আর পাঁচজনের মতো আছি, ভালোই আছি, জাগতিক কোনও সুখেরই অভাব নেই। নেই শুধু বীরাঙ্গনার সম্মান। উপরন্তু গোপনে পাই ঘৃণা, অবজ্ঞা আর ভ্রূকুঞ্চিত অবমাননা।

সে কবে, কতোদিন আগে? আমার একটা অতীত ছিল, ছিল বাবা-মা বড়ভাই আসাদ আর ছোটভাই আশফাক। বাবা পাকিস্তান সরকারের বড় চাকুরে। কাকাও লাহোর রাওয়ালপিন্ডি কখনও ঢাকা। বড়ভাই বিএ পরীক্ষা দিয়ে আর্মিতে ঢুকলেন। বাঙালির প্রতি অবজ্ঞা তিনি ঘোচাবেন। আব্বার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু তিনি বাধাও দিলেন না। ট্রেনিং শেষ করে কিছুদিন রইলো শিয়ালকোটে, তারপর একেবারে কুমিল্লায়। ততোদিনে আব্বা রিটায়ার করেছেন। আশফাক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বিতীয় বর্ষ আর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্রী। বড় সুখে আনন্দে কেটে যাচ্ছিল আমাদের দিনগুলো। আতাউরের সঙ্গে কিছুটা মন দেওয়া নেওয়া যে হয় নি তা নয়, তবে ফাইনাল পরীক্ষার আগে কিছু প্রকাশ করবার সাহস আমার ছিল না। আতাউর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে পিএইচডি করবার জন্যে আমেরিকা যাচ্ছে। নিজেরা ঠিক করলাম ও চলে যাক, পরীক্ষা হলে আমারও যাবার ব্যবস্থায় বাধা থাকবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আমরা বেশ দূরেই থাকতাম। কখনও বাড়ির গাড়ি, কখনও-বা বাসে আসা যাওয়া করতাম। তখনও পথঘাট এমন শ্বাপদ সঙ্কুল হয় নি। সন্ধ্যা হলে বাবা ক্লাবে যেতেন। আমি আর মা পড়াশুনা করতাম, টিভি দেখতাম অথবা মেহমান এলে আপ্যায়ন করতাম।

আমি নাকি অসাধারণ সুন্দরী ছিলাম। ঘরে বাইরে সবাই তাই বলতো। মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি-না, খুঁত নেই আমার কোথাও, দীর্ঘ মেদশূন্য দেহ, গৌরবর্ণ, উন্নত নাসিকা, পদ্মপলাশ না হলেও যাকে বলে পটল চেরা চোখ, পাতলা রক্তিম ওষ্ঠ। একেবারে কালিদাসের নায়িকা! নিজের রূপ সম্পর্কে নিজে খুবই

সচেতন ছিলাম। একা এক ঘর লোকচক্ষুর সামনে কেমন করে নিজেকে আকর্ষণীয় করে রাখতে হয় তাও জেনে ফেলেছিলাম যখন যা প্রয়োজন কিনবার জন্যে অর্থের অভাব হতো না। নিজে স্কলারশীপ পেতাম, বড়ভাইও টাকা দিতো আর মা জননী তো আছেনই।

এমনিই নিস্তরঙ্গ সুখের জীবনে বিক্ষুব্ধি বাতাস বইতে শুরু করলো, ছ'দফা আন্দোলনকে উপলক্ষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধীরে ধীরে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন কর্মতৎপর হয়ে উঠলো। আমি ছাত্র ইউনিয়ন করতাম। কিন্তু ছ'দফায় আমাদের মতভেদ ছিল না। রাজনৈতিক আন্দোলন ছাত্রশক্তির সহায়তায় তীব্রতর হলো। শুরু হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। বাবা বড়ভাইয়ের জন্য চিন্তিত হতেন কারণ আগরতলা মামলায় কিছু নৌ-বাহিনীর সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বড় ভাইয়ের জাতীয় চেতনা আব্বার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু ছাত্র, জনতা, রাজনীতিবিদ সকলের মিলিত আন্দোলনে আইয়ুবের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। শেখ মুজিব পেলেন জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন।

এবার পট পরিবর্তন। আইয়ুব গেল, ইয়াহিয়া এলো, হলো নির্বাচন। নির্বাচন পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ বিরোধী সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমরা ভাবলাম এবার শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ভুট্টোর মাথায় তখন ষড়যন্ত্রের কুটিল চক্র কাজ করছিল। মদ্যপ দুর্বল ইয়াহিয়াকে হাত করে ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তান ধ্বংসের সুযোগ খুঁজতে লাগলো দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। সুতরাং সংসদ বসলো না। সময় কাটিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলো পাকিস্তান। একমাস বাংলায় চললো অসহযোগ আন্দোলন। সে কি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। তারপর? তারপর ২৫শে মার্চ, জাতীয় ইতিহাসের সর্বাধিক কৃষ্ণরাত্রি। ঢাকার খবর পেলাম। কিন্তু আমরা ঠিক এতোটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আশফাক আব্বাকে আমাদের নিয়ে গ্রামে চলে যেতে বললো। ও ঢাকা থেকেই ফোনে কথা বলছিল। জানালো, ও এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাবে পরে যোগাযোগ করবে। বড় ভাই ভালো আছে। মা আর আমি যতো বিচলিত হলাম আব্বা ততোটা নন। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। সবাই তাকে মান্য করে, তার কিসের ভয়? তিনি ভরসা দিলেন কিন্তু মা মেয়ে ভরসা পেলাম না। পরিচিতরা একে একে চলে যাচ্ছে।

রাহেলার মা অর্থাৎ কাজের মহিলাও চলে গেল। মাফ চেয়ে গেল, বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। মা কেন জানি না কিছু বেশি করে কাপড়-জামা ওকে দিয়ে দিলেন। দিনটা তবুও নানা কাজে যায় কিন্তু সন্ধ্যা হলেই যেন অন্ধকার গলা টিপে ধরে। আব্বার ক্লাব নেই, ঘরে টিভি খোলা যায় না, শব্দ যেন আমাদের আরও ভীত সন্ত্রস্ত করে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। হঠাৎ সত্যিই একদিন কৃষ্ণদাসের গরুর পালে বাঘ

পড়লো, কিন্তু সে ভর দুপুরে। বেলা ১টা মতো হবে মা আমাদের খাবার ব্যবস্থা করছেন। এমন সময় একটা আর্মি জিপ এসে থামলো। আমার হৃদপিণ্ডের উত্থান-পতন যেন আমি নিজে শুনতে পাচ্ছি।

বাবা দরজার কাছে এলেন, একজন অফিসার তমিজের সঙ্গে আব্বার সঙ্গে করমর্দন করলো। আব্বা তাদের বসতে বললো, কিন্তু তারা বসলো না। বললো, তোমার ছেলে কোথায়? বাবা বললেন, ও তো তোমাদের মতো আর্মির ক্যাপ্টেন, কুমিল্লায় আছে। বাবাকে কথা শেষ করতে দিলো না, হঠাৎ বাবার গালে একটা প্রচণ্ড চড় কষে দিলো। আব্বা হতভম্ব হয়ে বললেন, তোমরা জানো না আমি কে? আমি... কথা শেষ হলো না 'কুত্তার বাচ্চা' সম্বোধনের সঙ্গে লাথি খেয়ে বাবা বারান্দায় পড়ে গেলেন। ছুটে গেলেন মা, মাকে ধাক্কা দিয়ে বললো, হট্ যাও বুড্ডী। খানসামা আলী এসেছিল, তাকেও টেনে দাঁড় করালো। তারপর স্টেনের আওয়াজ ঠ্যা ঠ্যা ঠ্যা। বাবা, মা, আলীর রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ে। হতভম্ব আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম, ক্রুদ্ধ মুখগুলো খুশিতে ভরে গেল। আইয়ে আইয়ে করে আমার হাত ধরে ঐ জিপে টেনে তুলে নিয়ে গেল। আমি তখন চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি সজ্ঞানে ছিলাম কি না বলতে পারি না। কিছুক্ষণ পরই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জিপটা থেমে গেল। একজন হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে নামালো। আমি কেঁদে উঠলাম। কারণ ও হাত একটু আগেই আমার বাবা মাকে হত্যা করে এসেছে। সোহাগ মিশিয়ে খুনী বললো, ভয় পেয়ো না। আমরা তোমাকে যত্ন করেই রাখবো। বুঝলাম আমি নিকটস্থ সেনানিবাসে এসেছি সুতরাং ইতরামি হয়তো অপেক্ষাকৃত কম হবে। অফিস ঘরে একদিকে একটা সোফাসেট ছিল, আমাকে সেখানে বসিয়ে দিল। বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ঠাণ্ডা কিছু খাবো নাকি? কে জানে, এই মাত্রই তো বাবা মাকে খেয়ে এসেছি তবু সমস্ত গলা বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কে যেন আদর করে সামনে এক পেয়ালা চা দিলো। কোনোমতে কাপ তুলে এক চুমুক চা খেতেই আমার সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠলো, হড় হড় করে ওদের সুন্দর কার্পেটের ওপর বমি করে দিলাম। এতোক্ষণে সমস্ত শক্তি দিয়ে উচ্চারণ করলাম 'সরি'। আমার খেদমতকারীরা কর্তার হুকুমে আমাকে কাছেই একটা ঘরে নিয়ে গেল। একটা ঘরে সম্ভবত একজনকে থাকতে দেওয়া হয়, সঙ্গে বাথরুম। একটু পরে জমাদারণী শ্রেণীর একজন মধ্যবয়সী এলো একসেট কাপড়-জামা অর্থাৎ সালোয়ার কামিজ নিয়ে। কারণ বমি করে সব নষ্ট করে ফেলেছি। আমি গোসলখানায় ঢুকলাম। জমাদারণী বার বার বললো আমি যেন দরজা বন্ধ না করি। তখনও আমার মুখে কথা নেই, শুধু বোবা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বললো দরজা বন্ধ করে অনেক মেয়ে মরবার চেষ্টা করেছে। তাদের কঠিন সাজা দেওয়া হয়েছে। ভাবলাম দরজা খোলাই-বা কি আর বন্ধই-বা

কি! উলঙ্গকে নাকি স্বয়ং খোদাও ভয় পান। সুতরাং কে আমাকে ভয় দেখাবে, আমি পারবো কতজনকে ভয় দেখাতে। মাথায় প্রচুর পানি ঢেলে নিজেকে আত্মস্থ করতে চেষ্টা করলাম। না, আমি মরবো না, মেরে ফেললে কিছু করবার নেই কিন্তু আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করবো না। আমি গোসল সেরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বসলাম। মাথা দিয়ে পানি ঝরছে, চিরুনি নেই, হেয়ার ড্রায়ার নেই, একটা শুকনা তোয়ালে দিয়ে চুলগুলো জড়িয়ে রাখলাম। একটু পরে চিরুনি ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন সামগ্রীও এলো। বা! অভ্যর্থনা তা ভালোই হলো।

রাতে আবার ডাক এলো, বুঝলাম এটা অফিসারস মেস। একই টেবিলে আমাকে খেতে দিল দেখে অবাক হলাম। ধীরে ধীরে কথাবার্তা শুরু হলো। প্রকৃতপক্ষে জীবন কাটিয়েছি আব্বার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে, তাই উর্দু আর ইংরেজি দুটোই আমার আয়ত্ত্বে ছিল। আব্বার পরিচয় নিলো, কিন্তু তাদের বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত বলে মনে হলো না। বড়ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলো। সম্ভবত ছোটর সংবাদ এরা জানে না। জানতে চাইলো, ইউনিভার্সিটির কোন শিক্ষক কোন দল করে, কোন হলে কোন দলের ছাত্র থাকে ইত্যাদি। কি উত্তর দিয়েছিলাম তা আর আজ এতোদিন পর মনে পড়ে না। তবে সবই যে উল্টা পাল্টা বলেছিলাম এটুকু মনে আছে। কাঁধের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম এদের দলপতি একজন লেঃ কর্ণেল, বয়স ৪৫ বছরের মতো হবে। সুঠাম দেহ তবে উচ্চারণ শুনে বুঝলাম পাঞ্জাবী। আরেকবার বুকটা কেঁপে উঠলো কারণ এই শ্রেণীকে আব্বা একেবারেই দেখতে পারতেন না। বলতেন অশিক্ষিত, বর্বর, গোঁয়ার। যাই হোক খাবার নিয়ে নাড়াচাড়াই করতে লাগলাম। কি ভাবছিলাম তাও আজ মনে করতে পারি না। কর্ণেল সাহেব আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, ভয় পেয়ো না, এখানে আমি তোমার দেখ্ ভালো করবো। তবে পালাবার চেষ্টা করলে জানে মেরে ফেলা হবে এটা মনে রেখো। দরজা কখনও বন্ধ করবে না। জমাদারণী রাতে তোমার ঘরে শোবে।

আমি কোনো কথারই জবাব দিলাম না বা দিতে পারলাম না। জমাদারণীর সঙ্গে ঘরে ফিরে এলাম। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। আজ আমার বলতে লজ্জা নেই সেদিন আমি মরার মতো ঘুমিয়েছিলাম। একবারও ভাবতে চেষ্টা করি নি বাবা নেই, মা নেই, আমি নিজে অনন্ত দোজখের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। কেন এমন হয়েছিল? মনে হয় আমার বোধশক্তি লোপ পেয়েছিল। আর না হয় সেদিন থেকে নিজেকে নতুন করে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম। গায়ে রোদ লাগায় উঠে বসলাম। জমাদারণী একেবারে অনুগত আয়ার মতো নতুন পেস্ট ব্রাশ এগিয়ে দিলো। হাসলাম, এ ধরনের কাজ করবার অভ্যাস তার আছে। মুখ ধুয়ে আসতেই ধুমায়িত চা এলো। বললো, সায়েবরা ব্রেকফাস্টে ডাকছে। বললাম, আমার ব্রেকফাস্ট

এখানেই নিয়ে এসো। উত্তরে হাসিমুখে সখি বল্লে, যেমন আপনার মর্জি। কর্ণেল সাহেবের নেকনজরে আছেন আপনি, রানীর আরামে থাকবেন। ভাবলাম পরিণাম যখন এক, তখন রাণীই-বা কি আর জমাদারণীই-বা কি! তবুও সুযোগের সদ্ব্যবহার করি। কলম পেন্সিল খুঁজলাম। এক টুকরা কাগজ ঘরে নেই। সব প্রকার সতর্কতাই গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া আমিই তো একমাত্র রাজকীয় মেহমান নই। এর আগেও কতো এসেছে কতো গেছে। আল্লাহ্ এই ছিল আমার কপালে! জীবন নিয়ে কতো রঙিন স্বপ্ন দেখেছিলাম। ক'মাস পরে আমেরিকা যাবো স্বামীর ঘরে। কতো বড় বড় দেশ দেখবো, জীবন উপভোগ করবো, সন্তানের মা হবো। হাসলাম নিজের মনে, এ যুদ্ধ একদিন শেষ হবে। এরা যতো শক্তিমানই হোক জয়ী আমরা হবোই। তখন আমি কোথায় থাকবো? তার অনেক আগেই তো আমি ব্যাধিগ্রস্ত শরীর নিয়ে শেষ হয়ে যাবো। এমন কতো যুদ্ধবন্দির কাহিনী পড়েছি, সিনেমা দেখেছি, কিন্তু এমন রানীর আদর, আরাম আয়েস পেয়েছে ক'জন। সেদিক থেকে আমি ভাগ্যবতী।

আমার একমাত্র ঘনিষ্ঠ বান্ধবী জমাদারণী জয়গুণ। তাকে বললাম, কর্ণেল সাহেব বদলি হয়ে গেলে আমার কি হবে? যে সাহেব আসবে তুমি তার রাণী হয়ে থাকবে। কেন? আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেনা? ওরে বাপ! সাহেবের বেগমসাহেবাকে আমি একবার দেখেছি। সে মারাত্মক। টের পেলে তুমি, তো তুমি, সাহেবকে গলা টিপে মারবে। বললাম, বেগমসাহেব থাকে কোথায়? জয়গুণ বললো কখনও ঢাকায়, কখনও তার বাপের কাছে ইসলামাবাদে। নিজের অজ্ঞাতে দু'হাত গলায় উঠে থামলো, মনে হলো যেন বেগমসাহেবার চাপে ব্যথা পাচ্ছি। একদিন সন্ধ্যায় কর্ণেল আমাকে নিয়ে খোলা জিপে বেড়াতে বেরুলেন। মনে হচ্ছিল পাশে আতাউর, আমি আমেরিকার কোনও শহরে। খুব ভালো লাগছিল, গুন গুন করে গান গাইছিলাম হয়তো। গাড়ি একটা ছোট দোকানের সামনে থামলো, ছোট ছোট কটা ছেলে যাদের আমরা ঢাকায় টোকাই বলতাম দাঁড়ানো ছিল, হয়তো-বা খেলছিল, মিলিটারী দেখে থেমে গেছে।

গলা বাড়িয়ে বললাম, কি করছো? ছোট ছেলেটা বললো, বাঙালি, কথা কইস না, হালায় বেবুশ্যে মাগী। কর্ণেল তখন বিস্তৃত দন্তপাটি মেলে হাসছে। ছেলেগুলো দৌড় দিলো কিন্তু আমার সর্বদেহে মনে যে কালি ছিটিয়ে গেল তার থেকে আমি আজও মুক্ত হতে পারি নি। লেডি ম্যাকবেথের মতো আরবের সমস্ত সুগন্ধি ঢেলেও তো আজ তার অন্তর সৌরভ মণ্ডিত হলো না। সেই ক্ষুদ্র শিশুর চোখে মুখে প্রতিফলিত ঘৃণা আমার রানীত্বকে মুহূর্তে পদদলিত করেছিল। কিছুক্ষণ পর কর্ণেল সাহেব বুঝলেন কিছু একটা হয়েছে। ছেলেগুলো কিছু একটা বলে দৌড়ে পালিয়েছে। তাদের গমন পথের দিকে তিনি জিপ ঘোরালেন। আমি তাঁর হাত চেপে ধরে গাড়ির

মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আতাউরকে নিয়ে মুক্তি পাবো এটা ছাড়া আর কোনো স্বপ্ন দেখি নি। ওই শিশুটি আমাকে বলে গেল, সেটা স্বপ্নই–আমার জীবনে তা অলীক। কারণ ওই স্বপ্ন দেখার অধিকার আমি হারিয়ে ফেলেছি।

ওটা কতো তারিখ কোন মাস মনে নেই। সম্ভবত জুনমাস হবে। দিনটা সত্যিই আমার জন্য অশুভ ছিল। শিষ দিতে দিতে কর্ণেল সাহেব গাড়ি থেকে নামতেই তাঁর মাথায় বজ্রাঘাত হলো। জিএইচকিউ এর গাড়ি দাঁড়িয়ে। অতএব হোমড়া চোমড়া কেউ এসেছেন। আমাকে ইশারায় পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে যাবার নির্দেশ দিলেন। সেই আমার প্রেমিক কর্নেলের সঙ্গে শেষ দেখা এবং প্রেমলীলাও শেষ। হেড কোয়ার্টার থেকে ব্রিগেডিয়ার খান এসেছে। জমাদারণীর সংবাদ। তারপর আমার এ সযত্নে লালিত দেহটাকে নিয়ে সেই উন্মত্ত পশুর তাণ্ডবলীলা ভাবলে এখনও আমার বুক কেঁপে ওঠে। আমাকে কামড়ে খামচে বন্যপশুর মতো শেষ করেছিল। মনে হয় আমি জ্ঞান হারাবার পর সে আমাকে ছেড়ে গেছে। লোকটাকে এক ঝলক হয়তো ঘরে ঢুকতে দেখেছিলাম তারপর সব অন্ধকার। সকালে মুখ ধুতে গিয়ে দেখলাম আমার সমস্ত শরীরে দাঁতের কামড় ও নখের আঁচড়। কামগ্রস্ত মানুষ যে সত্যিই পশু হয়ে যায় তা আমার জানা ছিল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম। হঠাৎ মনে হলো ওই টোকাইয়ের কথা বেবুশ্যে মাগী। হ্যাঁ সত্যিই আমি তা, আমার মুখে চোখে সর্বাঙ্গে তার ছাপ। হ্যাঁ শুরু হলো আমার পূর্ণ পতন। এখন সত্যিই আমি এক বীরাঙ্গনা।

ভোরেই ব্রিগেডিয়ার সাহেব চলে গেছেন কর্ণেলকে বগলদাবা করে। তাঁর প্রেমলীলার সংবাদ পেয়েই ব্রিগেডিয়ার পরিদর্শনে এসেছিলেন। শ্রমের মূল্য উশুল করেই গেলেন। এরপর থেকে শুরু হলো পালা করে অন্যদের অত্যাচার। কর্নেলের ভয়ে যারা আমাকে রাণীর মর্যাদা দিয়েছিল তারা দু'বেলা দু'পায়ে মাড়াতে লাগলো। আমার শরীরে আর সহ্য হচ্ছিল না। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি কুমিল্লা মিলিটারী হাসপাতালে গেলাম। তখন প্রায় বেশির ভাগই মেল নার্স। শুধু রুগিনীদের জন্য কয়েকজন মহিলাকে রাখা হয়েছে বা থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। আমাকে দেখে তারা কষ্ট পেলেন কিন্তু সহানুভূতি দেখাতে সাহস পেলেন না। অথচ তাঁদের কথাবার্তায় বোঝা যেতো তারা এদের সর্বনাশ প্রতিমুহূর্তে কামনা করছেন। কিন্তু আমার মতো তাদেরও হাত পা বাঁধা। যন্ত্রের মতো কাজ করে যাচ্ছে।

তবে বাঙালি মহিলাদের দেখলাম এমন কি ডাক্তারও। নাম জানবার চেষ্টা করি নি, পাছে নিজের নাম প্রচার হয়ে যায়। তবে ডাক্তার ও নার্স সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে আমাকে বেশ কিছুদিন রাখলেন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে আমাকে ঢাকার কাছাকাছি

কোনও একটি ক্যাম্পে নিয়ে এলো। বেঁচে গেলাম যে পুরোনো জায়গায় ফেরত পাঠালো না। কিন্তু যেখানে এলাম সেখানে প্রায় কুড়িজন মেয়ে এক সঙ্গে থাকে। এই বোধহয় সত্যিকার অর্থে দোযখ। হঠাৎ একটি মেয়ে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলো, রীনা আপা, ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকালাম আমি। কৃশ মলিন মুখ, বড় বড় চোখের মেয়েটিকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরুলো 'বাঁশি'। মেয়েটি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ওর বাবা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মালী। বাঁশি প্রায়ই আমাদের ফুল দিতো। আমার বুকের ভেতর মুখ রেখে সে কি কান্না। ছ'মাস পর এই প্রথম আমার চোখেও জল এলো। ওকে রাস্তা থেকে জিপে টেনে তুলে এনেছে। ওদের বাড়ির কেউ জানে না। ভেবেছে বোধহয় মরে গেছে। মরে কেন গেলাম না আপা? চাইলেই কি আর মরা যায় পাগলী। আমিই কি মরতে পেরেছি? অন্যেরা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বাঁশি বললো এখানে কথা বলাও মানা। জমাদারণীও খুব বজ্জাত, যখন তখন গায়ে হাত তোলে। শত অত্যাচারের ভেতরও একটা পৃথক ঘরে থাকতে পেরেছিলাম কিন্তু এ কোন জায়গায় এলাম।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চারিদিক থেকে কেবল গোলাগুলির আওয়াজ শুনি। বাঁশি ফিস ফিস করে বলে, আপা, কম জোরেরগুলো মুক্তিবাহিনীর বুঝলেন? অবাক হয়ে বললাম মুক্তিবাহিনী? হ্যাঁ, আপা, এখন খুব লাগছে। কোনদিন যেন আমাদের এইখানে থেকে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার আরও ঘৃণ্য দৃশ্য দেখার বাকি ছিল। দু'দিন পর দেখলাম ওই ঘরেরই একপাশে চার-পাঁচজন উন্মত্ত পশু একটা মেয়েকে টেনে নিয়ে সবার সামনেই ধর্ষণ করলো। ভয়ে কয়েকজন মুখ লুকিয়ে রইলো, কেউ-বা হাসছে। মনে হলো এদের বোধশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। যুদ্ধের ন'মাসে আমি যতো অত্যাচার দেখেছি এবং সয়েছি এটিই সর্বাধিক বর্বরোচিত ও ন্যাক্কারজনক। পশুত্বের এমন তাণ্ডবলীলা আমি আর দেখি নি।

এখন চারিদিকে কেমন একটা ব্যস্ততার ও সন্ত্রস্ত ভাব। কারণ বুঝি না। এ দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ যেন কমে এসেছে। তারপর একদিন হঠাৎ আমাদের সবাইকে ট্রাকে করে নিয়ে চললো ঢাকা। জিজ্ঞেস করলো, কেউ ছুটি পেতে চায় কিনা। কেউ রাজি না। এতোদিনে এরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে জেনে গেছে সবকিছু। বাঁশি বললো, জানো আপা ফালানী নামে একটা মেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মুক্তিরা ওকে চোর মনে করে গুলি করে মেরে ফেলেছে। কি সাংঘাতিক। বাঁশির অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। সবাই মিলে ট্রাকে উঠলাম। বুঝলাম কুর্মিটোলায় এলাম। বড় ভাইয়ের সঙ্গে কতো এসেছি। আজ তার নাম উচ্চারণ করলে আমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবে। অফিসারদের কেমন মুখ শুকনো আর জওয়ানরা রীতিমতো ভীত। প্রতিদিন বাইরে থেকে লোক এসে এখানে ভীড়

জমাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ ভোর রাতে প্রচণ্ড এয়ারক্রাফট-এর শব্দ। কি ব্যাপার একটু পরেই দ্রুম দ্রাম কোথায় যেন বোমা পড়ছে। সমস্ত শরীর কাঁপছে, সবাই কম্বল জড়িয়ে পরস্পরের গা ঘেঁষে বসে আছি। কিছুক্ষণ পর এ্যান্টি এয়ার ক্রাফট-এর দ্রিম দ্রাম শব্দ থামলো। অল ক্লিয়ার সাইরেন বাজালো। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এখন শুরু হলো আমাদের জল্পনা কল্পনা। এরা তো পালাবে কিন্তু আমাদের মেরে ফেলবে নিশ্চয়ই, না তা করবে না। আমাদের লাশ দেখলে মুক্তিবাহিনী কি ওদের ছেড়ে দেবে। আমাদের আহার নিদ্রা ঘুচে গেল। তাহলে কি সত্যিই মুক্তি আসন্ন। আবার বাইরে বেরুবো, বাড়ি যাবো—কিন্তু কোথায় বাড়ি, কোথায় কবর হয়েছিল বাবা, মা ও আলীর। বড় ভাই কি বেঁচে আছে? থাকলে নিশ্চয়ই আমার খোঁজ করবে। আর এই অবস্থা দেখলে পাগল হয়ে যাবে সে। রীনা যে তার কলিজার টুকরা ছিল। ছোটভাই বা কোথায়? বেঁচে আছে কিনা তাই-বা কে জানে। মুক্তির সময় যতো কাছে আসতে লাগলো আমাদের উত্তেজনা ও উদ্বেগও ততো বাড়তে লাগলো। আল্লাহ্ ওই শুভদিন আর কতোদূরে।

পরপর ক'দিন বোমা পড়লো। প্রথম প্রথম পাকিস্তানি বিমান উড়লো, তারপর সব চুপচাপ। মনে হলো এদের আর বিমান নেই। যুদ্ধ শেষ। শুনলাম লে. জেনারেল অরোরা আত্মসমর্পণের জন্য জেনারেল নিয়াজী ও রাও ফরমান আলীকে নির্দেশ দিচ্ছে। রেডিও থেকে একই কথা ভেসে আসছে। দূরে কামানের শব্দ। ১৬ই ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়াজী আত্মসমর্পণ করলো ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ নেতৃত্বের কাছে। আমাদের বলা হলো নিজ দায়িত্বে বাড়ি চলে যেতে পারো। বেশ কয়েকজন মেয়ে ওই লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই দৌড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু আমরা প্রায় জনা ত্রিশেক রয়ে গেলাম সেনানিবাসে। কোথায় যাবো? দেখি বড়ভাই থাকলে আমার খোঁজ নিশ্চয়ই করবে। আর যদি না থাকে তাহলে ঘরে ফিরে আমার লাভ কি! বাবা নেই, মা নেই, ভাইয়া নেই, এ মুখ নিয়ে আমি যাবো কোথায়? আত্মসমর্পণের পরও অস্ত্রত্যাগ করতে সময় লাগলো। কারণ ভারতীয় বাহিনী তখনও এসে পৌঁছায়নি। সামান্য হাজার পাঁচেক সৈন্য কয়েকজন অফিসার টাঙ্গাইলের দিক থেকে এসেছেন। মূলধারা এখনও নরসিংদীতে নদীর ওপারে।

ধীরে সুস্থে ব্যবস্থা হতে লাগলো। আমাদের অনেকের কাছ থেকেই ঠিকানা চেয়ে নিয়ে বাড়িতে খবর দেওয়া হলো। কারও কারও আত্মীয় স্বজন বাপ ভাই খবর পেয়ে ছুটে এলো। কিন্তু বেশির ভাগই সঙ্গে নিলো না মেয়েদের। বলে গেল পরে এসে নিয়ে যাবে। বাঁশির বাবা এলো, আদর করে বুকে জড়িয়ে বাঁশিকে নিয়ে গেল। যাবার সময় বাঁশি আমাকে সালাম করে বলে গেল ও গিয়েই আমাদের বাড়িতে খবর দেবে, নিশ্চয়ই তারা খবর পায় নি। ভাবলাম কেউ থাকলে তো খবর পাবে। কেন জানি না

আমি নিঃসন্দেহ হলাম আমার ভাইয়েরা কেউ বেঁচে নেই, সুতরাং পাকিস্তানিদের সঙ্গে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। হঠাৎ মনে হলো সেই পথের পাশের টোকাইয়ের মুখখানা 'মাগীবেবুশ্যে' যেখানেই যাবো ওই সম্বোধনই শুনতে হবে। তার চেয়ে চলে যাই বিদেশে একটা কিছু করে খাবো ওখানে। আর সহজ পথ তো চিনেই ফেলেছি।

হঠাৎ দুপুরের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনজন শিক্ষিকা এলেন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে। অর্থাৎ যারা পাকিস্তানে যাচ্ছে ওঁরা তাদের আটকাতে চান। আমাকে অনেক বোঝালেন, আমার কাজের অভাব হবে না, ভাইয়েরা না নিলেও নিজের উপার্জনে নিজে চলতে পারবো। চাকরির দায়িত্ব তাঁরা নেবেন, থাকবার ব্যবস্থাও করবেন। কিন্তু কেমন যেন একটা বিজাতীয় ক্রোধ আমাকে অস্থির করে তুললো। এরা নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলেন সুতরাং বড় বড় কথা বলা এঁদের শোভা পায়। পরে অবশ্য ওঁদের সম্পর্কে শুনেছি। ওঁরা অনেক কষ্ট করেছেন, সংগ্রাম করেছেন এবং সফল হয়েছেন। কিন্তু আমি? আমি তো কোনো কিছু করবার সুযোগ পাই নি। এমন কি আত্মহত্যা করবার সুযোগও আমার ছিল না। আমাকে যারা রক্ষা করতে পারে নি আজ কেন তারা আদর দেখাতে আসে। পরে স্থিরভাবে চিন্তা করলাম, না আমার একটা পরিচয় আছে। বাবা-মা না থাকলেও, ভাইয়েরা না থাকলেও আমি তো পথের ভিখিরি না। এখন ফিরে পরিত্যক্ত বাড়িতে উঠলে কেমন হবে। উঠতে পারবো কি, যদি অন্য কেউ দখল করে নিয়ে থাকে তাহলে আমার হয়ে লড়বে কে? না না দেহ-মনের এ অবস্থা নিয়ে আমি ওসব লড়াই ফ্যাসাদে যেতে পারবো না। তবে নীলিমা আপা আমার নাম ঠিকানা সব লিখে নিয়েছিলেন। কেন, তা আমি জানি না। অবশ্য সেদিন যদি ওটুকু লিখে না নিতেন তাহলে আমি চিরকালের জন্য হারিয়ে যেতাম। না, আমি ওদের কারও কথাতেই রাজি হলাম না। নওশেবা আপার মধুর ব্যবহার আমি এখনও স্মরণ করি। পরে অনেকবার ভেবেছি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো। কিন্তু কিসের লজ্জা আমাকে বাঁধা দিয়েছে, দূর থেকে অনেক অনুষ্ঠানে কলিম শরাফীর সঙ্গে ওঁকে দেখেছি কিন্তু আমার বর্তমান চেহারায় আমাকে চিনতে পারা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যাই হোক ওঁরা দুঃখ নিয়ে ফিরে গেলেন। আমি অপরিচিত অন্ধকার জীবনের পথে পা বাড়াবার প্রস্তুতি নিলাম। তারপর একদিন শেষ বারের মতো চোখের জলে বুক ভিজিয়ে সোনার বাংলার সীমান্ত, ওই রক্তখচিত পতাকা সব ফেলে চলে এলাম। ওই পতাকা অর্জনে কি আমার বা আমার মতো যেসব মেয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাদের কোনও অবদান নেই? আজ পথে পথে কতো শহীদ মিনার। কতো পথ-ঘাট-কালভার্ট-সেতু আজ উৎসর্গিত হচ্ছে শহীদদের নামে। শহীদের পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তানেরা কতো রাষ্ট্রীয় সহায়তা সহানুভূতিই শুধু নয়, সম্মান পাচ্ছে কিন্তু আমরা কোথায়? একজন বীরাঙ্গনার নামে কি একটি সড়কের নামকরণ করা

হয়েছে? তারা মরে কি শহীদ হয়নি? তাহলে এ অবিচার কেন? বিদেশে তো কতো যুদ্ধবন্দি মহিলাকে দেখেছি। অনায়াসে তারা তাদের জীবনের কাহিনী বলে গেছেন হাসি অশ্রুর মিশ্রণে। তাহলে আমরা কেন অসম্মানের রজ্জুতে বাঁধা থাকবো? এ কোন মানবাধিকারের মানদণ্ড? যেদিন আমার নারীত্ব লুণ্ঠিত হয়েছিল সেদিনও এমন আঘাত পাই নি, যে আঘাত পেলাম বাংলাদেশের পতাকাকে পেছনে ফেলে ভারতে ঢুকতে। ঐ মুহূর্তে আমার চেতনা হলো এ আমি কি করলাম? আজ থেকে আমি পাকিস্তানি নাগরিক! ধিক্কার আমাকে। তিলে তিলে ন'মাস যে নির্যাতন সহ্য করেছি তা সব ধুলোয় লুটিয়ে গেল। না ভারত থেকেই আমাকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জানি আজ যদি আমি ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বলি এরা আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে তা হলেই তো মুক্তি পাবো। কিন্তু তারপর? সেটা তখন দেখা যাবে।

মহাসমারোহে বন্দি শিবিরে ঢুকলাম। পাকিস্তানিদের সে কি আনন্দ উল্লাস। বুঝলাম এ ওদের প্রাণে বেঁচে যাবার স্ফূর্তি। কই আমাকে তো কেউ বাঁচাতে এগিয়ে এলো না। কুমিল্লা হাসপাতালে বাঙালি অফিসার দেখেছি, তাঁরাও তো কখনও আমাকে জিজ্ঞেস করে নি আমি মুক্তি চাই কিনা। যাক অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। নিজের ভাগ্য ও অক্ষমতাকেই ধিক্কার দিই। সাতদিন কেটে গেল কেমন একটা আচ্ছন্নতার ভেতর দিয়ে। হঠাৎ একজন লোক এসে বললো, আপনার ভিজিটর এসেছে? আপনাকে ভিজিটরদের রুমে যেতে বলেছে। আমার ভিজিটর? কে হতে পারে? না, না, ভুল আছে কোথাও। লোকটি তাগাদা দিলো, কই চলুন। মাথায় গায়ে ভালো করে দোপাট্টা জড়িয়ে অনিচ্ছুক মনে ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে নিয়ে চললাম। বেশ কিছুটা হেঁটে একটা করিডোরের শেষ মাথায় এসে পর্দা তুলে দাঁড়ালো লোকটি। বললো, যান। পা দুটো আমার মনে হয় মাটির সঙ্গে সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা হয়ে গেছে। সামনে এগুবার বা পেছনে ছুটে পালাবার শক্তি আমার নেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো ভাইয়া, আমার হাত দুটো ধরতেই ওর বুকে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ভাইয়া, আমি মরে গেছি, আমি মরে গেছি। ভাইয়া শুধু আস্তে আস্তে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো এবং আমাকে প্রাণভরে কাঁদতে দিলো। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে পাশে বসলো। বললো, রিনী, তোকে আমি এখন নিয়ে যাবো। তুই তৈরি হয়ে আয়। বলেই অপ্রস্তুত হয়ে বললো, না থাক যাবার পথে নিউ মার্কেট থেকে তোর জন্যে কাপড় জামা কিনে নিয়ে যাবো। আমাকে কিছু কাগজপত্র এখনই সই করতে হবে তুই চুপটি করে বোস। ভাইয়া টেবিলে বসে থাকা অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বললো এবং কি কি সব কাগজে সই করলো। আমার দুতিনটে কাগজে সই করতে হলো। আমি শুধু ঐ ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, আমি বাংলাদেশের পাসপোর্ট পাবো কি? নিশ্চয়ই! উইশ ইউ গুড লাক্

এ্যান্ড হ্যাপি লাইফ।

বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিলো ভাইয়া। বললো নিউমার্কেট। আমি শুধু রাস্তা দেখছি, আর দেখছি অগণিত লোকের হেঁটে যাওয়া। ওরা স্বাধীন। ওদের কেউ ধরে নেবে না। হঠাৎ ভাইয়াকে জড়িয়ে ধরলাম। ভাইয়া মাথায় হাত দিয়ে বললো, ভয় কিরে? আমি তো এসে গেছি। খোকা (অর্থাৎ ছোট ভাই) তোর জন্যে বাড়ি সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। আলী ভাইকে দেখলে চিনতে পারবি না। চমকে উঠলাম, আলী ভাই বেঁচে আছে? আছে, তবে বা পাটা কেটে ফেলেছে। আর কিছু জিজ্ঞেস করতেও ভয় হলো। মার্কেটে নেমে ভাইয়া জিজ্ঞেস করলো শাড়ি কিনবি না সালোয়ার কামিজ। স্থির দৃষ্টিতে ভাইয়ার মুখ জরিপ করে বললাম শাড়ি। শাড়ি, জুতো, স্যান্ডেল, প্রসাধনী, চিরুনি, ব্রাশ সব কেনা হলো তারপর গিয়ে উঠলাম নিউ মার্কেটের কাছে একটা হোটেলে। আমরা পরদিন সকালের ফ্লাইটে ঢাকা যাবো। সারাটা দিন ভাইয়ার সঙ্গে ছোটবেলার মতো ঘুরলাম।

সিনেমা দেখলাম, প্রচুর গল্প করলাম। ভাইয়া তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলো, খোকা কেমন করে বেঁচে গেছে অল্পের জন্য তাও বললো। আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম আমি যে এখানে আছি তুমি কি করে জানলে? ভাইয়ার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বললেন ঢাকায় ভারতীয় মিলিটারীর ব্রিগেডিয়ার ভার্মার কাছে গিয়েছিলাম যদি তোর কোনও খবর পাওয়া যায়। ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক, ধৈর্য ধরে সব শুনলেন। পরে বললেন, যেসব বাঙালি মহিলা পাকিস্তানি বন্দিদের সঙ্গে গেছে তাদের কিছু হিসাব আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিমের কাছে। আপনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন। 'গুড্ লাক্'।

অনেক কষ্টে নীলিমা ইব্রাহিমের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। উনি তোর নাম শুনে খুবই উত্তেজিত হলেন। বললেন, অনেক চেষ্টা করেছিলাম বাবা, কিন্তু কিছুতেই ওকে আটকাতে পারলাম না। সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ আর অভিমান নিয়ে ও চলে গেল। তুমি অশোকের কাছে যাও আমি ওকে বলে দিচ্ছি। ও তোমার বোনকে খুঁজে দেবে। ব্রিগেডিয়ার ভার্মার নাম অশোক। সত্যিই অশোক তার দিদির নির্দেশে আমার জন্য যা করেছে তা বলে শেষ করতে পারবো না রিনী। উনি না থাকলে আমি হয়তো আর তোকে খুঁজে পেতাম না।

ঢাকাতেও আমরা কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে উঠলাম না। একরাত হোটেলে রইলাম। ভাইয়ার অফিসে যেতে হলো ছুটির ব্যবস্থা করতে। তাছাড়া আমার সম্পর্কেও বাংলাদেশ সরকারকে কি কি কাগজ পত্রদিতে হলো। রাতের ট্রেনে রওয়ানা হলাম। পরদিন নিজেদের বাড়ি।

সব কিছুই তেমনি আছে তবে সব মানুষ জড় পদার্থের মতো হয়ে গেছে। আলী

ভাই ক্রাচ্ নিয়ে এসে দাঁড়ালো। গামছা দিয়ে চোখ ঢেকে বললো। এ তোমার কি চেহারা হয়েছে আপামণি। কেন? ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, আমি তো ভলো আছি। কিন্তু তুমি তো আমার জন্য পা হারালে। আমাকে কথা শেষ করতে দিলো না আলী ভাই, মুখ চেপে ধরলো। সবাই মিলে চেষ্টা করে বাড়িটাকে জীবন্ত করে তোলা হলো।

আব্বা আম্মার জন্য মিলাদ পড়ানো হলো। অনেকেই এলেন, কেউ কথা বললেন না। সবাই বলতে গেলে স্বাভাবিক ব্যবহার করলেন, আব্বা-আম্মার জন্য দুঃখ করলেন। মহিলারা কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন, আমি সুযোগ দিলাম না। প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখী যে হতে হবে তা বুঝতে পারলাম।

বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। ভাইয়া আমাকে যাবার জন্য জিদ্ করলো। বললো তুই স্বাভাবিক না হলে কেউ তোকে স্বাভাবিক হতে দেবে না। আরও যন্ত্রণা বাড়াবে, শেষ পর্যন্ত গেলাম। পুরোনো ক্লাসফ্রেন্ড কয়েক জনের সঙ্গে দেখা হলো। ওরা মুক্তিযুদ্ধের গল্প করলো। আমাকে বললো, এবার তোর কথা বল? বললাম, আমার কথা? শুনালাম আর সবাই গিললো; সবার অনাবিল হাসি থমকে আবহাওয়া ঠাণ্ডা শীতল হয়ে গেল। স্যারদের সঙ্গে দেখা করলাম। জুনিয়র স্যার একেবারেই স্বাভাবিক ব্যবহার করলেন। কিন্তু সিনিয়রদের ভেতর দু'একজন বেশ তীর্যক ভঙ্গিতে চাইলেন এবং বাঁকা প্রশ্ন করলেন। চুপ করে গেলাম। ভাবলাম পায়ের নিচের মাটি শক্ত হোক তারপর দেখে নেবো। কিন্তু মাটি কি আজও শক্ত হয়েছে!

গতানুগতিক জীবন কেটে যায়। বাসায় আমি একা, সেই পুরোনো মায়ের আমলের বুয়া আর আলী ভাই। আলী ভাই আমাকে সর্বক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখে। ও কেন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গেছে। ভাইয়া প্রায়ই আসে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে হলেও আমাদের দেখে যায়। একদিন সংকোচ ত্যাগ করে বললাম, ভাইয়া তুই বিয়ে কর। ভাবি এলে আমার এতো একা একা লাগবে না। ভাইয়া হেসে বললো, আমি বিয়ে করলে তোর ভাবি এখানে থাকবে? ও আমার সঙ্গে যেতে চাইবে না? চাইলেও... কথাটা শেষ করতে পারলাম না। ভাইয়া বললো, আগে তোর ব্যবস্থা করি তারপর নিজের। আতোয়ারের সঙ্গে কথা হয়েছে। ও সামারে আসবে তখন সব কথা হবে।

আপন অলক্ষ্যে আমার ওষ্ঠে ম্লান হাসি দেখে ভাইয়া বললো, না, না, তুই ওকে ভুল বুঝিস না। জবাব দিলাম না। আজ প্রায় পাঁচমাস হলো আমি এখানে এসেছি, ভাইয়ার সঙ্গে তার কথাও হয়েছে অথচ আমাকে একটা ফোন পর্যন্ত করে নি। আমি কিন্তু ওকে চেষ্টা করে ভুলতে বসেছি। কারণ ওকে আমি চিনি। ও ভালোমানুষ কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ নয়। ও আমাকে নিয়ে সমাজের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না।

তবুও ভাইয়ার স্বপ্নটা ভাঙতে ইচ্ছে হলো না।

সামনে পরীক্ষা, প্রস্তুতি নিলাম। লাইব্রেরিতে এখন আর খুব বেশি যাই না, ঘরেই পড়াশোনা করি। সহপাঠীদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে আসে। তবে আগের মতো কারও সঙ্গেই খোলা মেলা মিশি না, একটু দূরত্ব রেখেই চলি। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য কোনও মেয়ে আমাদের বাসায় আসে না। ক্লাশে গেলেও ওরা প্রশ্ন করলে উত্তর দিয়েছি কিন্তু গায়ে পড়ে কথা বলে নি । কিন্তু কেন? আমি ওদেরই মতো একজন, আমার মতো দুর্ভাগ্য তো ওদেরও হতে পারতো। কেউ কেউ ফাঁক পেলে প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে আমার বন্দিজীবনের কথা জানতে চেয়েছে। নিঃসন্দেহে আমি তাদের উপেক্ষা করেছি। এখন আমিও ওদের এড়িয়ে চলি। আমি এমন কোনও কাজ স্বেচ্ছায় করি নি যে ওদের কাছে নতি স্বীকার করে থাকতে হবে। কি আশ্চর্য মানসিকতা। সত্যি লেখাপড়া শিখে বড় চাকুরি করা যায় কিন্তু মনের প্রসারতা বাড়াতে গেলে যে মুক্ত উদার পরিবেশ প্রয়োজন ওরা তা থেকে বঞ্চিত। তাই ওদের করুণা করলাম মনে মনে, আর সরে এলাম দূরে।

এরপর এল কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। আতোয়ার এলো। ওর আসবার খবর পেয়েছি। ভেবেছিলাম এসেই ছুটে আসবে আমাদের বাড়ি। কিন্তু না। আমার মনের অস্থিরতা আলী ভাই বুঝলো। বললো, আপামণি, আতোয়ার ভাই আসছে। অতোদূর থিকা আসছে তা একটু ঠাণ্ডা হইলেই আমাগো বাড়ি আসবো। হয়তো তাই, আলী ভাইয়ের কথা সত্যি হোক। তৃতীয় দিন সকালে আতোয়ার এল। আগের থেকে অনেক সুন্দর ও স্মার্ট হয়েছে, সরাসরি ওর সামনে এলাম। আমার জড়তা অনেক কেটে গেছে ওকে বসতে বললাম। 'কেমন আছ' জিজ্ঞেস করলে ও হ্যাঁ অতি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো। বললাম, কাল আসোনি কেন? বললো, তুমি একা থাকো তাই হুট করে আসাটা ঠিক হবে কিনা ভাবছিলাম। আমি ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম। উত্তর দেয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলো ও। বললো, কই চা খাওয়াবে না? সঙ্গে সঙ্গে পর্দা ঠেলে আলী ভাই ঢুকলো চায়ের সরঞ্জাম ও কিছু নাশ্‌তা নিয়ে। অবশ্য ও দু'হাত ব্যবহার করতে পারে না, তাই সঙ্গে বুয়া।

আতোয়ার চমকে উঠলো, এ কি? এ তোমার কি হয়েছে আলী ভাই? এই তো কতো মানুষ দ্যাশের জন্য জান দিছে, আমি একখান মাত্র পা দিলাম। বেদনায় আতোয়ারের মুখ ম্লান হয়ে উঠলো। আমি দুঃখিত আলী ভাই, তোমাকে আঘাত দিলাম। আতোয়ারের রপ্ত করা বিলাতী ভদ্রতা। আলী ভাই কথা বাড়ালো না। তোমরা খাও বলে ভেতরে চলে গেল। আলী ভাইয়ের পায়ের কথা বললে ওর আব্বা আম্মার কথা মনে হয় আর ডুকরে ডুকরে কাঁদে। আলী ভাই নিজে ওই বাগানের বেড়ার কাছে কবর দিয়েছে তাদের। এক পা টেনে টেনে গোসল করিয়েছে। কবর

খুঁড়বার সময় একজন রিকশাওয়ালা ওকে সাহায্য করেছিল। সেই পরে আলী ভাইকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। সব ব্যবস্থা করেছে। তার নাম সালাম। এখনও আসে। ভাইয়া ওকে জামা কাপড় টাকা পয়সা যখন যা পারে দেয়। ওকি, চা নাও। দেখো আলী ভাই তোমার প্রিয় পাঁপড় ভাজা দিতেও ভোলে নি। সন্ধেবেলা আতোয়ার উঠে গেল। বললো রিনা নদীর ধারে যাবে? মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালাম। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। সেই সৌভাগ্য কি আমার সইবে?

না, বীরাঙ্গনার ভাগ্যে বাংলাদেশের কোনো সুখই সয় নি। অন্তত আমার জানামতে না। দিন সাতেক পর ভাইয়া এলো। সরাসরি আতোয়ারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। আতোয়ার কিছুদিন সময় চাইতেই ভাই স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলো, দেখো আতোয়ার আমি স্পষ্ট জবাব চাই তুমি এ বিয়ে করবে কিনা। কারণ যেভাবেই হোক আমি জেনেছি আমার বোনের উপর তোমার দুর্বলতা আছে। তুমি ওকে পছন্দ করতে সেটাও আমি জানতাম তাই তোমাকে কষ্ট দেওয়া। না, না, এ আপনি কি বলছেন। আমি আব্বা-আম্মার সঙ্গে আলাপ করে আপনাকে জানাবো। আব্বা- আম্মার সঙ্গে আলাপ—ভাইয়া যেন তিক্তভাবে হেসে উঠলেন। বেশ, করো কিন্তু আমি চারদিনের বেশি থাকতে পারবো না। যাবার আগে তোমার মতামত জেনে যেতে চাই।

ভাইয়া বেরিয়ে গেল। আতোয়ার হঠাৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো ভাইয়ার এমনভাবে আমাকে কথা বলাটা কি ঠিক হলো? বিয়ে করলে বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করবো না? ওঁরা যদি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আপত্তি করেন, তাহলে কি করবে তুমি সেটাও ভেবে রেখো। অফকোর্স নিশ্চয়ই ভাববো। তবে আজ তোমাকে একটা কথা বলছি আতোয়ার। স্বাধীনতা তোমাদের অনেক দিয়েছে আর ভাইয়া হারিয়েছে অনেক। সেজন্য ওর মেজাজটা সব সময় স্বাভাবিক থাকে না। সেটা ঠিক, কিন্তু তোমাদের পরিবারে এ দুঃখ দুর্দিনের জন্য তো তোমরা আমাকে দায়ী করতে পারো না? তুমি কি বলছো আতোয়ার, তোমাকে দায়ী করবো কেন, কোনও সৌভাগ্যবানকেই আমরা দায়ী করি না। আমরা সচেতন মন-মানসিকতা নিয়েই এ দুর্যোগে ঝাঁপ দিয়েছি এবং কাটিয়ে উঠবার দায়ও আমাদের। তবে... না ঠিক আছে। আজ এ পর্যন্ত রইল। তুমি যাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাও, যাঁদের অনুমতি নিতে চাও স্বচ্ছন্দে নিতে পারো। তবে আমি তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, আমি তোমার কোনও দায় বা বোঝা নই। আমার ব্যাপারে তোমার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাই তুমি ভেবে চিন্তেই পা ফেলো।

শেষ পর্যন্ত আতোয়ার বিয়েতে মত দিলো। ভাইয়া প্রচণ্ড খুশি হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বার বার অভিনন্দন জানাতে থাকলো। আমার খুব লজ্জা হলো। আমি কি এমনই গলগ্রহ? এ কি বোনের বিয়ে, না দায়মুক্তি? না না মনটা আমার খুব ছোট

হয়ে গেছে। এসব কি ভাবছি আমি আমার ফেরেশতার মতো ভাইয়া সম্পর্কে। কিন্তু জীবনে যে জটিলতার গ্রন্থি আমি গলায় পরেছি তার থেকে কি সহজে মুক্তি পাবো? আতোয়ার বলতে গেলে গোপনে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। সামান্য ঘরোয়াভাবেই আমাদের বাড়িতে বিয়ে হবে। আমি এখানেই থাকবো। ও গিয়ে কাগজপত্র ঠিক করতে ৬ মাস ৯ মাস যা লাগে তারপর আমি যেতে পারবো ওর কাছে। অবশ্য এ ব্যাপারে আমিও একমত ছিলাম। হৈ চৈ লোক জানাজানি আমারও ভালো লাগছিল না। তবুও ভাবলাম এ গোপনীয়তা ওদের দিক থেকে কেন? এমন কি ওর আব্বা-আম্মা তখন ঢাকায় যাবেন ওর বোনের বাড়িতে। তাহলে কি সত্যিই এটা দায়সারা। কেমন যেন দোলায়মান হলো মনটা। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটলো ভাইয়াকে যখন এ কথাটা আতোয়ার বললো। চিৎকার করে উঠলেন ভাইয়া, কেন? গোপন কেন? এ আবার কেমন কথা? একদিন তো সেক্রেটারীর মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য তোমার সমস্ত পরিবারের আগ্রহের সীমা ছিল না। আজ বুঝি তিনি নেই তাই? কি ভেবেছো আমাদের? আমাদের দু'ভাইয়ের পরিচয় নেই? আমি কর্ণেল, ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার। তোমাদের থেকে আমরা কম কিসে? তবে যদি মনে করে থাকো আমার বোন উচ্ছিষ্ট তাহলে তোমাকে আমিই নিষেধ করবো এ বিয়ে তুমি করো না। মন পরিচ্ছন্ন করতে পারলে এসো, না হয় এখানেই শেষ। ভাইয়া দু'হাতে মাথা চেপে সোফায় বসে পড়লো। মনে হচ্ছিল আমি চিৎকার করে কাঁদি। কোন্ অশুভ লগ্নে আমার জন্ম হয়েছিল। পিতা-মাতাকে শেষ করলাম, এখন তো ভাইকেও পাগল বানাতে বসেছি। খোকা নিশ্চল পাথরের মতো ঘরের পর্দা ধরে দাঁড়ালো।

আমিই শক্তি সঞ্চয় করলাম। সুষ্ঠু বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললাম, আতোয়ার আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। যে পরিবারে আমি জন্মেছি সেখানে অনুদারতা, কাপুরুষতা ঘৃণার বস্তু। আমি তোমায় ঘৃণা করি। হ্যাঁ সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি। তুমি যেতে পারো, ভুলেও কখনো আর এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াবে না ভালো করে শুনে যাও আমি বীরাঙ্গনা, কখনো ভীরুর কণ্ঠলগ্না হবো না। যেতে পারো তুমি! পর্দা তুলে পাশের ঘরে গিয়ে বাবার বিছানায় শুয়ে ভেঙে পড়লাম। বাবা, বাবাগো। ভাইয়া এসে আমার মাথায় হাত রেখে বললো, এ তুই কি করলি রীনি? আমিই-বা কেন অমন চণ্ডালের মতো রেগে উঠলাম বলতো? তোকে দেশে ফিরিয়ে এনে শেষ পর্যন্ত কি তোর জীবনটা নষ্ট করে দিলাম? ভাইয়া তুমি থামবে, আমি কি কচি খুকি? নিজের দায়িত্ব নেবার মতো বয়স আমার হয়নি? শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কি আমি অর্জন করিনি? তুমি আমাকে একটু একা ছেড়ে দাও। নিজের কাঁধের বোঝা একটু হালকা করো তো। আমার বিয়ের প্রয়োজন হলে আমি তোমাকে জানাবো, ফকিরের মতো আমার বর খোঁজার জন্য দরজায় দরজায় হাত পেতো না। ঠিক আছে তাই হবে। বিয়ে প্রসঙ্গ

বাদ। এ বাড়িতে স্বইচ্ছায় তুই বিয়ে করবি তারপরই ছেলেদের বিয়ে হবে, রাজি? হাত বাড়িয়ে ওর হাত চেপে ধরলাম রাজি, রাজি, রাজি। মুখে চোখে পানি দিয়ে খুশি মনে ও খোশ মেজাজে তিন ভাইবোন চা খেতে বসলাম। মনে হলো আলী ভাইও একটু স্বস্তি বোধ করছে।

দিন যায়, থেমে থাকে না। আমাদের দিনও চললো তবে পথটা আর সরল সহজ রইল না। আমার পরীক্ষার পর এখানে একা বাসায় থাকাটা আর সমীচীন মনে হলো না। এক সময় আতোয়ারের জন্য একটা টান ছিল আমার, এখন তাও ছিন্ন। অবশ্য আরও দু'চার বার সে এসেছিল কিন্তু মেরুদণ্ডহীন পুরুষের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়া কষ্টকর। অবশ্য পরে আর ওর সঙ্গে যোগাযোগ হয় নি। হয়েছে বহু বছর পর বিদেশের মাটিতে শ্বেতাঙ্গিনী অর্ধাঙ্গিনীসহ। বাড়ি ভাড়া দিয়ে আলী ভাইসহ ঢাকায় ভাইয়ার বাসায় সেনানিবাসে চলে এলাম। বুয়া চোখের জলে বিদায় নিলো। একটা ঘরে বাবা-মার অনেক জিনিসপত্র বন্ধ করে রেখে দেওয়া হলো। মায়ের সাধের সংসার আর পুত্রবধূর হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারলেন না। পরীক্ষার ফল বেরুলো, মোটামুটি অবস্থান, সেনানিবাসের কাছাকাছি একটা স্কুলে কাজ নিলাম। সকালে ভাইয়া পৌঁছে দেয়, ছুটির পর এক সহকর্মীর সঙ্গে ফিরি। ওরা আমাদের কাছেই থাকে। মিতুও আমারই মতো ভাইয়ার কাছে থাকে। তবে ওর মা আছেন তাই সুখের বন্ধন আছে। মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যায়। ওর মাকে খুব ভালো লাগে। খুব স্নেহ করেন আমাকে। মাকে মনে করে চোখে পানি আসে। খোকা চলে যাচ্ছে জার্মানি, হায়ার স্টাডিজের জন্য অথচ ভাইয়া কতো ব্রিলিয়ান্ট ছিল, আমার জন্য কিছু করতে পারলো না।

মিতুর মেজভাই ডাক্তার। সেও আর্মিতে আছে। পোস্টিং যশোরে। মাঝে মাঝে আসে হৈ চৈ করে চলে যায়। বিয়ের জন্য ওরা মেয়ে খুঁজছে। ওর মা আভাসে আমাকে বোঝাতে চান। কিন্তু ওরা তো জানে না আমি বীরাঙ্গনা নামক এক অস্পৃশ্য চণ্ডালিনী। আমার সব আছে, নেই শুধু সমাজ আর সংসারের বন্ধন।

হঠাৎ একদিন মিতু ওর ভাই নাসিরকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলো। আমি অপ্রস্তুত। বললাম, একটু খবর দিয়ে এলে কি হতো? মিতু বললো, কেন, পোলাও রান্না করতি? সেটা এখনও করতে পারিস মেজভাইয়ার হাতে অফুরন্ত সময়।

সেকি? ছুটি নিয়েছে নাকি? নাসির হেসে বললো, হ্যাঁ, মায়ের আদেশে আরও দু'দিন ঢাকায় থাকতে হবে। কার নাকি রংপুর থেকে আমাকে দেখতে আসবে। আমি হাসি চাপতে না পেরে মুখে কাপড় চাপা দিলাম।

ওকি হাসছেন যে! বিশ্বাস না হয় মিতুকেই জিজ্ঞেস করুন। মিতু গম্ভীর হয়ে

বললো, ঘটনাটা সত্য, কনেপক্ষ জামাই দেখতে আসবে, কানা, খোঁড়া, লুলা, লেংড়া কিনা দেখে তবে ফাইনাল কথা।

তাহলে মেয়ে আপনার পছন্দ হয়েছে? প্রশ্ন করলাম লজ্জা ত্যাগ করে।

কেমন করে শুধু তো বাঁশি শুনেছি। রূপগুণের বর্ণনা, বাপের বিষয় সম্পত্তির হিসাব ইত্যাদি ইত্যাদি। বলার ভঙ্গীতে তিনজনেই হেসে উঠলাম। চায়ের জন্য ভেতরে যেতেই মিতু বললো, তোকে ভাইয়ার খুব পছন্দ, তুই সম্মতি দিলে আম্মা তোর ভাইয়ার কাছে কথা পাড়বেন।

পাগল হয়েছিস? আমি ওসব ভাবিই না। বললাম আমি দ্রুত। তোর কি মাথা খারাপ, বিয়ে তো করতেই হবে। আমিও শিগগিরই চলে যাবো। তাই আম্মা মেজভাইয়ার এখন বিয়ে দিতে চান। মিতু বাগ্‌দত্তা। জামাই আবুধাবীতে আছে। তিনমাস পরে এসে রুসমত সেরে ওকে নিয়ে যাবে। বললাম, ব্যস্ত কি? আমায় একটু ভাবতে সময় দে। মিতু গম্ভীর হলো। এর চেয়ে ভালো স্বভাবের ছেলে তুই পাবি না, দেখে নিস। বেশ তো না পেলে তো হাতের পাঁচ রইলই।

চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বাইরের ঘরে এলাম। নাসির ঘুরে ঘুরে সব দেখছে। বাবা-মার ফটো দেখে জিজ্ঞাসু চোখে চাইলো। বললাম আব্বা, আম্মা একাত্তরে শহীদ, নিজের ঘরের ভেতরেই। চমকে উঠলো ভাই-বোন। এতো বড় খবরটা ওরা জানতো না। পরিবেশটা কেমন যেন বেদনাতুর হয়ে উঠলো। আমি প্রসঙ্গ যতো চাপা দিতে চেষ্টা করি নাসির ততোই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করে। বললাম, আজ নয় নাসির সাহেব আরেক দিন সময় করে আসুন সব গল্প বলবো আপনাকে। অবশ্য গল্প নয়, আমাদের পারিবারিক ইতিহাস। মিতুরা ভাইবোন চলে গেল। আমি ভাবনার রাজ্যে ডুবে গেলাম। না, পালানো নয়, লুকানো নয়। আমি খোলাখুলি সব বলবো, তারপর? তারপর আর কি? নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত তো নিয়েই বসেছি। স্বামী, সংসার সন্তান সুখের দাম্পত্য জীবন সেতো আতোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে আমার চৌহদ্দি ছেড়ে পালিয়েছে। দেখাই যাক্ না নাসির সাহেবের প্রতিক্রিয়া। এখন কিন্তু কষ্ট হয় না, লজ্জা হয় না, অপমানবোধ করি না। উপরন্তু ওই চিকেন হার্টেড্ আধা অন্ধ মানুষগুলোর উপর অনুকম্পা জাগে। পরদিন আমাদের ছুটি কি একটা ধর্মীয় পার্বন উপলক্ষে, ভাইয়া অফিসে। রাস্তার দিকে পিঠ দিয়ে বারান্দায় বসে কাগজের পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিলাম। খুন, জখম, ধর্ষণ, কুপিয়ে স্ত্রী হত্যা, পুড়িয়ে পত্নী হত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যিই ভয় করে, কার ভেতরে কোন পশু জেগে ওঠে বলা যায় না। এর ভেতর রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন হয়ে গেছে। যিনি আমাদের বীরাঙ্গনার সম্মানে ভূষিত করেছিলেন তিনি বীরশ্রেষ্ঠ হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিন-চার মাসের ভেতর নানা রকম পট পরিবর্তন হলো। মানুষের লোভ লালসা শুধু অর্থের প্রতি নয়,

ক্ষমতার প্রতিও। সব দেখছি আর ভাবছি এই বানরের পিঠা ভাগের জন্য কি ত্রিশ লাখ শহীদ হয়েছিল এ বাংলার মাটিতে। আমার বাবা ও মা কি এদের এই বিশ্বাসঘাতকতার উগ্র প্রকাশের জন্য অমন সুন্দর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন? এতো অবক্ষয় এতো তাড়াতাড়ি। অর্থের লোভের চেয়েও ক্ষমতার লোভ আরও বেশি এবং ঘৃণ্য বলে মনে হয়। অনেক সময় আহার্য বা আরামের জন্য মানুষ অর্থলিপ্সু হয় কিন্তু ক্ষমতালিপ্সা তো শুধু দানবশক্তি লাভের জন্য। ছিঃ! হঠাৎ পেছনে মোটর সাইকেলের শব্দ পেলাম। মুখ ঘুরিয়ে দেখি নাসির। একমুখ হাসি ছড়িয়ে বললো, এসে গেলাম, কাহিনী শুনতে। কাল যে দাওয়াত দিয়েছিলেন মনে আছে? হেসে বললাম, আসুন, দাওয়াত দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু যতোদূর মনে পড়ে আজ এবং সকালেই তাতো মনে পড়ে না। নাসির হেসে বললো, সাধে বলে যে মেয়েদের বারো হাত শাড়িতে ঘোমটা আঁটে না, সময় তারিখ না থাকলে আমরা ধরে নিই, এনি ডে, এনি টাইম। কি বসতে বলবেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলে যাবো?

আরে না না বসুন। রীনা বিব্রতবোধ করে। অতোদূর থেকে হোন্ডা চালিয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে? চায়ের কথা বলে আসি? বলবেন তবে শুধু চায়ে তো খিদে নষ্ট হবে, সঙ্গে আর কিছু হবে না, নাসির হাসে। সত্যিই আপনি শুধু বেহায়া না পেটুকও।

রীনা ভেতরে চলে গেল। নাসির গুন গুন করে রবীন্দ্র সংগীতের সুর ভাজতে শুরু করলো। রীনা এলো, নিঃশব্দে বসে পড়লো। নাসিরও স্থির হয়ে বসলো। কই, বলুন সে-সব কথা।

নিশ্চয় বলবো। তবে আগে চাটা খেয়ে নিন, নইলে হয়তো খাওয়াই হবে না। রীনা চুপ করে রইলো। নাসির বললো, দেখুন আমি গোমড়া মুখ দেখতে ভালোবাসি না। প্লিজ একটু হাসুন। রীনা গম্ভীর মুখে বললো, আপনার ভালোবাসা বা ভালোলাগার ওপর নির্ভর করে আমাকে চলতে হবে নাকি? হতেও তো পারে, কিছু কি বলা যায়? এবার রীনা হেসে ফেললো।

বুয়া চা নিয়ে এলো। না, না ভেতরেই দাও, আসুন নাসির সাহেব চা খেয়ে তারপর এখানে এসে বসবো। হাসি-গল্পে-ঠাট্টা-তামাশায় চা-পর্ব শেষ হলো। মনে হলো জীবনের দুঃখকে নাসির ঠাঁই দিতে রাজি না। রীনাও তো একদিন অমনিই ছিল। তারপর কি দিয়ে কি হয়ে গেল। বাইরে এসে বসলো দু'জনে। রীনা শুরু করলো... সব শেষে বললো নাসির, আমি বীরাঙ্গনা, সেটা আমার লজ্জা না, গর্ব। অন্তত নিজের সম্পর্কে এই আমার অভিমত, বিশ্বাস করুন। ভালো কথা, আগ্রহের সঙ্গে বললো নাসির, আমিও তো মুক্তিযোদ্ধা আর সেটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাহলে তোমারই-বা অহংকার থাকবে না কেন? লজ্জা? কিসের লজ্জা? লজ্জা

তাদের যারা দেশের বোনকে রক্ষা করতে পারেনি? শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছে। আমাদের এ অপরাধের জন্য আমি সবার পক্ষ থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। কি আরও কিছু করতে হবে? নতজানু হয়ে জোড়হাতে দাড়ালো নাসির। রীনার দু'চোখের জল গাল বেয়ে নামছে তখন। নাসির তখন গিয়ে ওকে সযত্নে কাছে টেনে নিলো, চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললো, তাহলে মাকে বলি আমাদের প্রস্তাব মঞ্জুর? রীনা ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। কিছুক্ষণ পর নাসির চলে গেল। রীনা ওখানে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এ কি সত্যি? তার জীবন এমনভাবে ভরে উঠবে, পূর্ণতা পাবে এও কি সম্ভব! এর পেছনে আব্বা-আম্মার দোয়া আছে, আর আছে আমার ভাইয়ার সাধনা। আকাশটা যেন আজ বড় বেশি উজ্জ্বল, গাছগুলো সবুজের গর্বে বিস্ফোরিত, বাগানের প্রতিটি ফুল হাসছে, রীনা কি করবে এখন? ফোন এলো, মিতু হেসে গড়িয়ে পড়ছে। বললো, ভাবি কনগ্রাচুলেশনস্। ফোন ছাড়তে চায় না, ভাইয়ার সঙ্গে কথা বলতে ওরা কাল আসবে।

বিয়ের পর বাসরঘরে ঢুকে নাসির আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, তোমাকে অভিনন্দন বীরাঙ্গনা! লজ্জায় মুখ তুলতে 'পারি নি। ভাইয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে তার সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করে সে বোনের বিয়ে দিয়েছে।

সহজভাবে জীবন চলেছে। আমি নিঃসন্দেহে সুখী। আমাদের তিনটি সন্তান দু'টি ছেলে একটি মেয়ে। মাঝে নাসির দু'বছরের জন্য ট্রেনিং নিতে আমেরিকা গিয়েছিল। আমিও সঙ্গে ছিলাম। আমাকে চাকুরিটা ছাড়তে হয়েছিল কারণ ওর ছিল বদলির চাকুরি। এক সময় কুমিল্লাতেও ছিলাম। হাসপাতালটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। নিজে যে ঘরে যে বেডে ছিলাম, হাত বুলিয়ে দেখলাম। সেদিন ছিলাম বন্দি আর আজ স্বাধীন।

একটি মেয়ে তার জীবনের যা কামনা করে তার আমি সব পেয়েছি। তবুও মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা কেমন যেন হাহাকার করে ওঠে কিসের অভাব আমার, আমি কি চাই? হ্যাঁ একটা জিনিস, একটি মুহূর্তের আকাঙ্ক্ষা মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত রয়ে যাবে। এ প্রজন্মের একটি তরুণ অথবা তরুণী এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, বীরাঙ্গনা আমরা তোমাকে প্রণতি করি, হাজার সালাম তোমাকে। তুমি বীর মুক্তিযোদ্ধা, ঐ পতাকায় তোমার অংশ আছে। জাতীয় সংগীতে তোমার কণ্ঠ আছে। এদেশের মাটিতে তোমার অগ্রাধিকার। সেই শুভ মুহূর্তের আশায় বিবেকের জাগরণ মুহূর্তে পথ চেয়ে আমি বেঁচে রইবো।

চা য়

আমার পরিচয় জানতে চান? আমি প্রকৃতপক্ষে একজন বীরাঙ্গনা; শুধু দেহে নয়—মনে, মননে, হৃদয়ে। হাসছেন তো? বীরাঙ্গনার আবার অন্তর, তার আবার মনন? জ্বী, দেহে আপনার সঙ্গে লড়াইতে জিততে পারবো কিনা জানি না তবে আপনি যদি বাঙালি মুসলমান ঘরের পুরুষ হন, আর আপনার বয়স যদি পঞ্চাশ পার হয়ে থাকে তাহলে মনোবলে আপনি আমার চেয়ে নিকৃষ্ট। কারণ একদিন আমি আপনাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম, আপনাদের আপাদমস্তক দৃষ্টিপাত করবার এবং দেহ ভেদ করে অন্তরের পরিচয় পাবার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। এদেশের মায়ের সন্তান যারা ছিল তারা হয় শহীদ, নয়ত গাজী। যুদ্ধকালে যারা খেয়ে পরে সুখে ছিলেন তাদের আমি ঘৃণা করি, আজ এই পঁচিশ বছর পরও থুথু ছিটিয়ে দিই আপনাদের মুখে, সর্বদেহে।

একজন বীরাঙ্গনার এতো অহঙ্কার কিসের? আমি তো বীরাঙ্গনাই ছিলাম। আপনারা বানাতে চেয়েছেন বারাঙ্গনা। তাইতো আপনারাও আমার কাছে কাপুরুষ, লোভী, ক্লীব, ঘৃণিত এবং অপদার্থ জীব। আমি আজও বীরাঙ্গনা, আজও আমি আপনাদের করুণা করবার অধিকার রাখি।

আমার পরিচয়? আমি এই বাংলার একজন গর্বিত নারী, যাকে অরক্ষিত ফেলে রেখে আপনারা প্রাণভয়ে পদ্মা পার হয়েছিলেন। ফিরে এসে গায়ে লেবাস চড়িয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধার। কিন্তু সুযোগ সন্ধানী পুরুষ, অন্তরে ছিলেন রাজাকার, মুখে বলেছেন 'জয়বাংলা', মনে মনে উচ্চারণ করেছেন 'তওবা, তওবা'! নইলে এই যে রক্তবীজের ঝাড় রাজাকার, আলবদর-এরা কি পাকিস্তান বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছে? না, এরাই আপনারা, আপনাদের ভাই-বন্ধুরা, যারা এখন পুত্রের নিহত হবার ভয়ে ভিটামাটি বিক্রি করে দেশ ত্যাগের জন্য মরিয়া হয়েছেন। কিন্তু যাবেন কোথায়? আপনার পেছনে ধাবিত হবে আজ বারোকোটি বঙ্গসন্তান। যাক্ এ সমস্যা আমার নয় আপনার, আপনার স্বগোত্রীয়দের।

আমি শেফা। মা ডাকতেন শেফালী। আব্বা থেকে শুরু করে বাড়ির অন্য সবাই

পাড়া পড়শী সবাই ডাকতো শেফা। অবশ্য স্কুলে আমার একটা পোশাকী নাম ছিল। তবে সেটা এখন বলা যাবে না। তাহলে আবার আপনারা আমাকে ধরে নিয়ে কোন্ গুহায় বা বাংকারে ভরবেন বলতে পারি না। তাই যেটুকু পরিচয় পেয়েছেন তাই যথেষ্ট। আর যারা আমার উপকার করেছিলেন ঘর থেকে বের করে, তারা শেফা নামেই চিনবেন। আমি বড় হয়েছি একটা মফঃস্বল শহরে। অবশ্য তাই বলে সেটা পাড়া গাঁ নয়। জজকোর্ট ছিল, হাসপাতাল ছিল, গোটা সাতেক উচ্চবিদ্যালয় ছিল, তার ভেতর দু'টো মেয়েদের; আর দু'টি ভালো মহিলা কলেজ ছিল, ছিল বড় সরকারি হাসপাতাল, খেলার মাঠ, সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য ক্লাব, ইউরোপীয়ান ক্লাব ইত্যাদি। বাবা ছিলেন আইনবিদ এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

'৬৯-এর আন্দোলনের সময় আমি স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী; মিটিং, মিছিল, পিকেটিং করেই স্কুলের পড়াশুনা চালিয়েছি। মা খুবই বকাবকি করতেন। মেয়েদের এতো ভালো না, এই কথা বহুবার বলেছেন। কিন্তু আমি পিতার আদরিনী কন্যা, আমাকে স্পর্শ করে কার ক্ষমতা! এরই ভেতর বাবা কারারুদ্ধ হলেন।

সরকারের প্রতি ক্ষোভ আমার এতো বেড়ে গেল যে প্রতিহিংসা মেটাবার বাসনায় অবাঙালি দোকান থেকে কিছু কিনতাম না। সুযোগ পেলে ওদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে চড়টা চিমটিটা দিতেও ইতঃস্তত করতাম না। তখন কি জানতাম এ সব ক্ষুদ্র অপকর্মও বিধাতা পুরুষের হিসাবের খাতায় জমা হচ্ছে! যাক্ মাস ছয়েক পর বাবা মুক্তি পেলেন। আমিও ডানা মেলে 'জয় বাংলা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম দেশের কাজে। মিছিলে যাওয়া, সামনে এগিয়ে স্লোগান দেওয়া, লাঠির আঘাতে বাঁহাতখানা জখম করা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার বীরত্বের চিহ্ন।

দ্রুত ঘটনা এগিয়ে চললো। আগরতলা মামলা নস্যাৎ হয়ে গেল। শেখ মুজিব হলেন বঙ্গবন্ধু। ঢাকার খবর শুনলাম। তখনকার রেডিওতে তো কিছু কিছু খবর পাওয়া যেতো। বর্তমানের মতো তার একটা মুখ ছিল না! তাছাড়া অনবরত ঢাকার খবর আসছে লোক মারফৎ, ফোনে, আর আমাদের কর্মকাণ্ড নব নব পথে চালিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর হুকুমে স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালত, সব বন্ধ। আমি আইএসসি পরীক্ষা দেবো। বইপত্র স্পর্শ করি না। কারণ দেশ তো স্বাধীন হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর বই ছুঁতে হবে কিনা আমার জানা ছিল না। আব্বার কোর্ট নেই। দু'বেলা বাইরের ঘরে একশো কাপ চা, ছোটভাইয়ের খেলে বেড়ানো, ছোটবোন মায়ের আঁচল ধরে ঘোরে আর চব্বিশ ঘণ্টা মায়ের বকুনি, বাবা থেকে শুরু করে কাজের মেয়ে নাসিমা পর্যন্ত রেহাই পেতো না। কেমন করে চলে এলো ২৫ শে মার্চ। স্বপ্ন ছিলো দু'একদিনের ভেতর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, আর একি হলো! কার্ফু সব জায়গায়, আমাদের শহরেরও। বাবা, মায়ের জিদে গ্রামে চলে গেলেন

একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আমাকে সঙ্গে নেবার জন্য খুব জিদ করেছিলেন কিন্তু এতো বড় মেয়েকে মা পথে বেরুতে দিলেন না। দিলে হয়তো শহীদ হতে পারতাম, বীরাঙ্গনা হতাম না। দু'টো দিন নিশ্বাস বন্ধ করে কেটে গেল। তারপর মানুষ আতংকগ্রস্ত হলেও চলাফেরা করতে শুরু করলো। কিন্তু টের পাচ্ছিলাম রাতের অন্ধকারে অনেকেই গ্রামমুখী হচ্ছে। এই বন্দিদশা থেকে মুক্ত হবার জন্য মাকে ধরলাম, চলো আমরা চলে যাই। মাও রাজি, কিন্তু আমার ও সতেরো বছর বয়সের ছেলের জন্য চিন্তিত হলেন। ওরা নাকি ছাত্র দেখলেই গুলি করে মারে।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। আমাদের পাশের বাড়িতে এক জজ সাহেব থাকতেন। ওরা যেন একটু অন্যরকম টানে কথা বলতো। ওদের মেয়ে ছিল না। তাই কারও সঙ্গেই আমার তেমন জমানো আলাপ ছিল না। ওদের বড় ছেলে ফারুক আমাদের কলেজে বিএ পড়তো। কেমন যেন গোবেচারা বোকা বোকা গোছের। বাবাকে একদিন বলেছিলাম, জানো বাবা ফারুক কখনও মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। মা বললেন, অমন চমৎকার ছেলে আজকালকার দিনে হয় না। বাবা বললেন, দ্যাখো গিয়ে ছোটবেলায় মাদ্রাসায় পড়েছে। আমাদের সঙ্গে যেসব মাদ্রাসায় পড়া ছেলে কলেজে পড়তো তারাও সোজাসুজি মেয়েদের দিকে তাকাতো না, কিন্তু সুযোগ পেলে ওরাই সব চেয়ে বেশি হ্যাংলার মতো মেয়ে দেখতো। হাসাহাসির ভেতর ফারুকচর্চা শেষ হলো।

বাবা লোকমুখে অবিলম্বে আমাদের গ্রামে যাবার জন্য খবর পাঠালেন। কারণ বাবা অন্য কোথাও চলে যাচ্ছেন। মা যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন। এমন সময় বাবা নেই জেনে ফারুক আমাদের বাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করলো। মা আগে থেকেই ওকে পছন্দ করতেন। ও মাকে না যাবার জন্য খুবই উৎসাহিত করতো। হঠাৎ একদিন আমার ছোট ভাই অদৃশ্য। ১৭/১৮ বছরের ছেলে। ছোট্ট কাগজে মাকে আর আমাকে লিখে গেল, যুদ্ধে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি দেশে চলে যাও। মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, ফারুককে খবর দে। এতোদিন পরিস্থিতি আমাকেও কিছুটা দুর্বল করে ফেলেছে। তবুও মাকে বললাম, সান্টুর যুদ্ধে যাবার কথাটা ওকে বলো না। আমার দিকে মা তাকিয়ে রইলেন। বললাম, ওকে জানি না ভালো করে, এ সব খবর গোপন রাখাই ভালো, আমাদের ক্ষতি হতে পারে। পরদিন আব্বার খোঁজে পুলিশ এলো। অসভ্যের মতো মাকে ধমকাধমকি করলো। ঠিক করলাম মা, আমি আর সোনালি আজ রাতেই দেশে যাবো। কিন্তু হলো না। ঠিক সন্ধ্যায় ফারুক বললো, খালাম্মা চলে যাচ্ছেন। চলুন আমি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি। কেন জানি না অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। কিন্তু মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। দু'খানা বেবীট্যাক্সি ডাকা হলো। আমি মার সঙ্গে উঠতে যাচ্ছিলাম ফারুক আমাকে তারটায়

উঠতে ইঙ্গিত করলো। মা আর সোনালি সামনেরটায় উঠলেন। কিছুদূর যাবার পর আমাদের ট্যাক্সি সোজা স্টেশনের পথে না গিয়ে বাঁ দিয়ে সেনানিবাসের পথ ধরলো। আমি বললাম, ওকি? এ পথে কেন? ফারুক ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললো, ও দিকে ছেলেরা ব্যারিকেড দিয়েছে। বললাম, তাহলে মা আর ওরাও ঘুরে আসতো। আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। চিৎকার করে বললাম, এই বেবী থামো। না, সে তার গতি বাড়িয়ে দিলো। আমি লাফ দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওই শয়তানের সঙ্গে গায়ের শক্তিতে না পেরে ওর হাতে আমার সব কটা দাঁত বসিয়ে দিলাম। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো পশুটা। তারপর বেবীট্যাক্সি থামিয়ে ওই জানোয়ারটা তার গামছা দিয়ে কষে আমার মুখ বাঁধলো। তারপর সোজা সেনানিবাস। আমি বন্দি হলাম। ফারুক আমাকে উপহার দিয়ে এলো। ফারুক এখন জজ সাহেব। আর কখনো হাফ হাতা শার্ট পরে না। কেউ হাতের দাগ দেখে ফেললে বলে মুক্তিযুদ্ধে আহত হয়েছিল বেয়োনেট চার্জে। দেখুন তাহলে এ দেশে মুক্তিযোদ্ধা কারা!

আমাকে বসতে দেওয়া হলো। চা দেওয়া হলো, আমি কোনও কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে অকপটে ফারুকের কাহিনী বর্ণনা করলাম। মা আর সোনালির কথা উল্লেখ করলাম না। যদি তাদেরও ধরে আনে। ভদ্রলোক মৃদুহাস্যে সব শুনলেন। তারপর পাশের ঘরে নিয়ে খাঁটি পাকিস্তানি মুসলমানি হুইস্কি পান করতে লাগলেন। আমাকেও অনেকবার সাধলেন। পাকিস্তানের গল্প করলেন। আমি কখনও গেছি কিনা। যাই নি শুনে আমাকে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। করাচির বর্ণনা করলেন। করাচির সীবীচ কতো সুন্দর তাও বললেন। তারপর নেশাটা জমে উঠলে চট করে একটানে আমাকে বিবস্ত্র করলেন। এলেন না কেউই রক্ষায়। প্রাণপণে চিৎকার করলাম। বাঘের থাবার মতো একটা মুখ চেপে ধরলো। বিবাহের প্রথম মধু যামিনী যখন শেষ হলো তখন আমার জ্ঞান নেই। চোখে মুখে রোদ লাগলো যখন চোখ খুলে দেখি একজন আয়া মতো মহিলা দাঁড়িয়ে। আমাকে গোসলখানা দেখিয়ে নিয়ে নাশতা আনছে বলে চলে গেল। উঠে গোসলখানায় ঢুকলাম। মনে হয় উচ্চ পদের কেউ ব্যবহার করেন। আঙুলে করে দাঁত মাজতে গিয়ে দেখি দাঁতে অসহ্য ব্যথা। শয়তানটাকে কামড়ে ধরার জন্যে। সরে গেলাম আয়নার কাছে। সারা মুখ আমার নখের আঁচড়ে অদ্ভুত এক রূপ নিয়েছে। আমার রূপের খ্যাতি ছিল। গায়ের রং-এর জন্য মা নাম রেখেছিলেন শেফালী। হঠাৎ করে কাপড় খুলে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেহটাকে ধোয়া দরকার। আমার অন্তর জানে সেখানে কোনও মালিন্যের ছাপ পড়ে নি। আমি চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ নিজের দিকে। কালকের আমি আর আজকের আমিতে আসমান-জমিন ফারাক। শেফা মরে গেছে, আর শেফালী আজ নীল অপরাজিতা। দেহের বর্ণ ম্লান। কিন্তু যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে, অন্তর থাকবে

শুভ্র পবিত্র অম্লান। দরজায় চা নাশতা দিয়ে গেল সেই মহিলা। স্বাভাবিকভাবে খেতে পারলাম না। সমস্ত শরীরে দুঃসহ ব্যথা। কাগজ কলম চাইলাম। দিলো না। কথার উত্তরও দিলো না মেয়ে লোকটা। কিছুক্ষণ পরে দোপাট্টাহীন একটা সালোয়ার কামিজ দিয়ে গেল। আমার ছেড়ে দেওয়া সেই শাড়ি আমি আর দেখি নি।

পরের রাতে এলেন আরেকজন। গল্প করলেন। আমি ইংরেজি জানি দেখে খুব খুশি হলেন। কিছু শায়ের শোনালেন। কাংস্য বিনিন্দিত কণ্ঠে দু'এক কলি গজল পেশ করলেন। তারপর যথাকর্তব্য করে গেলেন। রাতের খাবার মুখে রুচলো না। ডাল-রুটি পড়ে রইলো। বুঝলাম প্রতিদিন নতুন নতুন অতিথির মনোরঞ্জন করতে হবে। এই কি দোজখ? না, দোজখ দেখার তখনও অনেক বাকি। বদলি হতে লাগলাম এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। কখনও এক দল মেয়ের সঙ্গে, নানা বয়সী নানা রুচির, আবার কখনও একা নিঃসঙ্গ নিশ্ছিদ্র কক্ষে, যেখানে রাত দিন বোঝা দুষ্কর। দিন চললো, কখনও কখনও জমাদারণীকে ধরে মাসের খবর জানতাম, কখনও তারিখ। একা কখনও ভাবতাম বাবা নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন। সান্টু কি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে পেরেছিলো? ও কি কখনও মার কাছে আসতে পেরেছিল? মা আর সোনালি বেঁচে গেছে। ওরা নিশ্চয়ই গ্রামে আছে। ভাবছে আমি ফারুকের সঙ্গে পালিয়ে গেছি। আমাদের গোপনে বোধ হয় একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তা কি করে হবে? তারা তো জানতো আমি ওকে কোনও দিনই পছন্দ করতাম না।

চারদিক থেকে প্রায় রাত্রেই গোলাগুলির শব্দ আসে। ভাবি কোথায় এ যুদ্ধক্ষেত্র? কারা এ লড়াই করছে। এখানেও মত্ত অবস্থায় প্রণয়ী বলে 'শালা মুক্তি-শা-লাকে বহিন' বলে আমার ওপর অকথ্য কিছু গালি বর্ষণ করে। মাঝে মাঝে জমাদারণী, পাহারাদার ফিস ফিস করে কথা বলে। কান খাড়া করে শুনি। খুউব যুদ্ধ হচ্ছে। এরা হেরে গেলে তো মুক্তিরা আমাদের কুকুর দিয়ে খাওয়াবে। শেফার মগ্নচৈতন্য জেগে ওঠে। তাহলে মুক্তিদের জয়লাভের সম্ভাবনার কথা এরাও ভাবছে। আল্লাহ্ তুমি আলো দেখাও, আমার সান্টু যেন বেঁচে থাকে। আব্বা যেন ফিরে আসেন। মা সোনালি... হঠাৎ কয়েক ফোঁটা পানি শেফার গাল বেয়ে নামে। কি সব ভাবছে সে। সেই দিনই হঠাৎ ওদের পাঁচ-ছয়জনকে ট্রাকে তুলে নিয়ে গেল। শেফা ভাবলো মারতে নিয়ে যাচ্ছে। শেফার জীবন সম্পর্কে আর কোনও মায়া বা মোহ নেই এ দেহের খাঁচাটা থেকে মুক্তি পেলেই সে বেঁচে যাবে। কিন্তু তার যে বড় আশা একবার শুনে যাবে দেশ স্বাধীন হয়েছে, একবার প্রাণভরে শুনবে 'জয় বাংলা'। পর্দা বাঁধা ট্রাক তবুও শীত করছে। দু'জন সেপাই কম্বল ফেলে দিলো ওদের গায়ের ওপর। ট্রাক চলছে তো চলছেই। ট্রাকের আলোও মাঝে মাঝে ড্রাইভার নিভিয়ে ফেলেছে। মনে হয় শেফা ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটা অন্ধকার জায়গায় থামলো অবশেষে ট্রাকটা। কে

একজন ভারি গলায় হুকুম দিলো, ব্যাংকার মে লে যাও। যাও জলদি যাও। তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো একটা সুড়ঙ্গে ঢুকলাম। এটাই তাহলে ব্যাংকার। ভেতরে ত্রিপলের ম্যাট্রেস। দু'একটা খাটিয়া আছে। পানির কলসী, গেলাস। কিছু স্তূপাকৃত কম্বল। শেফা ভাবলো তাহলে কি জ্যান্ত কবর দেবে এখানে? দিতেও পারে। পরে শুনেছে ওরা অনেককে জ্যান্ত কবর দিয়েছিল। পানির কলসী আর গ্লাস দেখে বুঝলো, না, ওদের বাঁচিয়ে রাখা হবে নইলে পানি কার জন্য। এরপর সময়টা শেফা স্মরণ করতে পারে না। বোধ হয় চায়ও না। সে কি যন্ত্রণা। কোনও দিন খাবার আসতো, কোনো দিন না। অনেক সময় পানিও থাকতো না। হঠাৎ করে একদিন এসে সবার জামা কাপড়, যদিও সেগুলো শতচ্ছিন্ন এবং ময়লায় গায়ের সঙ্গে এঁটে গিয়েছিলো তা টেনে হেঁচড়ে খুলে নিয়ে গেল। সম্পূর্ণ নগ্ন আমরা। কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছি না। দিনের বেলা ব্যাংকারে ঢোকার পথ দিয়ে কিছুটা আলো আসে। আমার মনে পড়ে তখন শীতের দিন ছিল। অপর্যাপ্ত কম্বল থাকায় এক কম্বলের নিচে দু'তিন জন জড়োসড়ো হয়ে থাকতাম। কিন্তু রাতের সাথীরা যেন এখন বন্যপশুর মতো আচরণ করছে। অবশ্য অনেক সময় রোজ তারা আসেও না।

বুঝতে পারে শেফা, কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ মনে হলো দূর থেকে তার সেই চিরকাঙ্ক্ষিত ধ্বনি, 'জয় বাংলা' শুনতে পাচ্ছে। বিশ্বাস হয় না শেফার। আগেও কয়েকবার এমন ধ্বনি তার কানে এসেছে। কিন্তু পরে দেখেছে ওটা মনের ভ্রান্তি। কিন্তু কি হচ্ছে, দুপদাপ শব্দে কারা যেন দৌড়োচ্ছে। তবে কি পাকিস্তানিরা পালাচ্ছে। বাংকারের মুখ দিয়ে এখন যথেষ্ট আলো আসছে। 'জয় বাংলা' ধ্বনি আরও জোরদার হচ্ছে। শেফার মনে হলো সান্টু তাকে নিতে আসছে। কিন্তু বাংকারের মুখের কাছে যাবে কি করে; ওরা যে উলঙ্গ।

হঠাৎ অনেক লোকের আনাগোনা, চেঁচামেচি কানে এলো। একজন বাংকারের মুখে উঁকি দিয়ে চিৎকার করলো, কই হ্যায়; ইধার আও। মনে হলো আমরা সব এক সঙ্গে কেঁদে উঠলাম। ঐ ভাষাটা আমাদের নতুন করে আতঙ্কগ্রস্ত করলো। কয়েকজনের মিলিত কণ্ঠ, এবারে মা, আপনারা বাইরে আসুন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা আপনাদের নিতে এসেছি। চিরকালের সাহসী আমি উঠলাম। কিন্তু এতো লোকের সামনে আমি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, উলঙ্গ। দৌড়ে আবার বাংকারে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যে বলিষ্ঠ কণ্ঠ প্রথম আওয়াজ দিয়েছিলো, কোই হ্যায়, সেই বিশাল পুরুষ আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে নিজের মাথার পাগড়িটা খুলে আমাকে যতোটুকু সম্ভব আবৃত করলেন। ভেতরে আরও ছয়জন আছে বলায় আশপাশ থেকে কিছু লুঙ্গী, শার্ট যোগাড় করে ওরা একে একে বেরিয়ে এলো এবং ওদের কোনো রকমে ঢাকা হলো। আমি ওই শিখ অধিনায়ককে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠলাম।

ভদ্রলোক আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'রো মাৎ মায়ি।' আমাদের একটা জিপে তুলে নিয়ে যেখানে আনা হলো তা একটা হাসপাতাল। আমাদের গায়ে ঘা, চামড়ায় গুড়ি গুড়ি উকুন। মানুষের মাথায় উকুন হয় জানতাম, গায়ে হয় জানতাম না। একে একে ওয়ার্ড মেইডরা এসে আমাদের গরমপানি সাবানে স্নান করালো। আমার মাথার চুলগুলো কেটে দিতে বললাম। মেয়েটি প্রায় আমার বয়সী, খুব সহানুভূতির গলায় বললো, এতো সুন্দর চুল কাটবে কেন দিদি? দু'তিন দিন পর পর শ্যাম্পু করে আমিই জট ছাড়িয়ে দেবো। ধুলো বালি মাথায় ভর্তি তো তাই এমন হয়েছে। অবাক হলাম। এমন সহানুভূতির সুরেও মানুষ কথা বলে? ভাবলাম তাইতো আমি তো বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে বনে ছিলাম। সভ্য মানুষের ভাষা ভুলে গেছি। প্রাথমিক চিকিৎসা নার্সই দিলো। তৃতীয় দিনে ডাক্তার দেখলেন, আমি নিজেই বললাম, ডক্টর আমি বোধ হয় অন্তঃসত্ত্বা ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি ওর হাত দুটো ধরে কেঁদে ফেল্লাম, আমাকে বাঁচান। আমি এ পশুর বীজ দেহে রাখতে চাই না। ডাক্তার গম্ভীর কিন্তু কণ্ঠে সহানুভূতি, না না আপনার কোনও ভয়ের কারণ নেই, প্রাথমিক অবস্থা, আমরাই ব্যবস্থা করে দেবো।

দিন দশেকের ভেতর আমি পাপমুক্ত হলাম। শেফা বেঁচে উঠলো, জেগে উঠলো। এবার কবে যাবো আমরা? দেরি হলো না। মাসখানেকের ভেতর আমরা সুস্থ হয়ে ঢাকায় এলাম। অনেকের দেহেই অনেক ব্যাধি প্রবেশ করেছে। তাদের সব আলাদা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। ঢাকায় আমি এলাম ধানমন্ডিতে একটা বাড়িতে, নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে। আমার মতো হতভাগিনীদের প্রাথমিক অবস্থায় এখানেই আনা হতো। তারপর খোঁজ খবর করে আত্মীয় স্বজন পেলে তারা কেউ আপনজনের কাছে চলে যেতো আর কেউবা সরকারের আশ্রিত হিসাবে ওখানেই থাকতো। আমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বাবাকে চিঠি লেখা হলো। বাবা পাগলের মতো ছুটে এলেন। সঙ্গে মা আর সোনালি। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আমাদের বিরামহীন কান্না শুরু হলো। সান্টু ভালো আছে তবে এখনও স্থির হয়ে ঘরে থাকে না। আব্বা বললেন, কলেজ খুললে উন্মাদনা কমলে আপনিই ঠিক হয়ে যাবে, ওর জন্যে ভাবি না। চিন্তা ছিল তোর জন্যে, তোকে পাবো ভাবি নি। ওখানকার অফিসারকে বলে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে এলাম। একটা হোটেলে পেট ভরে খেলাম।

বাবা বললেন, চলো মা আজ রাতের ট্রেনেই ফিরে যাই। আমি তো এক পায়ে খাড়া। সংসদ ভবনের কাছে লেকের পাড়ে বসে আমার কাহিনী শোনালাম। ওরা হাঁপুস নয়নে কাঁদছেন আর সোনালি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছে। ফিরে এলাম পুনর্বাসন কেন্দ্রে। কিন্তু ডাক্তার বাবাকে ডেকে কি যেন বললেন। বাবা রাজি হলেন।

আমার একটা চিকিৎসা চলছে। আরও মাসখানেক লাগবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে। বাবা কি বাড়িতে আমাকে নিয়ে চিকিৎসা করাবেন, না এখানে থেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি যাবো। আমি জিনিসটা বুঝলাম। বাবাকে বোঝালাম, বাবা এরা আমার অনেক যত্ন করেন। এই বিদেশী ডাক্তাররা দিন-রাত আমাদের কতো যত্ন করছেন। দশ মাস গেছে বাবা আর একটা মাস থাকি। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েই যাবো। মা চোখের জল মুছলেও শেষ পর্যন্ত হাসি মুখে ফিরলেন। বাবাকে বললাম, সান্টুর দিকে লক্ষ্য রেখো ও যেন বাউণ্ডুলে না হয়ে যায়।

ওরা চোখের বাইরে চলে গেলে শেফা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। মনে হলো সে আর কোনো দিন ওই পরিবারে ফিরে যাবে না। গেলেও সে অস্পৃশ্য হয়ে রইবে। দস্যুরা তার এতো বড় ক্ষতি করে গেল! অবশ্য ডাক্তাররা বলেছেন গুরুতর কিছু হয় নি। মাস খানেক নিয়মিত চিকিৎসা করলেই সে তার সম্পূর্ণ সুস্থ জীবন ফিরে পাবে। ভয়ের কোনও কারণ নেই।

শেফাদের বাড়ির কাছে একটা টাইপ শিখবার স্কুল ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর কোনও কাজ হাতে ছিল না, শেফা ভর্তি হয়ে গেল ওখানে। ফলাফল বেরুবার পরও কলেজে ভর্তি হওয়া, ক্লাশ শুরু করতে আরও মাস তিনেক গেল। ছ'মাস একটানা সেখানে নিয়মিত টাইপ শিখেছে। পরে সে আব্বাকে সার্ভিস দিতো এবং দু'দশ টাকা রোজগারও করতো। আব্বাকে অনেক আর্জি লিখতে হতো, বাইরে থেকে ভুল ভালো টাইপ করিয়ে আনতো বাবার কেরানী। বাবা রেগে যেতেন। পরে এ কাজটা শেফাই করতো।

তেমনি এখনও হাতে কোনো কাজ নেই। ওসব সেলাই এমব্রয়ডারী শিখতে ওর ভালো লাগে না। একদিন ও চুপি চুপি চেয়ারম্যান সাহেবের ঘরে ঢুকলো। কতোদিন ভেবেছে মোশফেকা আপাকে বলবে, কিন্তু ওকে তার বড় ভয়। উনি কখনও তাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলেন না। অথচ বাসন্তী আপা, পরে জেনেছি উনি শহীদ ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার স্ত্রী, একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা, নীলিমা আপা প্রায়ই এসে আমাদের সঙ্গে নানা গল্প করতেন। বাবা-মার কথা, নিজেদের এলাকার কথা, ভবিষ্যতে কি করতে চাই এসব কথা, কিন্তু দু'জনেই ভুলেও কখনও আমাদের দুঃখ আর নির্যাতনময় জীবনটার কথা তুলতেন না। তবুও আমি নীলিমা আপার কাছে অনেক কথা বলেছিলাম। এমনকি ফারুক ও তার বাবার পরিচয়ও দিয়েছিলাম। কিন্তু উনি চেষ্টা করেও কিছু করতে পারে নি। ফারুকরা নাকি একজন ক্ষমতাশালী মন্ত্রীর আত্মীয়। তবুও সান্ত্বনা দিতেন, মন খারাপ করো না। আজ না হোক কাল ওর বিধান হবে। আল্লাহ্ এতো নিষ্ঠুর নন।

চেয়ারম্যান সাহেবকে সালাম দিয়ে দাঁড়াতেই উনি খুব মিষ্টিভাবে বললেন, কি

চাও? আমাকে কিছু বলবে? মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ। বললেন, বলো। বললাম, স্যার আমি মোটামুটি টাইপ জানি। আপনার এখানে কাজ করতে চাই। আমার বসে থাকতে ভালো লাগে না। উনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। কতোদূর পড়াশুনা করেছি ইত্যাদি বলে মোশফেকা আপাকে ডেকে পাঠালেন। মোশফেকা আপা খুশি হয়ে বললেন, স্যার কাজ দিয়ে দেখি কেমন করে, তারপর বেতন... আমি কথা শেষ করতে দিলাম না। বললাম, না। আমি বেতন চাই না। দু'জনেই হাসলেন। চেয়ারম্যান সাহেব শুনেছি হাইকোর্টের একজন জজ। পরে অবশ্য নাম জেনেছি। বিচারপতি কাজী সোবহান।

পরদিন সকাল আটটা থেকে আমার কাজ শুরু হয়ে গেল। কাজ দেখে দু'জনেই খুশি। মাঝে মাঝে বাসন্তী আপা আমার মেশিনটায় বসতেন। ওঁর স্পিড খুব ভালো ছিল। আমাকে এটা ওটা নির্দেশ দিতেন। আমার সময়টা খুব ভালো যাচ্ছিলো। মনে হতো আমি কলেজেই আছি। অতীত যেন একটা সাময়িক দুঃস্বপ্ন। হঠাৎ একদিন ডাক্তার বললেন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারি। অফিস থেকে বাবাকে চিঠি লিখেছিলাম। তৃতীয় দিনেই বাবা এসে হাজির। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আমাকে নিয়ে এলেন একটা বেবীট্যাক্সিতে। প্রথম ধাক্কা খেলাম ওখানেই। বেবীট্যাক্সিওয়ালা বছর ত্রিশের এক যুবক। আব্বাকে জিজ্ঞেস করলো, স্যার আপনের মাইয়া? অন্যমনস্কভাবে সংক্ষিপ্ত জবাবে বললেন, হুঁ। তারপরই এলো একেবারে বিকট বোমা। ও বীরাঙ্গনা বুঝি; আঃ হাঃ হালারা এক্কেরে জানোয়ার। কি যে কইরা গেছে। ও বলে চললো আমি আর আব্বা পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলাম। সম্ভবত বেবীওয়ালা ও পাড়ায় পরিচিত এবং ও বাড়িতে কারা থাকে জানে। সোজা কমলাপুর স্টেশনে। তারপর ট্রেনে। এতোক্ষণ আব্বা কোনও কথা বলেন নি। ট্রেন ছাড়লে যেন তার মোহগ্রস্ত ভাবটা কাটলো। বললেন, আহা, খেয়ালই ছিল না, তোর নিশ্চয়ই খুব খিদে লেগেছে। দেখি পরের স্টেশনেই তোকে কিছু কিনে দেবো। আমি না না বলে মাথা ঝাঁকাতেই কেঁদে ফেললাম। আব্বা আমার মাথাটা বুকের ভেতর নিয়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বিড় বিড় করে কি যেন বললেন। মনে হলো ক্রমাগত বলছেন, ওটা একটা দুঃস্বপ্ন। কিছু হয় নি, সব ঠিক হয়ে যাবে। বিকেল নাগাদ আমরা বাড়ি পৌঁছোলাম। সোনালি দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ভাইয়া এগিয়ে এসে আমার হাতটা খুব শক্ত করে ধরলো। বললো, আপা কিছু ভাবিস না। আমি এখন বড়ো হয়ে গেছি, কোনও চিন্তা করিস না। হেসে বললাম, তোর হাতটা কিন্তু খুব শক্ত হয়ে গেছে। ও শিশুর মতো জোরে হেসে উঠলো। আরে একি যে সে হাত, স্টেনগান ধরা হাত। মুক্তিযোদ্ধার হাত। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললো, অবশ্য আমার গৌরব করবার মতো কিছু নেই। নিজের বোনকেই

হায়েনাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারি নি। আমি হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরলাম। দেখলাম পুরোনো কাজের লোক দু'জন নেই। সম্ভবত আমার কারণেই ওদের বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। আমি কাপড় জামা ছাড়তে গিয়ে দেখি এ দশ মাসে সোনালি অনেক বড় হয়ে গেছে। সুন্দর করে, যেমন আমি করতাম ঘর গুছিয়ে রেখেছে, এমনকি আমি এসেই পরবো ভেবে ওর পছন্দ করা শাড়ি, ব্লাউজও বের করে রেখেছে। ও অবশ্য এখনও শাড়ি পরে না। তবে সালোয়ার কামিজ দেখলাম না, পরে আছে স্কার্ট, ব্লাউজ। ওর ছোট মনের প্রতিরোধের বহিঃপ্রকাশ সম্ভবত এই বেশ পরিবর্তন।

খাবার গুছিয়ে মা তাকালেন। কতোদিন, কতোদিন পর আবার ওরা একসঙ্গে খেতে বসেছে। মা এটা ওটা শেফার পাতে তুলে দিচ্ছেন। শেফা হেসে বললো, আমি কি মেহমান নাকি? এমন করে আমাকে তুলে দিচ্ছ কেন? মা হঠাৎ মুখে আঁচল তুলে দিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন। সবার হাত থেমে গেল। আব্বা হেসে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে, দু'চার দিন একটু কষ্টতো সবারই হবে। একটা বড় অসুখ থেকে উঠলেও তো পরিবারে একটা বিপর্যয় আসে, আসে না? এবার সোনালি ফোঁড়ন কাটে। চিৎকার করে বলে, আম্মা আমরা টেবিল ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমার সব খাবার পড়ে রইলো। সোনালি বেশ পাকা হয়ে উঠেছে। ওর ধমকে কাজ হলো। মা মুখ মুছে নিজের জায়গায় বসলেন। হাসি গল্পে খাওয়া শেষ হলো। মনে হলো যেন ঈদের সকাল। রাতে শুয়ে শুয়ে দু'জনে কত গল্প। শেফাকে না দেখে মা নাকি বিশেষ চিন্তিত হন নি। সোনালিকে বলেছিলো দেখিস, আমরা বাড়ি পৌঁছোবার পর ওরা এসে হাজির হবে। চারদিকের গোলমাল দেখে ফারুক ভয় পেয়েছে। ও সম্ভবত কাজী অফিসে গেছে। শেফাকে বিয়ে করেই ফিরবে। ওর বাবা যে মেজাজী, জানতে পারলে ছেলেকে আস্ত রাখবে না। কিন্তু রাত গেল দিন এলো, দিনের পর দিন গেল। মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। আব্বা চলে যাবার জন্য খবর পাঠালেন কিন্তু তোমাকে ফেলে আমরা যাবো কি করে? আব্বাকেই-বা মা কি জবাব দেবেন। বাড়ির লোকদের বলেছেন সামনে ওর পরীক্ষা তাই আব্বার এক বন্ধুর বাড়িতে ওকে রেখে এসেছেন। কিন্তু দুঃসংবাদ চাপা থাকে না। গ্রামে খবর পৌঁছোলো শেফাকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে গেছে। মা শেষ পর্যন্ত ছোট খালার শ্বশুর বাড়ি গেলেন। ভাইয়ারও কোন খবর নেই। শেফাকে ওরা নিশ্চয়ই মেরে ফেলেছে। শুধু আব্বা ভালো আছেন। এটুকুই আমার সান্ত্বনা ছিল। তবে মা যতোটা ভেঙে পড়বেন ভেবেছিলাম, মা কিন্তু পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন বেশ শক্তভাবেই। কখনও কাঁদতেন না, আর আমার নাম ভুলেও উচ্চারণ করতেন না। কথা বলাই কমিয়ে দিয়েছিলেন। সকালে অনেকক্ষণ কোরান তেলাওয়াত করতেন। নফল নামাজও বেড়ে গেল। মনে হতো আম্মা সব

আশা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌কে দু'হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরেছেন। এমনিভাবেই দীর্ঘ ন'মাস কেটে গেল। যুদ্ধ শেষ হলো। আব্বা ফিরে এলেন খুশি মনে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভাইয়ার সঙ্গে ওখানেই দেখা হয়েছিল। ছেলে মুক্তিযোদ্ধা এটাও তাঁর একটা বড় গর্ব। ফিরে এসে আম্মাকে দেখেই আব্বা আঘাত পেলেন। একি শেফার আম্মা, কি হয়েছে তোমার? অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি? তারপর মা চোখের জলে আব্বাকে সব বললেন। কিছুক্ষণ কঠিন শিলার মতো স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললেন, চলো, আজই বাড়ি ফিরে যাবো। আমরা শহরের বাড়িতে ফিরে এসে দেখি বাড়ির জানালা দরজা ছাড়া আর কিছু নেই। ফার্নিচার, বইপত্র এমন কি ইলেকট্রিকের তারগুলোও পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে দস্যুরা। না পাকিস্তানিরা এসব করে নি, করেছে পাড়ার লোকেরা। কেউ কেউ ভালো মানুষ হয়ে এটা ওটা, যেমন টেলিফোনটা ফেরত দিয়ে গেলেন। আব্বাকে বললেন, লুটপাট দেখে আমি এটাকে যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। ভাইয়া তখনও এসে পৌঁছোয়নি। কিন্তু আব্বার শরীরে যেন হাতির বল এলো। লোকদের ডেকে '২/৩ দিনের ভেতর মোটামুটি বাড়ি বাসযোগ্য হলো। আব্বা আম্মাকে বললেন, এবার তোমরা নিরাপদে থাকো আমি শেফার খোঁজে ঢাকায় যাবো। কিন্তু ভাইয়া না ফেরা পর্যন্ত আম্মা আব্বাকে আটকে রাখলেন। তার মুখে একটাই কথা, যা হবার তাতো হয়েছে। মেয়ে যদি বেঁচে থাকে ফিরে পাবো। কিন্তু তোমাকে হারাতে পারবো না।

দিন পনেরো পর ফিরে এলো ভাইয়া, যেন একটা বেবুন। মুখ ভর্তি দাড়ি, গোফ, মাথায় বড় চুল। কিছুতেই সে এগুলো ফেলছে না। বাবা নিজে সেলুনে গিয়ে ওকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে আনলেন। বললেন, দুঃখের দিন পার হয়ে গেছে। এবার মানুষের মতো বাঁচার সংগ্রাম করো। বইপত্র তো সব গেছে। যা পারো যোগাড় করে পড়াশুনায় মন দাও। শেফার জন্য কেউ মন খারাপ করো না। ও আমার মেয়ে, ওকে আমরা খুঁজে পাবোই। আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র রহম আছে। এমন সময় নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে আমার খবরসহ চিঠি এলো। আব্বার সে কি আনন্দ আর উত্তেজনা। যাবার আগে আমার পছন্দের মাছ পর্যন্ত মাকে কিনে দিয়ে গেলেন। ভাইয়া সঙ্গে যাবে জিদ ধরলো কিন্তু আব্বা নিলেন না। বললেন, মা বোনকে দেখো। বিপদ আমাদের এখনো কাটে নি। আব্বা চলে গেলেন। কিন্তু যখন একা ফিরে এলেন, আপা বিশ্বাস করবি না, রাত্রিতে মহরমের মাতম। বাবার মুখ থেকে কিছু শুনবার জন্যও আমরা অপেক্ষা করলাম না। ধরে নিলাম তুই-তুই মরে-হেসে বললাম, সোনা, আমি তো সত্যি অর্থেই মরে গেছি। ও লাফ দিয়ে উঠে আমার মুখ চেপে ধরলো তারপর আমার বুকে মাথা রেখে সে কি আর্তনাদ। মনে হলো এই দশ মাসের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাই সব উজাড় করে ঢেলে দিলো। সকালে চোখে মুখে রোদ

লাগায় উঠে বসলাম। সোনালি তখনও ঘুমুচ্ছে। চোখের কোণে তখনও এক ফোঁটা পানি জমে আছে। আস্তে আস্তে আমরা স্বাভাবিক হতে শুরু করলাম। একদিন ভাইয়াকে বললাম, কলেজে যাবো। ও বারণ করলো। বললো, আপু আরও কটা দিন যাক। তোকে কেউ যদি অপমান করে আমি তো খুনাখুনি করে ফেলবো। অপমান করবে কেন? কি করেছি আমি? আমার কণ্ঠে বিস্ময়। ভাইয়া উত্তর দিলো, কিছু করলে তো তোকে দোষ দেওয়া যেতো। আমরা তোদের রক্ষা করতে পারি নি সেই লজ্জা আর দুর্বলতাকে চাপা দেবার জন্য তোদের ওপর অত্যাচার করতে পারি। তুই বুঝিস না আপু। মুক্তিযুদ্ধ এতো রক্ত নিয়েছে। কিন্তু আমাদের নোংরা স্বভাবটা ধুয়ে মুছে দিতে পারে নি। যত্তোসব রাজাকারের বাচ্চা। তবুও সাহস করে গেলাম কলেজে। ছেলে মেয়ে অনেকেই দৌড়ে এলো, কোথায় ছিলাম, কেমন ছিলাম। এখানে সবাই বলছে তোকে পাকআর্মি ধরে নিয়ে গেছে। যাক বাবা বেঁচে গেছিস। আর্মি ধরলে কি হতো বলতো? সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। না, সত্যি কথা এদের সামনে বলা যাবে না। কিন্তু আমি এ মিথ্যার বোঝা কেমন করে বয়ে বেড়াবো? এ মুখোশ কি সারাজীবন মুখে এঁটে থাকবো? ভাবলাম, আমাদের ঘরে পরিবর্তন না হলেও আমাদের চার দেওয়ালের বাইরের জগতটা অনেক উল্টে-পাল্টে গেছে। না শেফা আর বাইরে যেতে চায় না। দেখা যাক ওরা কতো দিন এসব নিয়ে নোংরামি করতে পারে।

এর ভেতর একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি এলো। ছোট চাচার শালীর বিয়ে। বিয়েতে সব আত্মীয়ই নিমন্ত্রিত হয়েছেন। কিন্তু আমরা হই নি। চাচার কানে কথাটা গেছে। চাচা এসে আম্মাকে জিজ্ঞেস করে গেলেন। তারপর কিছু না বলে চাচীকে তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে গেছেন। এই বিয়েতে শুধু নিজে যান নি তাই নয়, চাচি ও তাঁর দু'ছেলে-মেয়েকেও যেতে দেন নি। চাচার শ্বশুর এসে আব্বার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। মেয়ের বিয়ে নানাজনে নানা কানা ঘুষা করছিল বলে উনি আমাদের দাওয়াত দিতে সাহস পান নি। এজন্য চাচা নাকি ওকে যথেষ্ট অপমান করেছে। বাবা বললেন, শেফা ওর ভাইয়ের মেয়ে তার সম্পর্কে কুৎসা করলে ওর তো লাগবেই। কিন্তু আমার কাছে আগে আসেন নি কেন, তাহলে তো আপনার মেয়ের বিয়েতে যেতে পারতো। চাচার আরও রাগ ছিল। চাচা ইন্ডিয়া চলে গিয়েছিলেন। চাচি তার বাবার কাছে থাকতে চেয়েছিল, তার বাবা আশ্রয় দেন নি। চাচি শেষ পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে খালার বাড়িতে ছিলেন। চাচা অসম্ভব গোঁয়ার। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আপাতত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলাম। বুঝলাম এমনি করে একটার পর একটা ঝড় ঝাপ্টা আসবে, আমার জন্য আব্বা যন্ত্রণাকাতর হবেন। তার চেয়ে আমি যদি ঢাকা গিয়ে একটা কাজ দেখে নিই তাহলে বিএ পরীক্ষাটাও দেওয়া হয়ে যাবে,

কিছুদিনের জন্য আব্বাও একটু স্বস্তিবোধ করবেন।

চিঠি লিখলাম মোশফেকা আপার কাছে, আমি গেলে আমার চাকুরিটা পাবো কিনা। উনি উৎসাহ দিয়ে লিখলেন চাকুরি আরও খালি আছে। আমি বিনা দ্বিধায় ঢাকা আসতে পারি। আমি সব সংকোচ বিসর্জন দিয়ে আব্বার সঙ্গে সরাসরি কথা বললাম। সব ব্যাপারে বুঝিয়ে বললাম। আব্বা কোনও প্রতিবাদ করলেন না। এর ভেতর আব্বা আরেকটা আঘাত পেলেন। আব্বা এক বন্ধু এমপি'র কাছে ফারুকের ও তার বাবার অপকীর্তির কথা জানিয়ে কিছু প্রতিকার প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু এমপি সাহেব অপারগ, কারণ ফারুকরা একজন বড় নেতার আত্মীয় তাই ওরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আব্বা এই প্রথম দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, শেফার মা, এ বয়সে যুদ্ধে গিয়েছিলাম কেন? এই দেখো ক্রল করে করে আমার কনুইতে কেমন ছাল উঠে চামড়া শক্ত হয়ে গেছে। আমরা সবাই কেঁপে উঠলাম। আব্বা তাহলে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করে এসেছেন? আজ তিনিও এত অসহায়! ঠিক করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে যাবেন। কিন্তু আম্মা বাধা দিলেন। বললেন, তাঁর মাথায় রাজ্যের বোঝা, কি হবে আমাদের দুঃখের কথা তাঁকে জানিয়ে? আব্বা বললেন, তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তিনি এর একটা বিহিত করবেনই। আব্বা নাছোড়বান্দা। গেলেন এবং ফারুকের বাবার ডিমোশন করিয়ে এলেন। আব্বার সেকি আনন্দ। মনে হলো এতোদিনে তিনি যুদ্ধ জয় করে এলেন। আমারও কেন জানি না একটা তৃপ্তি এলো। না, বিচার আছে। স্বাধীন বাংলায় মানুষ বিচার পাবে। তবুও আমি চলে গেলাম।

ঢাকায় দেড় হাজার টাকা মাইনের স্টেনো-টাইপিস্টের চাকুরি পেলাম রেডক্রসে। আমার চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা। মা ছাড়া কখনও আমাদের নাম ধরে ডাকে নি। ঠিক আব্বার মতো স্নেহ পেয়েছি সেখানে। ওই বাড়িটাতে অনেক অফিস ছিল। লিফ্‌টে ওঠানামার সময় অনেকের সঙ্গেই দেখা হতো। নিত্য দেখার পরিচয়ে কখনও-বা মৃদু হাসি বিনিময় বা আসসালামু আলাইকুম কিম্বা কেমন আছেন পর্যন্তও হতো। লম্বা সুঠাম দেহের অধিকারী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচয় বাড়তে লাগলো। একদিন দুপুরে লাঞ্চে ডাকলেন পূর্বাণীতে। এর আগে ঢাকায় এতো বড় হোটেলে আমি কখনও খাই নি। নিজেকে বেশ অভিজাত বলে মনে হলো। ধীরেধীরে আমার সব কথাই ভদ্রলোককে বললাম। তিনি শুনে কষ্ট পেলেন। ভদ্রলোক ব্যবসায়ী। বাবা আছেন। আরও দু'ভাই আছেন। একজন ওর বড়, একজন ওর ছোট। বড় ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি ধানমন্ডিতে থাকেন। আর ওঁরা দু'ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে আর একবোন বনানীতে বাবা-মার সঙ্গে থাকেন।

যুদ্ধের সময় তাঁরা তিন ভাই'ই ভারতে চলে গিয়েছিলেন। ছোটভাই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ওরা বিশেষ কিছু করেন নি। বাবা-মা এখানেই ছিলেন।

কয়েকদিন গ্রামে গিয়েছিলেন। ওঁদের কোনো অসুবিধা হয় নি। ব্যবসা-বাণিজ্য সবই বন্ধ ছিল। এখন আবার নতুন করে শুরু করেছেন। তিনভাই ব্যবসায় অংশীদার, তবে পৃথক পৃথক কিছু ব্যক্তিগত ব্যবসা বড় দু'ভাইয়েরই আছে। সেদিন বড়দিন, হঠাৎ ভদ্রলোক, ধরুন 'ইমাম' আমাকে দাওয়াত দিলেন সন্ধ্যায় ইন্টারকন্টিনেন্টালে যেতে। আস্তে আস্তে আমার সাহস আর লোভ দুটোই বেড়ে গেছে। দাওয়াত খাওয়ার পর গল্প করতে করতে তিনি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। লজ্জায়, ভয়ে আমি কুঁকড়ে গেলাম। বার বার প্রশ্ন করায় বললাম, আমার আব্বাকে বলুন। কারণ তার মতোই সবার উপরে। ইমাম বললেন, আগে তোমার মতটা বলো, বলো রাজি। ঘাড় নাড়তেই পকেট থেকে ছোট একটা আংটির বাক্স বের করে আমার হাতে ছোট্ট একটা ডায়মন্ড বসানো আংটি পরিয়ে দিলেন। বেইলী রোডের হোস্টেলে পৌঁছে দেবার সময় ওর উষ্ণ ওষ্ঠ আমার ঘাড় স্পর্শ করলো। আমি হাল্কা পালকের মতো উড়তে উড়তে হোস্টেলে ঢুকলাম। রুমমেট আগেই জানতো আমি কোথায় গেছি। হাতের আংটি দেখে বললো, নিশ্চয়ই সব সেরে এলি, আমাদের করবার জন্যে আর কিছুই রাখলি না। নে মিষ্টি খা। একখানা মিষ্টি দু'জনে ভাগাভাগি করে খেলাম।

আমার রুমমেটের নাম জয়া। ও হিন্দুর মেয়ে। বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ওরও একই অবস্থা। ওকেও বাংকার থেকে বের করে এনেছিল মুক্তিবাহিনী। কিন্তু বাড়ি গিয়ে দেখে সেখানে পড়ে আছে শুধু ছাই। ওদের মেরে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে সব পুড়িয়ে দেয়। ওর মা আর দু'ভাই বেঁচেছিল। ওরা পরে ভারতে চলে গেছে। আর ফিরবে কিনা জানে না। তবে এখন জয়ার সঙ্গে পত্রালাপ হয়। সে তো জানে পারিবারিক জীবনে এ কতো বড় ক্ষত। জয়া বলে আমি জন্ম বিধবা হিসাবে জীবন কাটাবো। কারণ হিন্দু সমাজে আমি ব্যাভিচারিণী, তার উপর আবার মুসলমান দ্বারা ধর্ষিত। ও কিন্তু কথাগুলো বলে হেসে হেসে, মনে হয় যেন দু'চোখ উপচে পড়া জল ও হাসি দিয়ে আটকে রেখেছে। শেফার বুকটা কেঁপে ওঠে। ওদের যদি ও রকম সমাজ হত তাহলে ইমাম কি ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে সাহস পেতো। সারাটা রাত শেফা ঘুমালো না। নানা রকম বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখলো। কেন এমন হলো। আব্বার চিঠি পেলো শেফা, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটি নিয়ে বাড়ি যেতে লিখেছেন আব্বা। শেফার বুকটা কেঁপে উঠলো, কে জানে কোনও আশংকাজনক কিছু হলো নাতো। যে তার কপাল কিছুই বলা যায় না। সোনালি ওকে টেনে নিয়ে বললো, আপু তোর বিয়ে। বাবার কাছে দুলাভাই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলো। বাবা রাজি হয়েছে। এখন তোর সাথে নাকি কি সব কথা বাকি। তাহলেই আর দেরি করা হবে না। দুলাভাইয়ের বাবা ফোনে কথা বলেছেন আব্বার সঙ্গে। আব্বাকে ঢাকা যেতে বলেছেন।

বাবা শেফাকে পরিষ্কারভাবে সব জিজ্ঞেস করলেন। ইমামের চরিত্র সম্পর্কে শেফার কি ধারণা তাকে কতো দিন ধরে চেনে ইত্যাদি। সব শেষে জিজ্ঞেস করলেন সে ইদানিং ডাক্তার দেখিয়েছে কিনা, তার শরীর সুস্থ তো? শেফা ধীর স্থিরভাবে আব্বার সকল প্রশ্নের উত্তর দিলো। মনে হয় আব্বা খুশি হলেন। বিয়ে ঠিক হলো। কিন্তু বিয়ে হবে ঢাকায় ভাড়া বাড়িতে। এ শহরে এখনও আব্বা সাহস পান না। আব্বা মনে হয় নিঃস্ব হয়ে মেয়ের বিয়ে দিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দলের অনেক গন্যমান্য বন্ধুরা এলেন। ইমামের আব্বা-আম্মা আত্মীয়-স্বজন সবাই এলেন। শেফা যা কখনও কল্পনাও করে নি। সেই সৌভাগ্যের ছোঁয়া সে পেলো। ইমাম তাকে স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা সবার উপরে সম্মান দিয়ে রেখেছে। ধর্ষিত শেফার সেটাই সব চেয়ে বড় আনন্দ। ছোট দেওর আমানও খুব হাসি খুশি। ভাবি ভাবি করে তাকে বিব্রত করে রাখে। বড় ভাশুর গম্ভীর মানুষ, জাও কথা কম বলেন। কিন্তু কারও আচরণেই তার কাছে কোনও অবহেলা বা ঘৃণার ছায়া দেখলেন না। শ্বশুর তো মা মা বলে পাগল। এ সুখ কি সে কখনও কল্পনা করেছে। ননদ তো সর্বক্ষণ সঙ্গেই থাকে। ইমাম দ্রুত ব্যবসায়ে উন্নতি করতে লাগলো। অবশ্য পেছনে তার আব্বার সাহায্যও আছে। ও গুলশানে খুব সুবিধায় একটা জমি পেলো। তাই চট করে বাড়িও শুরু করলো। ইমামের আজকাল আসতে বেশ রাত হয়ে যায়। শেফা অনুযোগ করে তারও শরীর ভালো না। ইমাম অবশ্য ঠাণ্ডা মেজাজেই শেফাকে বোঝায় তার কাজ কতো বেড়েছে।

শেফা এক পুত্রসন্তানের মা হলো। বাড়িতে সেকি আনন্দ উৎসব। বড় ভাশুরের দুই মেয়ে তাই এ উৎসব আরও জাঁকজমকপূর্ণ। খুব তাড়াতাড়িই আকিকার ব্যবস্থা হলো। তিন-চার'শ লোক দাওয়াত করলেন শ্বশুর। নাম রাখলেন আরমান। শেফা কিন্তু মনে মনে ওকে আরেক নামে ডাকে আর সোচ্চারে বলে যোগী, কেউ জানে না এ নামের পরিচয়। শুধু শেফা এ নামটা তার হৃদয়ে রক্ত দিয়ে লিখে রেখেছে। শ্বাপদশঙ্কুল অরণ্যে শেফা সেদিন একজন দেবদূত প্রত্যক্ষ করেছিল তার নাম যোগীন্দর সিং, যে তার পবিত্র শিরস্ত্রাণ খুলে শেফার অপবিত্র দেহটাকে সযত্নে ঢেকে দিয়েছিল আর কয়েকবার তাকে মাতৃসম্বোধন করেছিল। তাই তো শেফা মনে মনে যোগীন্দকে তার প্রথম সন্তান ভাবে। চার-পাঁচ বছর হয়ে গেল কিন্তু তার মুখখানা শেফার স্মৃতিতে অম্লান। তাই তো আরমানকে যোগী ডেকে তাকে চুমুতে ভরে দেয়। মনে মনে বলে আল্লাহ্ যেন তেমনিই সারা জীবন মায়ের সম্মানের হেফাজত করে। শরতের নীল আকাশে শাদা পেঁজাতুলোর মতো হাল্কা ছন্দে ভেসে চলে শেফা, জীবনের এতো সুখ আছে তা কি কখনও সে ভাবতে পেরেছিল। আব্বা-আম্মা প্রায়ই আসেন। ইমাম সোনালির একটা বিয়ে ঠিক করেছে। ওর পরিচিত এক ব্যবসায়ীর

ছেলে। ছেলেটা লেখাপড়ায় খুব ভালো। নিউক্লিয়ার ফিজিকস্ এ গবেষণার জন্য কমনওয়েলথ স্কলারশীপ পেয়েছে। সোনালিকেও নিয়ে যাবে, তাই আগামী মাসেই বিয়েটা হবে। তবে এবার আব্বা মেয়ে বিয়ে দেবেন তার নিজের জায়গায়। সামনে থাকবে বড় জামাই, সবাই দেখবে তাঁর সৌভাগ্য। যারা একদিন টিটকারী দিয়েছিল, আজ তারা সালাম দেবে। রথের চাকা তো এমনি করেই একবার শূন্যে ওঠে একবার মাটি ছুঁয়ে। সত্যিই যাবার আগে বাবা জীবনে একটা পূর্ণতার স্বাদ পেয়ে গেলেন। ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ও বেরিয়ে এলে তার আর কোনও দায় দায়িত্ব থাকবে না।

বিয়ে হয়ে গেল। যতোটা আনন্দ সবাই প্রত্যাশা করেছিল সত্যিকার আনন্দ তাকে ছাড়িয়ে গেল। ইমামের বাবা মা ও ভাইয়েরা গিয়েছিল। আব্বা সবার জন্য হোটেল বুক করে রেখেছিলেন। তাই কারও কোনও কষ্ট হয়নি। তবে শেফা তার যোগীকে নিয়ে নিজের সেই পুরোনো শেফার ঘরেই রইল। এক সময় মেয়ে জামাই চলে গেল। ওরাও সবাই চলে এলো। সেই মেলা শেষের ভাঙা বাঁশি আর কলাপাতার মতো রইলেন শুধু আব্বা আর আম্মা। তারা যেন জীবনে পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন।

হঠাৎ কি হলো বিনা মেঘে বজ্রপাত। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলেন। ইমামের পরিবার ঐ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গবন্ধুকে তারা মহামানব মনে করে। ওর বাবা একেবারে ভেঙে পড়লেন। শেফার ভয় হলো আরও কিছু হবে নাকি; ইমাম একদিন অফিস থেকে ফোন করলো পুলিশ তাকে নিয়ে যাচ্ছে। পাগলের মতো শ্বশুর বেরুলেন। সন্ধ্যা নাগাদ ছেলেকে জামিনে বের করে আনলেন। অভিযোগ রাজনৈতিক নয় ব্যবসায়ে অসাধুতা। এর চেয়ে বেশি শেফা জানে না, জানতে চায়ও না। সে যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। রাজনৈতিক কারণে ওর জেল হলেও শেফার দুঃখ ছিল না। কারণ আব্বাকে বেশ কয়েকবার বছর দু'বছরের জন্য জেলে থাকতে সে দেখেছে। সেটা সম্মানের, কিন্তু এটা? ইমাম বোঝালো আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকবার জন্যই এই নাজেহাল হওয়া। তার আব্বা আছেন। শেফার আব্বাও কম যান না। নিজের বাবার নাম এ ক্ষেত্রে উচ্চারিত হওয়াটা শেফা ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলো না। তবে ইমামের মানসিক অবস্থার কথা ভেবে সে চুপ করেই রইল। কয়েক দিন ইমাম ঘর থেকেই বেরুলো না। শেষ পর্যন্ত শ্বশুর ছেলেকে সঙ্গে করেই অফিসে নিয়ে গেলেন। বড়ভাই কেমন আলগা হয়ে দূরে সরে গেলেন। শ্বশুর দুঃখ পেলেও কিছু বলতে পারলেন না, কারণ বছরখানেক আগে ভাইয়ের ব্যবসার রীতিনীতি সম্পর্কে বাবার কাছে কিছু অনুযোগ করেছিলেন। কিন্তু শ্বশুর তা কানে তোলেন নি। আজ শেফার মনে হলো ভাশুর অপেক্ষাকৃত সৎ, তা না হলে তিনিও তো ওই একই পিতার সন্তান। রাজনৈতিক কারণ হলে দু'জনকেই তারা ধরতো।

দুর্বল মুহূর্তে শেফার মনে একটা ছোট্ট পিঁপড়ার কামড়ের মতো সন্দেহের কাঁটা বিঁধলো। সত্যিই তো, রাতারাতি ব্যবসায়ে এমন কি জোয়ার এলো যে অতো বড় আলিসান বাড়ি ইমাম করে ফেললো। না শেফা আর ভাবতে পারে না। যোগীকে নিয়েই তার দিন আর অর্ধেক রাত কেটে যায়। ইমাম আরও দেরি করে ফিরতে শুরু করলো। বলে পার্টিকে এন্টারটেইন করতে হয়। বাচ্চা নিয়ে কষ্ট হবে বলে আগের মতো বাড়িতে আর পার্টি দেয় না, হোটেলেই সারে। কিন্তু মাস ছয়েক কাটবার পর সে আবার বাড়িতে পার্টি দিতে শুরু করলো। শেফার সেজেগুঁজে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। রিসিভ করতে হয়। খাওয়া দাওয়ার তদ্বির করতে হয়। যদিও তার মনটা পড়ে থাকে যোগীর বেবী কটের কাছে, সেখানে আজ তার জায়গায় আয়া দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এটুকু না করলে ইমামের মনটা ছোট হয়ে যায়। তাছাড়া আজকাল ওর কিছু কিছু ব্যবহার শেফার ভালো লাগে না। কিন্তু এ নিয়ে আপত্তি করতে তার মন চায় না। একেক সময় নিজের মনেই ভাবে, তার অনেক ত্রুটি ইমাম নিঃশব্দে গ্রহণ করেছে। সুতরাং তার দোষত্রুটি, সামান্য ব্যবহার নিয়ে নাই-বা অশান্তি করলো সে। এতো কিছু পেয়েও আজকাল নিজেকে মাঝে মাঝে বড় শূন্য মনে হয়। কেন এমন হয় জানে না। সে কি অতি লোভী? এতো কিছু পেয়েও তার ভোগ তৃষ্ণা মিটলো না? কে জানে কোথায় কি গরমিল যেন হয়ে গেছে। হয়তবা বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু তার ও তার পিতৃপরিবারে একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে।

ইমামের অর্থের ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু হৃদয়ে কোনো চাপ সৃষ্টি হয় নি। তাই খুব তাড়াতাড়ি ওরা সামলে উঠে আবার খাওয়া দাওয়া গান বাজনায় মেতে উঠেছে। আমানের গান বাজনার শখ। মাঝে মাঝে বাড়িতে জলসা বসায়। তখন শেফার খুব ভালো লাগে। তবে ইদানিং দু'ভাইরই খাদ্যের থেকে পানীয়ের দিকে ঝোঁক বেড়েছে। বাড়িতে বেশ একটি বড়ো সড়ো বার কর্ণার করে ফেলেছে। প্রথম প্রথম দু'একবার শেফা আপত্তি করেছে। ইমাম বলে, তুমি তো উকিলের মেয়ে। ব্যবসায়ীদের এসব প্রয়োজন হয় পার্টির কাছ থেকে কাজ পাবার জন্য। ইদানিং বেশ কিছু আর্মি অফিসার আসে তাদের বাড়িতে। ওরাও নাকি ব্যবসা করে। চাকুরিতে থেকে মিলিটারী অফিসাররা কেমন করে ব্যবসা করে শেফা ভেবে পায় না। নিশ্চয়ই অসৎভাবে অর্থোপার্জন করে। ইমামদের সুবিধা করে দেয়, নিজেরা কমিশন পায়।

শেফার ভয় করে তার যোগী পবিত্র থাকবে তো? সেও কি পৈত্রিক ব্যবসায় নেমে এমনিই উশৃঙ্খল হয়ে যাবে? কাঞ্চন মূল্যে পৃথিবীকে বিচার করবে? ইমাম মাঝে মাঝে শেফাকে অনুযোগ করে সে এমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেমন করে, মনে হয় তার কিছুই ভালো লাগে না। শেফা বলেছিল, তুমি ঠিক ধরেছো। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে, ভালো লাগে না। ইমাম হঠাৎ কেন জানি না রেগে গেল। সাধারণত সে

শান্ত স্বভাবের। বললো, তুমি সব সময় আমার আর্মির পার্টনারদের নিয়ে নানা কথা বলো। এ তোমার কেমন স্বভাব। কোন দিন পাক আর্মি তোমার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিল তুমি সব সময় ওটাই মনে করবে। এরা বাঙালি, এদেশের ছেলে, বোঝ না কেন? শেফা উত্তর দেয় না। শুধু বলতে ইচ্ছে করে, যে ধর্মের যে জাতের হোক না কেন খাঁকি কাপড় গায়ে তুললেই মানুষের মনুষ্যত্ব বোধ কমে যায়। কারণ এদের ভেতর সবাই কিন্তু ভালো মানুষ নয়। সে একজন যুবতী মহিলা। পুরুষের দৃষ্টির ভাষা সে পড়তে পারে। ওর ননদ আজকাল এলে সকালের দিকে আসে। বলে, তোমাদের বাড়ির সন্ধ্যার আড্ডা আমার ভালো লাগে না ভাবি। দিন গড়ায়, শেফার কোলে একটি মেয়ে এসেছে। শেফা নাম রেখেছে, কুন্দ। অবশ্য আকিকায় একটা লম্বা চওড়া নাম রেখেছেন শ্বশুর। যোগীর এখন ছ'বছর, ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে স্কুলে যায়। শেফা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে আর মনে মনে বলে, যোগী তোর নামের মর্যাদাটা রাখিস বাবা। আমার জন্মের ঋণ যেন শোধ হয়।

ছোটভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে একটা ফার্মে যোগ দিয়েছে। বিদেশে যাবার চেষ্টায় আছে। সোনালির স্বামী দায়িত্ব নিয়েছে। হয়তো যাবে, সময়ের অপেক্ষা। ও মাঝে মাঝে আসে। যোগীকে নিয়ে খুনসুটি করে। কুন্দকে নাচায়, গল্প সল্প করে খাওয়া দাওয়া করে চলে যায়। বাবা মার নিঃসঙ্গতার জন্য দু'জনেই দুঃখ করে। কিন্তু কিবা করতে পারে তারা। সেদিন কথা প্রসঙ্গে খুব সংকোচের সঙ্গে বললো, আপা দুলাভাইকে তুই কিছু বলিস না? এতো বেশি ড্রিঙ্ক করে যে লোকে নানা কথা বলে। তার চেয়েও বেশি স্ক্যান্ডাল আর্মির সঙ্গে এতো দহরম মহরম কেন? এই আর্মিই আমাদের জীবনটা শেষ করতে বসেছিল। শেফা গম্ভীর হয়ে বললো, সেন্টু যার যাতে ভালো লাগে তাই ভালো। সে যদি আর্মি নিয়ে নেচে সুখ পায় পাক। তবে এ নিয়ে আমি একদিন মৃদু আপত্তি করেছিলাম, বেশ ক্ষুণ্ন হলো। আমিও হাল ছেড়ে দিয়েছি। আমার কেন জানি না কিছু ভালো লাগে না। মনে হয় কিছু একটা অঘটন ঘটবে। অঘটনের বাকি আছে কি? ১৯/২০টা ক্যু হয়ে গেছে। কোন দিন সব শেষ হয়ে যাবে। তখন হয়ত একটা চরম অরাজকতা আসবে। দুলাভাই কি এসব বোঝে না? বুঝবে না কেন? অর্থের মোহে অন্ধ হয়ে গেছে। তার টাকা চাই, আরও টাকা। বলে, শেফা মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ছেলে মানুষ করতে হবে, সোজা হয়ে হাঁটতে শিখলেই আমেরিকা পাঠাতে হবে। বলিস কি তুই? তার এতো খরচ। ভাইয়ের মাথায় হাত রেখে হেসে ফেলে শেফা। কালচারাল বৈষম্য বড় সাংঘাতিক জিনিস ভাই। এর সঙ্গে আপোস করা কঠিন, সত্যিই কঠিন।

ইমাম সেদিন ফিরলো প্রায় সাড়ে বারোটায়। সেন্টুর কথাগুলো এমনিতেই শেফাকে কিছুটা বিচলিত করেছে। মনে হল ছোট ভাই যেন কিছুটা অসম্মান করে

গেল। রাতে মনে হলো ইমাম টলছে। শেফা বললো, বাড়িতে আব্বা-আম্মা আছেন আরেকটু সংযত হলে ভালো হয় না? নেশাগ্রস্তর মনে হয় জ্ঞান থাকে না। পরিবেশ থেকে অনেক নিচে নেমে যায়। শেফার মুখের কাছে এসে ইমাম বললো, সংযম দেখাচ্ছো। হ্যাঁ এ শিক্ষা তোমারই দেওয়া মানায়। সহস্র পুরুষকে দেহ দান করে আমার চরিত্র সংশোধন করতে চাইছো? বাঃ বেশ। বলে একটা হাততালি দিলো। শেফা ভয়ে দুঃখে যন্ত্রণায় পাশের ঘরে ঢুকলো। বেশ কিছু দিন হলো সে ছেলে মেয়ের সঙ্গে শোয়। তবে ইমাম এলে ওকে সেবা যত্ন করে খাইয়ে দাইয়ে ও শুতে যায়। আজকাল এর অতিরিক্ত কোনও চাহিদা ইমামের নেই। শেফা অবাক হলেও স্বস্তি বোধ করে। ভালোবাসাহীন দৈহিক মিলনে তার বড় ঘৃণা। তাই ইমামের অবহেলা বা ঔদাসীন্য তাকে বাঁচিয়ে দেয়।

কুন্দকে বুকে নিয়ে সে তার আনন্দের ভালোবাসার পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। কি কথা আজ তাকে বললো ইমাম? জবরদস্তি অত্যাচারকে কি দেহদান করা বলে? এই দীর্ঘ ৭/৮ বছরে ইমাম কোনওদিন অতীতের ওই সর্বনাশা দিনগুলোর কথা মুহূর্তের জন্যও উচ্চারণ করেন। ওর মনটা ছিল মায়া মমতায় ভরা, বাপের মতোই প্রগতিশীল উদার। কিন্তু সে এমন নিচে নেমে গেল কি করে?

পরদিন সকালে ইমামের চা নিয়ে সে গেল না তার বিছানায়। ডাকাডাকি করে ঘুমও ভাঙালো না। যোগীকে স্কুলে পাঠিয়ে কুন্দকে শাশুড়ির ঘরে আয়ার কাছে রেখে একটু বড় ভাশুরের কাছে গেল। ওঁরা দু'জনেই একটু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গম্ভীর, কিন্তু স্নেহপ্রবণ। কোনও বুদ্ধি পরামর্শের প্রয়োজন হলেই সে বড় ভাইয়ের কাছে যায়। তারাও ওকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাছাড়া এই যাতায়াতটাও ওর শ্বশুর শাশুড়ি খুব পছন্দ করেন। কারণ ইমাম আর আমান দু'জনেই একে অন্যের-থেকে বেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কারণ তিনি এসব ফটকা বাজারি ব্যবসা পছন্দ করেন না। ওরা ধানমন্ডীতে থাকে। শ্বশুরের কাছ থেকে গাড়ি চেয়ে নিয়ে এলো। তিনি আজ সকালের দিকে বেরুলেন না। এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা তার মুখের দিকে চেয়ে কিছু যেন পড়তে চেষ্টা করলেন, গোলমাল কিছু একটা হয়েছে, বাবার থেকে মা তো বেশি বোঝেন, তাই দুঃখী মেয়েটার কষ্ট তাকে বিপর্যস্ত করে। শ্বশুর অতো চিন্তিত নন কারণ এ বয়সে সবাই একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়, তবে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যায়. তিনিও বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে কম বদমায়েসী করেন নি। আবার সময় মতো নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। নইলে আজ পথই সম্বল হতো। তবে জিনিসটা অতো সহজ নয় এ কথা তিনি বোঝেন। কারণ তিনি আর যাই করুন অসৎ ব্যবসায়ী ছিলেন না। কালো টাকাকে তিনি বরাবর ঘৃণা করেছেন। ভাওতাবাজির ধার কখনো ধারেন নি। সত্যি তো, বৌমাতো ঠিকই বলে, বাড়িতে এতো সামরিক অফিসারের আড্ডা কিসের?

আজ এদের জন্যেই তো কপালে তাদের এত দুঃখ। কি জানি শেষ বয়সে কপালে কি আছে।

নেহায়েৎ প্রয়োজন ছাড়া ইমাম ও শেফার কথাবার্তা বিশেষ হয় না। অফিসে যাবার আগে শেফা আসে, জামা কাপড় গুছিয়ে দিয়ে যায়। প্রয়োজনীয় কথা থাকলে দু'জনেই সেরে নেয়। ইমামকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয় শেফার। ওর দিকে চোখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত। বাড়িতে খাওয়া এক রকম ছেড়েই দিয়েছে। মা একদিন বলেছিলেন, উত্তরে ইমাম বলে, একা খেতে ভালো লাগে না। তার থেকে হোটেলে সঙ্গী সাথী থাকে মা বলেন, বৌমাকে ডাকলেই পারিস। সন্ধের পর বাচ্চাদের দেখতে হয়। ওদের খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো... মাকে কথা শেষ করতে দেয় না ইমাম। না না, ওকে বিরক্ত করে লাভ কি? আমারও দেরি হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি না। দু'জনেই বুকে শ্বাস চেপে রেখে আলাদা হয়ে যান।

বড় ছেলে একদিন এলো। বাবার সঙ্গে গম্ভীর মুখে কি সব আলাপ আলোচনা করলো। জানিয়ে গেল আগামী মাসের ছ'তারিখে আরমান কার্সিয়াঙ যাচ্ছে। ও ওখানে ভর্তি হয়েছে। বড় চাচাই সব ব্যবস্থা করেছে। তার বক্তব্য, বংশের একটা মাত্র ছেলে তার মানুষ হওয়া দরকার। এ বাড়ির এ পরিবেশে তাকে মানুষ করা কঠিন। তিনি বুঝলেন, এ জন্যই শেফা ভাসুরের কাছে গিয়েছিল। মনে মনে মেয়েটার প্রশংসা করলেন।

মাস খানেক পর একদিন ইমাম অফিসে বেরুচ্ছে এমন সময় আরমান বললো, আব্বা আমি কাল চলে যাচ্ছি। কোথায়? বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ইমাম। কেন তুমি জানো না আমি কার্সিয়াঙ যাচ্ছি পড়তে। বোবা হয়ে যায় ইমাম। সে আজ পরিবার থেকে কতো দূরে চলে গেছে। ছেলে চলে যাচ্ছে পড়তে দেশের বাইরে আর সে খবর সে জানে না। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চোখের জল চেপে রেখে অনেক দিন পর বাবার ঘরে এলো। আব্বা যেন হঠাৎ করে বুড়ো হয়ে গেছেন। তেমনি সস্নেহ কণ্ঠে বললো, না, না তেমন কোনও কথা নয়। আরমান বললো ও নাকি কার্সিয়াঙ পড়তে যাচ্ছে, সত্যি? হ্যাঁ, কেন তুমি জানো না? বিস্ময়ের সঙ্গে জবাব দিলন আব্বা, তারপর নিজ থেকেই বললেন, অবশ্য জানবেই-বা কি করে? তুমি তোমার উপার্জন আর নিজের ভোগ বিলাস ছাড়া আর কিছুই আজকাল জানো না। হ্যাঁ ওকে এ পরিবার থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। বড় খোকাকে বলেছিলাম। সেইসব ব্যবস্থা করেছে। কাল সকালের ফ্লাইটে ওরা যাবে। পারলে এয়ারপোর্টে যেয়ো। শিশুর মনে পিতা সম্পর্কে শ্রদ্ধা থাকা উচিত। ইমাম অস্ফুটে বললো, থাকবো। শেফা কিছু বলে নি, প্রশ্ন করলো ইমাম। বৌমা, ওকে তুই আজও চিনলি না এটাই আমার দুঃখ। আমার কথার উপর কথা বলবে সে আসলে তার তাগিদেই

ওকে পাঠানো। ভালোই হলো। কোনদিন আমি থাকি না থাকি তার ঠিক আছে। গার্জিয়ান ছাড়া ছেলে মানুষ করা যায় না। এখন আমি নিশ্চিন্ত। আমি না থাকলেও বড় খোকা ওকে মানুষ করতে পারবে, তোমার চিন্তার কিছু থাকবে না। মাথা নিচু করে ইমাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অফিসে গেল না ইমাম, ঘরে ফিরে এলো। কিন্তু ভেতরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালো, শেফা ঘর গোছাচ্ছে। ওকে দেখেই চলে যাচ্ছিল, ইমাম ডাকলো, শেফা। শেফা ঘুরে দাঁড়ালো। ইমামের মনে হলো শেফা যেন অনেক লম্বা হয়ে গেছে। মুখটা কেমন যেন রক্তশূন্য; চোয়াল দু'টো মনে হয় শক্ত। চোখ নামিয়ে নিলো ইমাম। শেফা স্বাভাবিক গলায় বললো, কিছু বলবে? অফিসে গেলে না? শরীর খারাপ নাকি? তার কণ্ঠস্বরে এতটুকু জড়তা নেই। অবাক হয়ে ইমাম ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। একেই বলে ধরিত্রীর মতো সহনশীল। তার মনে পড়ে না শেফা কোনও দিন রাগ করে বা উঁচু গলায় তার সঙ্গে কথা বলেছে। অথচ শুনেছে সে সাংঘাতিক একরোখা জিদ্দি ছিল। তাহলে সে কি তাকে শুধু কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে, অন্তর থেকে ভালোবাসতে পারেনি? হঠাৎ কানে এলো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভালো না লাগলে জামা কাপড় বদলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও। এক কাপ চা এনে দেবো? বিস্মিত ইমাম অস্ফুটে বললো, দাও। তারপর সত্যি সত্যি কাপড় জামা বদলে শুয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর শেফা সেই পরিচিত ভঙ্গীতে চা এনে ইমামের বেডসাইড টেবিল রাখলো। ইমাম চেষ্টা করে ভেবে দেখলো প্রায় দু'বছর পর শেফা তাকে চা দিলো। কি ব্যাপার? সে কি রিপ ভ্যানউইন্‌কিলের মতো দু'বছর ঘুমিয়ে ছিল। ক্লান্ত স্বরে বললো, আমার কাছে একটু বসবে শেফা? শেফা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেসে বললো, বসবো। এখন সকাল দশটা বাজে। আমার যে অনেক কাজ। জানো বোধ হয় যোগী কাল কার্সিয়াঙ চলে যাচ্ছে। শুনেছি, কিন্তু তোমরা তো কেউ আমাকে কিছু বলোনি শেফা? আমি ওর বাবা নই? শেফা হেসে বলে, সে কথা কি কেউ তোমাকে বলেছে? তোমার সময় কোথায়, এ সব ছোট খাটো কথা শোনার বলো? যে কাজের চাপ। আমরা তো চাপের নিচে অনেক দূরে তলিয়ে গেছি। বুঝলাম সব, কিন্তু কোনও দিন কি আমাকে এ সব কথা মনে করিয়ে দিয়েছো বলো, বলো শেফা। উত্তেজনায় ও শেফার হাত চেপে ধরে। শেফা এতোক্ষণে স্পষ্ট উচ্চারণ করলো, হাত ছাড় ইমাম। এ হাত অপবিত্র, ধরলে তোমার গুনাহ হবে। যা বলবার তুমি আমাকে বলেছো। এবার চুপ করে শুয়ে থাকো। আমার অনেক কাজ। যোগীর জিনিসপত্র ঠিক করবো। বাবার যাবার আয়োজন আছে। তাছাড়া উনি যোগীর জন্য বাচ্চাদের মতো খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। আমার জন্য না হয় নাই হলো আব্বার কথা ভেবেও তো ওকে এখানে রাখতে পারতে, মিনতির স্বরে বললো ইমাম। তুমি তো কিছুই জানো না, ওর

যাবার সব ব্যবস্থা আব্বাই করিয়েছেন। আমার কোনও মতামত আছে কিনা জানতে চেয়েছেন অনেক পরে, সব ঠিক করে। তাহলে তখন বারণ করোনি কেন শেফা? ইমাম বলে উঠলো। পাগল, আব্বার চেয়ে আপনজন যোগীর আর কে আছে। তুমি তো তবুও ওকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারো কিন্তু আমার তো কোনও ক্ষমতাই নেই। তাছাড়া আব্বার ওপর আমার যেমন অগাধ বিশ্বাস, তেমনি অনন্ত নির্ভরতা। আচ্ছা, তুমি বিশ্রাম করো আমি কাজগুলো সেরে আসি। এসো কিন্তু শেফা, করুণ কান্নার মতো শোনালো ওর কণ্ঠস্বর। দ্রুতপায়ে শেফা বেরিয়ে গেল। তার গলায় কান্না জমে আছে। তরল হলে বিপদ। আল্লাহ্‌র এ দুনিয়ায় কি সবই সম্ভব? ইমাম আর কখনও তার কাছে আসবে সে ভাবে নি। আজ দু'বছর তার নিষ্ঠাবতী বিধবার জীবন চলছে। শ্বশুর-শাশুড়ি সবই বুঝতে পারেন কিন্তু এ নিয়ে দু'জনে ছেলেকে একটি কথাও কোনও দিন বলেন নি। শুধু শ্বশুর একদিন শাশুড়িকে বলেছিলেন, ছিঃ ছেলের কাছে মাথা নিচু করবে? কখনও না। ওকে চলতে দাও, হোঁচট খেলেই হুমড়ি খেয়ে এসে পড়বে। নিজের সম্মান নিজের কাছে রেখো, সে আমি থাকি আর নাই থাকি। শেফা দূর থেকে কথাগুলো শুনে অবাক হয়ে গেছে। এতোবড় মানুষটার বুকের ভেতর এতো গভীর বেদনা অথচ কতো সংযমী।

মনে হয় মুরুব্বিদের কথা মিথ্যা হয় না। ইমাম কোথাও হোঁচট খেয়েছে। বাড়িতে তো পার্টি ডিনার সব বন্ধ। কোথায় কি করে কি জানে? আজ হঠাৎ ছেলের চলে যাবার কথায় এমনভাবে ভেঙে পড়বে শেফার তা মনে হয় না। ব্যবসায় কোথাও কোনও গলদ বাঁধিয়েছে। শেফা এসব নিয়ে ভাবতে চায় না কিন্তু এখন না ভেবেও পারছে না। প্রতিপক্ষ সবল হলে তার সঙ্গে লড়াই করা যায়, কিন্তু দুর্বল হয়ে নতি স্বীকার করলে তো নিজের থেকেই পরাজয় মেনে নিতে হয়। অবশ্য এ সব টালবাহানা করে যোগীকে পাঠানো বন্ধ করতে শেফা দেবে না। তার ভবিষ্যতের পথ স্পষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া সামনে আছেন বড় ভাই, ধীর স্থির কর্তব্যপরায়ণ। অপুত্রক এ মানুষটি যোগীকে পুত্রতুল্য ভালোবাসেন।

কোথা দিয়ে যে দিনটা কেটে গেল শেফার সে জানে না। বুকে পাষাণ বেঁধে সে যোগীর যাবার আয়োজন করেছে। মাত্র নয় বছরের ছেলে। কোনও অসুবিধা দুঃখ অভাব কিছুই তো তার ছিল না। কিন্তু না, ধনলিপ্সু, লম্পট পিতার আদর্শ সে ছেলের সামনে ধরবে না। দুপুরে এবং রাতে দু'বেলাই ইমাম খাবার টেবিলে ছেলের পাশে বসে খেলো এবং আব্বা আম্মার সঙ্গেও কিছু অনাবশ্যক কথা বললো।

সকালে আব্বা-আম্মা জানালেন তাঁরা এয়ারপোর্টে যাবেন না। ভাইয়া যেদিন গরমের ছুটিতে আসবে সেদিন তারা আনতে যাবেন। যোগী কিন্তু বেশ খুশি। শুধু দাদা দাদির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ওদের চুমোয় চুমোয় ভরে দিলো।

তারপর কিছু না বলে এক দৌড়ে বড় চাচার গাড়িতে গিয়ে বসলো। ইমাম আর শেফা আব্বা আম্মাকে বলে তাদের গাড়িতে উঠলো। মনে হলো শেফার, তার সমস্ত ধনরত্ন বাক্স বন্দি করে সে নিয়ে চলেছে অজানা অচেনা জায়গায়–ঢেলে দিতে। কুন্দ বাড়িতে, দাদা-দাদির কাছে। ওকে নিয়ে এলে ভালো হতো, কিছুটা অন্যমনস্ক থাকা যেতো। এয়ারপোর্টের কাজ কর্ম সারা হলো। বড়ভাই শেফাকে বললেন, কোনও চিন্তা করো না, শেফা। আমি ওকে পৌছে দিয়ে দিন সাতেক হোটেলে থাকবো। ও সেটেল্ড হলে তারপর আসবো। ইমামের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবা হয়েছিস, একটু সামলে চলিস। মেয়েটাকে বুকে করে রাখিস। পৃথিবীতে যতো মানবিক সম্পর্ক আছে, বাবা আর মেয়ের চেয়ে মধুর আর কিছু নেই। আচ্ছা চলি, খোদা হাফেজ। যোগী দিব্যি টা টা বাই বাই করতে করতে ভেতরে ঢুকে গেল। ইমাম হাত বাড়িয়ে শেফার হাতটা ধরলো। ওর হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং মৃদু মৃদু কাঁপছে। ইমাম বললো, শেফা চলো। ওখানে গিয়ে চা খাই। গলাটা আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, প্লেন না ছাড়লে যাবো না। শেফা বোবার মতো ওর সঙ্গে সঙ্গে চলল। চায়ে চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গে এ্যানাউন্সমেন্ট হলো। ওপরে জানালা থেকে দেখলো যোগী তার চাচার হাত ধরে বক বক করতে করতে প্লেনে উঠে গেল। উপরের দিকে হাত বাড়ালেন কারণ তিনি জানেন অন্তত এক জোড়া চোখ হৃদয়ের শেষ বিন্দু ভালোবাসা দিয়ে এ দিকে তাকিয়ে থাকবে। ওরা চলে গেল।

সারা পথ শেফা যেন মুক বধির একটা প্রাণীর মতো স্থানুবৎ বসে রইলো। ইমাম কি যেন বলছিল শেফার কানে গেল না। শুধু মনে হচ্ছে টেপরেকর্ডার যেন কানের কাছে বেজেই চলেছে যোগীর কণ্ঠস্বর নিয়ে, আম্মু আম্মু আম্মু। বাড়িতে এসে কুন্দকে বুকে নিয়ে উপুড় হয়ে পড়লো শেফা। তার সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়েছে। আম্মা এসে দাঁড়ালেন, মাথায় হাত রেখে বললেন, শেফা স্থির হও। ছেলেকে মানুষ করতে হবে। ছেলে মানুষ করতে পারা যেমন গৌরবের অমানুষ হলে তেমনি লজ্জা ও কলঙ্কের। পর্দার ওপাশে ইমাম দাঁড়িয়ে, মনে হয় যেন আম্মা ওকেই ধিক্কার দিচ্ছেন। আম্মা বসলেন শেফার পাশে। বললেন, শেফা ভেবে দেখো আমান যেদিন আমেরিকা গেল আমার কেমন লেগেছিল। তোমার যোগী তো ছ'মাস বাদেই আসবে তোমার কাছে। তুমি ইচ্ছে করলেই ওকে দেখতে যেতে পারবে। কিন্তু আমার আমান, ওতো হারিয়ে গেছে আমি জানি। হয়তো দু'পাঁচ বছর পর সপ্তাহ দু'য়েকের জন্য আসবে, আবার চলে যাবে। বিয়ে করেছে ওদেশী মেয়ে। আমাদের উপর তার তো আর টান থাকবার কথা নয়। ওঠো শেফা, আমাকে দেখো। সত্যিই শেফা উঠে বসলো। ধড়মড় করে বললো, আব্বার খাওয়া হয়েছে? না মা, তুমি বিছানা নিলে ও মানুষটা খায় কি করে। শেফা কুন্দকে শাশুড়ির কাছে দিয়ে একরকম দৌড়েই নিচে চলে

গেল। একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর অনুপস্থিতিতে বাড়িঘর কেমন যেন নিস্তব্ধ শান্ত হয়ে গেছে। অবশ্য কুন্দ এখন সারাবাড়ি ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। দাদা-দাদিকে ডাকে।

মাসখানেকের ভেতর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলেন। এবার ইমাম একেবারেই ঘরে বন্দি হলো। আশ্চর্য! ওর আব্বা ভালো মন্দ কিছুই ওকে বললেন না। গতবার সঙ্গে করে অফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন। শেফা বলতেই বললেন, ওর কোনও অভিভাবকের দরকার নেই। ও এখন বড় হয়েছে। একাই চলতে পারবে। তবুও বড় ছেলেকে ডেকে ওর দিকে একটু চোখ রাখতে বলেছেন। একেই বলে বাপের মন, মানতে চায় না।

সেই প্রথম জীবনের মতো ইমাম বই নিয়ে বসে থাকে, কি বই শেফা জানে না। আগে পলিটিক্যাল বই পড়তো। এখন পড়ে থ্রিলার। কুন্দকে নিয়ে কখনও কখনও বাইরে যায় কিন্তু শেফাকে অনুরোধ করে না। একদিন গিয়েছিল সংসদ ভবনের কাছে লেকের পাড়ে। বেশিক্ষণ বসলো না শেফা। সংসদ ভবন দেখলে ওর ভালো লাগে না। ওর মনে হয় ওটা অভিশপ্ত। ওখানে কোনও নির্বাচিত সংসদ বসলো না। বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন কি, আর হলো কি। শেফার কষ্ট হয়। সবাই তো দিব্যি খেয়ে হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছে। ওই মানুষটার জন্য ওর বুকটা কেন এমন করে কাঁদে। সম্ভবত ওই মনটাও যে ওদের জন্য কেঁদেছিল। এ স্পর্শকাতরতা উভয়ের জন্যই বোধহয় সংক্রামকভাবে সংবেদনশীল।

দিন চলে যায়। শেফারও যায়। আমান বউকে তালাক দিয়ে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। কিন্তু ইমামের কাছ থেকে আগের মতো প্রশ্রয় না পাওয়ায় ভদ্র জীবন যাপন করছে। ফেরবার পথে লন্ডনে সোনালিদের কাছে এক সপ্তাহ ছিল। ওর একটা ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে। ওরা আর দেশে ফেরে নি। নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে। দু'জনেই ভালো কাজ করছে। শুনে শেফার ভালো লাগলো। সেন্টুও চলে গেছে। গত বছর আব্বা আম্মা গিয়ে প্রায় ছ'মাস থেকে এসেছেন। শেফার এতে বড় তৃপ্তি, শেফা বেঁচে আছে থাকবেও। যাদের দুনিয়াতে এনেছে তাদের মানুষ করবার প্রতিশ্রুতি আছে নিজের অন্তরের কাছে। সে একজন মা এবং ব্যতিক্রমধর্মী মা, যে মেয়ের সব চেয়ে বড় পরিচয় সে বীরাঙ্গনা, শেফা দেশের জন্য তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নারীত্ব বিসর্জন দিয়েছে। সে তো কোনও শহীদের চেয়ে কম ভাগ্যবান ও পুণ্যবান নয়। তারা প্রাণ দিয়েছে একবার, শেফা মান দিয়েছে বার বার। আজও তার স্বামী থেকে শুরু করে অনেকেই তাকে বাঁকা চোখে দেখেন। শেফা ওদের করুণা করে, কৃপা করে, সে এমনি বিজয়িনীর বেশে সংসার থেকে বিদায় নেবে। সেইদিন তার সাধনা সার্থক হবে যে-দিন সে তার যোগী, তার কুন্দর কাছে তার মূল্য তুলে ধরতে পারবে, এই তার একমাত্র ও শেষ প্রার্থনা আল্লাহ্‌র কাছে।

পাঁচ

রোদ মরে আসা শীতের বিকেল। ভেতরের বারান্দায় একখানা পত্রিকা হাতে নিয়ে বেতের চেয়ারে বসেছিল ময়না। একবার ভেবেছিল আজ শুক্রবার ছুটির দিন, একটু বাইরে যাবে। কিন্তু আলসেমি করে আর যাওয়া হলো না। ও একা বেশিক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কষ্ট হয়। ওর অতীত ও বর্তমান দু'দিক থেকে ওকে ক্ষতবিক্ষত করে। অনেকেরই পীড়াদায়ক যন্ত্রণাবিদ্ধ অতীত থাকে। এক সময় মানুষ তার থেকে মুক্তিও পায়। কিন্তু ময়নার ভাগ্যে সবই ব্যতিক্রম। এ জায়গাটা ওর ভালো লাগে। এই বিশাল ঢাকা শহরের ইট, কাঠ, লোহা,লক্কড়ের জঠরে নিশ্বাস ফেলবার মতো এই মৃদুমন্দ নির্মল হাওয়া তো বেহেশ্‌তী সৌভাগ্য। অনেক চেষ্টা করে বাসস্টপ থেকে সিকি মাইল দূরে এ ঘরটুকু সে পেয়েছে। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর এ ওর শান্তির স্বর্গ।

সবচেয়ে বড় মুস্কিল ছিল স্বামীহীনা কোনও মেয়েকে এ দেশের অতিমাত্রায় সৎ ও ধর্মভীরু বাড়িওয়ালারা বাসা ভাড়া দিতে চান না। অনেক হয়রানি সইতে হয়েছে ময়নাকে। কিছুদিন হোস্টেলে ছিল। কিন্তু সুপার ম্যাডামের কৌতূহল তাকে টিকতে দিলো না অর্থাৎ তার নিজেরই সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেল। প্রায় ছ'মাস চেষ্টা করে হঠাৎ তার সহকর্মী আসিফের দৌলতে এই জায়গাটুকু সে পেয়েছে। আসিফের চাচার বাড়ি এটা। তেতলা বড় বাড়ি। ওপরের দু'টো তালা ভাড়া দিয়েছেন। পাচ্ছেন বারো হাজার টাকা। আর এক তলায় তারা দু'জন অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী থাকেন। সেখানেই আসিফের চাচি তাকে দেখে কথা বলে তারপর রাজি হয়েছেন। ওঁর দু'ছেলে। একজন থাকে নিউইয়র্কে আর একজন ফিনল্যান্ডে। ৩/৪ বছর বাদে সপ্তাহ দু'য়ের জন্যে আসে। সুতরাং নিচে যেমন খালি ঘর থাকাও নিরাপদ নয় তেমনি কথা বলার একটা মানুষ থাকলেও ভালো লাগে। তাই উভয় পক্ষই এ ব্যবস্থায় খুশি হলো। ময়না সাড়ে আটটার ভেতর বেরিয়ে যায়, ফিরতে ফিরতে সাতটা সাড়ে সাতটা হয়ে যায়। ছুটির দিনেও সে খুব একটা বাইরে যায় না। আজ ভেবেছিল যাবে, কিন্তু হয়ে উঠল না।

হঠাৎ ডোর বেলটা বাজলো, চাচি যেন কার সঙ্গে কথা বলে বসতে বললেন। একটু পরেই পর্দা তুলে বললেন, ময়না তোর সঙ্গে কে যেন একজন মহিলা দেখা করতে এসেছেন। আলসেমী ভেঙে বসবার ঘরে ঢুকেই ময়না অবাক। আপা আপনি, আপনি কি করে এ বাড়ি চিনলেন? তার মানে? সারা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছি আর এতবড় বাড়িটা...। না না, তা বলছি না; ঠিকানা পেলেন কোথায়? কেন তুমিই তো একদিন দিয়েছিলে মনে নেই? চলুন আমরা ভেতরে গিয়ে বসি। চাচি কুণ্ঠিতভাবে বললেন, না না তোমরা এখানেই বসো। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আগন্তুক এগিয়ে এসে চাচির হাত ধরে বললেন, কিছু লাগবে না চাচি আম্মা, আমি এক জায়গা থেকে দাওয়াত খেয়েই আসছি। যদি কিছুক্ষণ থাকি আর চা খাই তবে আপনার কাছ থেকে চেয়েই খাবো। মনে থাকে যেন মা, কাকে আর চা খাওয়াবো। তবুও তো এ মেয়েটা আছে তাই সারাদিনে দু'একবার মুখ খুলতে পারি। মহিলা অন্য দরজা দিয়ে ভেতরে গেলেন আর ওরাও বারান্দায় এলো। বাঃ। সুন্দর তো জায়গাটা; তোমার পছন্দ আছে ময়না। পছন্দ না, এটা আমার পরম সৌভাগ্য আপা, যেমন আপনার মতো বোন পেয়েছিলাম জানি না কি সুকীর্তির ফলে; আর এই চাচা চাচিও আল্লাহ্‌র রহমত। বেতের চেয়ারটা আপাকে দিয়ে ময়না একটা মোড়া নিয়ে আপার কাছে কোল ঘেঁষে বসলো। হাত দু'খানা আপার কোলের ওপর তুলে দিয়ে মাথাটা নামিয়ে আনলো সেই হাতের ওপর। আপা আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তারপর বললেন, ময়না, আমি তোমার কাছে এলাম গল্প করতে আর তুমি বসলে কাঁদতে। এমন করলে আমি চলে যাবো। এক ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটা তুলে ময়না বললো, না না আপা আর কাঁদবো না, বিশ্বাস করুন আমি আর কারও সামনে চোখের পানি ফেলি না।

বুঝেছি সেই প্রথম থেকেই আপাকে পেয়েছো কান্নার খুঁটি হিসেবে। মনে আছে একদিন পাশের হোস্টেল থেকে তুমি আমাদের সমিতির অফিসে এসেছিলে ফোন করতে। আমাকে দেখতে পেয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছিলে। আমি তোমাকে ডাকলাম, ময়না। তুমি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলে আমার নাম আপনি জানলেন কি করে? ময়না অবাক হয়েছিল আমি ওর পরিচয় জানি দেখে; বলেছিলাম, জেরিনা, মিসেস জেরিনা আলিম, তোমার সব কথা আমাকে বলেছেন। ময়না দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো, জেরিনা আপা তো নেই। আমি জানি, ও আমার ছোট বোনের চেয়েও বেশি ছিল। অতো বড় লোকের একমাত্র মেয়ে অমানুষ স্বামীর হাতে কি অত্যাচারই না সয়ে গেল। থাক ওর কথা আরেক দিন শুনো। তোমার কথা বলো। তোমার সময় আছে তো? সেদিন থেকেই তো আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম, তাই না আপা? তাই একদিন আপনার ঘরে বসে বলেছিলাম, আপা আমি একজন

বীরাঙ্গনা। কিন্তু আপনাদের দেওয়া পরিচয় অঙ্গের ভূষণ হয়েই রইলো, তাকে না পারলাম পরতে, না পারলাম ফেলতে। লোকচক্ষে হয়ে গেলাম বারাঙ্গনা। সত্যি মানুষ তাই ভাবে। দুর্দিনে কেউ পাশে এসে দাঁড়ালো না কিন্তু ধিক্কার দেবার বেলায় দিব্যি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আপা আমি বেশি দূরের নই, আপনাদের একেবারে কাছের মানুষ, প্রতিবেশী বলতে পারেন। আমি নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ার মেয়ে। ও পাড়ার দস্যি মেয়ে বলে সবাই আমাকে চিনতো। আমি মর্গান স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে আইএতে ভর্তি হলাম। আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন নারায়ণগঞ্জ কলেজের প্রিন্সিপাল যোগেন্দ্র বাবু। বাংলা পড়াতেন। এই ভিকারুন্নেসার প্রিন্সিপাল হামিদা আলী এঁরা সবাই আমাকে চিনতেন। আমি লেখাপড়ায় খুব একটা ভালো ছিলাম না। কিন্তু ওদের স্নেহ আর আদর অনেক পেয়েছি।

রাজনীতি করতাম, ছাত্রলীগের সদস্য ছিলাম। কলেজের ওই দল গঠন ও তার কাজ করতাম। কতোদিন সভা করতে সারোয়ার সাহেবদের বাড়িতে গেছি। এভাবেই দিন যাচ্ছিল। খেলাধুলায় আমার ছিল প্রচুর আগ্রহ। এজন্য ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল একটু বেশি। আর সে কারণে অনেকে আমাকে খুব ভালো মেয়ে বলে মনে করতো না। অবশ্য তখন সমাজটা এরকমই ছিল।

'৬৯, '৭০ চলে গেল উত্তাল গণ-আন্দোলনের স্রোতে। আইএ পাশ করলাম দ্বিতীয় বিভাগে। বাবা খুব অসন্তুষ্ট হলেন। বাবা ছিলেন হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক। কোনও মতে মধ্যবিত্তের সংসার চলছিল। বড় ভাই বিএ পাশ করে ঢাকেশ্বরী কটন মিলে একটা মোটামুটি ভদ্রস্থ চাকুরি পেলো। পরিবার হাফ ছেড়ে বাঁচলো। তবুও আব্বা আম্মা ভেবেছিলেন আমি বিএটা ভালোভাবে পাশ করলে স্কুলে একটা চাকুরি পেলে হয়তো আমার বিয়ের জন্য তিনি সাহস করে এগুতে পারবেন। আমরা দু'ভাই, দু'বোন। ছোটভাই ম্যাট্রিক দেবে, বোন ক্লাস এইটে। মা সেলাই করে কিছু উপার্জন করতেন। মোটামুটিভাবে দারিদ্র ঠিক ছিল না। অবশ্য তাই বলে বিলাসী স্বচ্ছলতাও ছিল না। ধুমসে মিটিং মিছিল করে বেড়াচ্ছিলাম। শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন। একেবারে ছাড়া গরু হয়ে গেলাম। মাথায় যত দুষ্ট বুদ্ধি শত্রুপক্ষ অর্থাৎ মুসলিম লীগের লোকদের পেছনে লাগাবার ফন্দি ফিকির করা, এভাবেই হাল্কা উচ্ছ্বাস আর আনন্দে সময় কেটে যাচ্ছিলো। রাজনৈতিক পরিণামের গুরুত্বটা ঠিক অনুধাবন করতে পারি নি। নির্বাচনের পর নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হবেন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবে, আমারও যা হয় একটা গতি হয়ে যাবে। অন্তত হারুন ভাই এমএ পাশ করেছে ইকনমিক্স এ। ও একটা ভালোমত চাকুরি পেলে না হয় ওর গলাতেই ঝুলে পড়বো। এমনই একটা মোটামুটি

হিসাব করে রেখেছিলাম।

কিন্তু ভেবেছিলাম কি, আর হলো কি? ঢাকার ২৫শে মার্চের জুলুম আর অত্যাচার থেকে নারায়ণগঞ্জ দূরে রইলো না। এখানেও অত্যাচার প্রচণ্ড আঘাত করলো। বাড়িঘর ছেড়ে সবাই পালালো, আমরাও বাড়ি ছেড়ে গ্রামে গেলাম। কিন্তু মাসখানেক পরে বুঝলাম যে আগুন থেকে উত্তপ্ত কড়াইয়ে পড়েছি। এখানে মিলিটারি নেই, কিন্তু তাদের দেশীয় দোসররা সব রকম অপকর্মই করে চললো। বাড়িঘর জমি-জমা দখল করবার জন্য মিথ্যা নালিশ জানিয়ে থানা থেকে পুলিশ এনে পুরুষদের ধরে নিলো, মেয়েদের প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করলো এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ বেঁধে নিয়ে দিয়ে এলো সামরিক ঘাঁটিতে। এভাবে এই ময়নাও একদিন জালে ধরা পড়লো। বড় ভাই ও ছোট ভাই দু'জনেই পালিয়েছে। সম্ভবত ভারতেই চলে গেছে। বাবাকে থানায় নিয়ে খুব মার ধর করলো। খবর পেয়ে ছুটে গেলাম আমি ও মা। বাবাকে ছেড়ে দিলো, জামিন রাখলো আমাকে। পাকিস্তানিদের অত্যাচারের দরজায় যখন আমি উৎসর্গীত হলাম তখন আর অনাঘ্রাতা পুষ্প নই। রাজাকারের উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছি। আমাকে গ্রামে রাখলো না, নিয়ে এলো নারায়ণগঞ্জে। খুব আশা ছিল নারায়ণগঞ্জ গেলে পালাতে পারবো। ওখানকার ফাঁক ফোকরও আমার চেনা। কিন্তু না, যে নারয়ণগঞ্জে আমি এলাম তা প্রায় জনমানব শূন্য বিরাণ পুরী। মিলিটারী জিপ ছাড়া অন্য কোনো গাড়ির আওয়াজ নেই। কদাচিৎ রিকশার টুং টাং শোনা যায়। আসলে যে জায়গাটায় আমাকে নিয়ে এলো আমি সাতদিন চেষ্টা করেও এলাকাটা চিনতে পারলাম না। তারপর একদিন সন্ধ্যায় আমাদের জিপে তুললো। এই প্রথম বার আমরা ছ'জন ছিলাম ওখানে। আমাদের চোখ বেঁধে দিলো। বুঝলাম না কোন পথে চলেছি। তবে রাস্তার অবস্থায় মনে হলো ঢাকামুখী যাচ্ছি না, চলেছি অন্যত্র। ভোররাতে এক জায়গায় থামলাম। আমাদের নামিয়ে নেওয়া হলো। চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে ধাক্কা দিয়ে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিলো। চোখ রগড়ে দেখলাম ঘরটা বেশ বড়। আকারে লম্বা। মনে হলো কোনও স্কুল। লাইন করে বেঞ্চ সাজিয়ে কম্বল পেতে বিছানায় শুয়ে আছে আরও কিছু মেয়ে, যারা আগেই এসে সিংহাসন দখল করেছে। একজনের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে জানতে চাইলাম ওটা কোন জায়গা? মেয়েটি খেঁকিয়ে উঠে বললো, চুপ থাক, গলার আওয়াজ শুনলে মেরে ফেলবে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। মনে হলো ভোর হয়ে আসছে। ঘরের জানালা সব পেরেক ঠুকে কাঠ লাগিয়ে বন্ধ করা, তাই আলো অন্ধকার ঠিক বুঝতে পারলাম না। দরজাটা খোলা ছিল, এতোক্ষণে আলো ঢুকলো, জানালার ফাঁক ফোকর দিয়েও আলো দেখা দিল। খুব গরম লাগছিল। এর ভেতর মেয়েগুলো কেমন করে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল তাই ভাবছিলাম। পরে নিজেও অমন থেকেছি। মার খাওয়া কুকুর যেমন ঘরের

দরজায় মরার মতো পড়ে থাকে আবার মার খাবার জন্য, এরাও তাই।

সারারাত ওদের দেহ-মনের ওপর যে অত্যাচার চলেছে তাতে সোজা হয়ে বসবার ক্ষমতা আর থাকে না। সবগুলোরই প্রায় গায়ে জ্বর তাই কম্বল অত্যাবশ্যকীয়। আমার পরের অভিজ্ঞতা আমাকে এসব ব্যাখ্যা দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর তাগড়া রাক্ষুসীর মতো একটা মেয়েলোক ঘরে ঢুকলো। সামনে কুচি দিয়ে শাড়ি পরা এবং সহজেই অনুমেয় জমাদারণী। দু'দিকে দু'টো গোসলখানা দেখিয়ে দিয়ে বললো, যাও, মুখ হাত ধুয়ে আর সব কাজ সেরে এসো। নাশতা লাগাবে বাবুর্চি। সারারাতের ক্লান্তি। বাথরুমে ঢুকে একটাই শান্তি পেলাম যে বাথরুমটা পরিষ্কার। পরে হাসি পেলো, দেহটাই যার নরককুণ্ড তার আবার পরিষ্কার বাথরুম! স্নান করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু শাড়ি ভেজালে পরবো কি? সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। জমাদারণী এসে শাড়িটা নিয়ে গেল এবং ছোটোখাটো একটা লুঙ্গী আমাকে পরতে দিলো। চোখ গরম করে বললো, শব্দ করবি না, সেপাই ডাকবো। গোসলখানার দরজা বন্ধ করা নিষেধ। লজ্জা বিসর্জন দিয়ে গোসল করে লুঙ্গী গেঞ্জি (সেটাও এদের দান) পরে নতুন ময়না বেরিয়ে এলাম। এবার তাকিয়ে দেখলাম কাল আমরা যে ছ'জন এসেছি তাদের বাকি চারজন শাড়ি পরে বসে আছে, একজন গোসলখানায় আর বাকি ছ'জন, হ্যাঁ, ছ'জন যারা তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল তাদের সব লুঙ্গী আর গেঞ্জি পরা। লুঙ্গীর ভেতর রক্ত ময়লা সব জমে আছে। কারণ ওগুলো কেউ ধুয়ে দেয় না। নিজেরা ধুয়ে ভিজেটাই গায়ে শুকাতে হয়।

নাশতা নিয়ে এলো একজন ছোকরা, ওরা বললো, কুক। দু'পিস করে পাউরুটি আর আধা মগ চা নামের একটা পদার্থ। তাই সবাই কি আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছে। সত্যি ক্ষিধেই তো সবচেয়ে বড় স্বাদ। দুপুরের রুটি আর ডাল এল। সন্ধ্যা হতেই ঘ্যাট আর একটা রুটি দিয়ে গেল এবং এবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সারাদিন দরজাটা খোলা ছিল, গেটে দু'পাশে দু'জন সেন্ট্রি। রাতে ঘরের বাতি জ্বলছে কিন্তু কারও মুখ দেখা যায় না। কারণ বুঝতে পারলো ময়না দু'এক দিনের ভেতরই। আপা, আপনারা ঢাকার পথে গণহত্যা দেখেছেন, জগন্নাথ হলে গণকবর দেখেছেন, কিন্তু আমার মতো হতভাগিনীরা দেখেছে গণধর্ষণ, প্রতি রাতে তিনজন চারজন করে একেক জন মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। একজনের অপকীর্তি অন্যেরা উপভোগ করেছে। কুৎসিত অশ্লীল আলাপ করেছে। আমরা ভয়-শঙ্কা অনুভূতি শূন্য চোখে তাকিয়ে থেকেছি। শুধু নিজেদের হৃদয়ের স্পন্দন শুনেছি। টিপ টিপ শব্দ কানেও মনে হয় শুনেছি। কিন্তু আমি মরেও কেন মরছি না। সমস্ত পৃথিবীর ভালো মন্দ কোনও চিন্তাই আমার মাথায় নেই, শুধু এখান থেকে পালাবো কি করে! দিন পনেরো পর আমার মনে হলো আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। রাতে স্বপ্ন দেখলাম বঙ্গবন্ধু ফাঁসির দড়িতে ঝুলছেন। নিজের

গলায় হাত দিয়ে দেখলাম গলা অসম্ভব ব্যথা। বুঝতে পারছি না আমি কি সম্বিত হারাচ্ছি। বাবা-মাকে মনে করতে চেষ্টা করতাম কিন্তু পারতাম না। একদিন সকালে আমি বসে আছি। দরজার কাছে দিয়ে একটা লোক যাচ্ছে। তার কাঁধে একটা লাল গামছা অথবা তোয়ালে আর মাথায় একটা সবুজ টুপি। হঠাৎ জ্ঞান হারা হয়ে 'জয় বাংলা' চিৎকার করে ঘর থেকে ছুটে বেরুলাম। দু'চারটে গুলির শব্দও কানে শুনেছিলাম। হঠাৎ মনে হলো পায়ে লাঠির বাড়ি পড়লো, এর পরে মাথায় প্রচণ্ড আঘাতে আমি পড়ে গেলাম। আসলে আপা আমিতো মরতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যে কোনও একটা অপরাধে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে, এ যন্ত্রণার দায় থেকে মুক্তি পাবো।

চোখ খুলে দেখলাম আমি একটা ছোট ঘরে খাটে শুয়ে আছি। পাশে আরেকটা খাট একটু দূরে শাদা কাপড় পরা সম্ভবত পুরুষ নার্স, যাকে আমরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বলতাম ব্রাদার, খুব নিবিষ্ট মনে কি যেন পড়ছে। মাথা কাত করতে গেলাম পারলাম না। অসহ্য যন্ত্রণা। অস্ফুট শব্দ শুনে লোকটি দৌড়ে আমার কাছে এলো, বললো, যাক আপনার জ্ঞান ফিরে এসেছে। অতি কষ্টে বললাম, আপনি বাঙালি, এখানে কেন? আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, চুপ বাইরে সেন্ট্রি, দেওয়ালেরও কান আছে। আপনার বাঁ পায়ের দুটো হাড় ভেঙে গেছে, প্লাস্টার করা হয়েছে। তিন সপ্তাহ পর খোলা হবে। আস্তে করে বললাম, তাহলে আরও তিন সপ্তাহ আমাকে ওরা বাঁচিয়ে রাখবে। আমার মুখে হাত চেপে দিয়ে উনি দ্রুত গিয়ে নিজের জায়গায় বসলেন। আমি চোখ বুজলাম। কে যেন ঘরে ঢুকলো। জিজ্ঞেস করলো আমার জ্ঞান ফিরেছে কিনা। আশ্চর্য লোকটি কিন্তু মিথ্যা কথা বললো না। বললো, একটু আগে তাকিয়ে ছিল। হয়তো বা জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু আমি ওকে ডিসটার্ব করি নি। ভালো করেছো। ঠিক মতো অবজার্ভ করো। হেড ইনজুরি তো যে কোনও সময় খারাপ দিকে টার্ন নিতে পারে। চোখ বুজে ওদের সব কথা শুনছিলাম। আশ্চর্য হলাম ওরাই কি রাতে আমাদের ওই ঘরে যায়? মানুষ কি এক সঙ্গে দেবতা আর দানব হতে পারে। হয়তো পারে, জীবনে অনেক কিছুই তো জানতাম না। কিন্তু এখন জেনে লাভ! এ অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে আমি যাবো কোথায়?

পরদিন সকালে রোদে ঘর ভরে গেল। একজন মহিলা নার্স এলেন। আমার জ্ঞান ফিরেছে দেখে খুশি হলেন। ইনি অবশ্য অবাঙালি, উর্দু শুনে মনে হলো বিহারী। আমার মুখ পরিষ্কার করে আমাকে দুধে রুটি ভিজিয়ে খাওয়ালেন এবং পরে ওষুধ খাওয়ালেন। আমি উর্দু বলতে পারি না, তাই আমার ইংরেজির বিদ্যা দিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম আমার কি হয়েছে? আমার মুখে ইংরেজি শুনে নার্স তো গদগদ বললো, বহিন, বেশি কথা বলো না। তোমার একটা পা ভেঙেছে। ওটা ঠিক হয়ে

গেলেই তুমি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে; অথবা নর্মাল লাইফ পাবে। হায়রে নর্মাল লাইফ! ডাক্তার একজন হলো কর্ণেল। খুবই ভদ্র এবং মৃদুভাষী। আমার সঙ্গে ইংরেজিতেই আলাপ করতেন। অসুখের বাইরে আর কোনও অতিরিক্ত কথা তিনি বলতেন না। একদিন ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন তুমি সেদিন অমন আচরণ করেছিলে কেন? আমি তার চোখে চোখ রেখে বললাম, ডাক্তার আমি মরতে চেয়েছিলাম। মুক্তি চেয়েছিলাম। ডাক্তার আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি ভয় পেয়ো না। তোমরা মুক্তি পাবে। তোমরা শব্দটির উপর অতিরিক্ত জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন। ভয় হলো সম্ভবত আমার মুখ থেকে কিছু কথা বের করতে চান। কে জানে, ময়না এখন কাউকে বিশ্বাস করে না তবে একথা ঠিক একটা শয়তানের সঙ্গে এক একটা ভালো মানুষ সে দেখেছে। তবে ওদের বেশির ভাগই পাঠান অথবা সিন্ধি। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ওর চোখে পড়ে নি। অবশ্য অতো সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করবার মন মানসিকতা, পরিবেশ কি তার ছিল? হাসপাতালে থাকতে তার দরজা জানালা খোলা থাকতো। জানালার কাছেই একটা পেয়ারা গাছ ছিল, তার পাশেই নিমগাছ। নিমের পাতায় দোলা খেয়ে ঝিরঝিরে হাওয়া আসতো তার ঘরে। পাতার রঙ দেখে মনে হতো আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস। লালচে হলুদ রঙ ধরেছে পাতাগুলোয়। পেয়ারা গাছে কাক শালিক অনেক পাখি বসতো। সারাদিন খুঁটে খুঁটে খেতো।

হঠাৎ করে পাশের বেডে একজন রোগী এলো। সে হেঁটে বেড়াতে পারে কিন্তু তাকে বিছানা থেকে নামতে দেওয়া হয় না। মেয়েটি আমার চেয়েও বয়সে ছোট। খুব বেশি হলে বছর ষোলো হবে। মুখখানা শুকনো ম্লান। আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইতো কিন্তু নার্সদের ভয়ে দু'জনই কাঠ হয়ে থাকতাম। একদিন মেয়েটাকে নিয়ে গেল। ডাক্তার আমাকে বললো ভালো চিকিৎসার জন্য ওকে ঢাকা পাঠানো হয়েছে। ভাবি ওর কতো সৌভাগ্য। তিনদিন এখানে থেকেই ঢাকা যেতে পারলো আর আমি তো প্রায় দু'মাস এখানে পড়ে আছি। সকাল বিকাল সিস্টারের হাত ধরে ধরে হাঁটি। ওরা অবশ্য আশা করেন মাসখানেকের ভেতর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হবো পায়ের দিক দিয়ে। তারপর আমাকে ঢাকায় নেবে। সত্যি নিয়েও এলো। কিন্তু আসবার আগেই ওই ব্রাদারের কাছে শুনলাম ওই মেয়েটির টিবি হয়েছিল। তাই ওকে দূরে বিরান জায়গায় নিয়ে গুলী করে মেরে ফেলেছে। বললাম, তাহলে আমাকে মারছে না কেন? তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ে তোমাকে ওরা অন্যভাবে ব্যবহার করবে বলে তোমাকে বাঁচাচ্ছে। আমার মুখ দিয়ে শুধু 'আল্লাহ' আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। বললাম, আপনি পালান না কেন? সে চেষ্টা করলে পেছন থেকে গুলি করবে। ওদের প্রয়োজন শেষ হলেই মেরে রেখে যাবে, আর তা না হলে মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রাণ যাবে। বলেই

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে ব্রাদার দরজাতেই থেমে দাড়ালো। এর দিন পনেরো পর আমাকে ঢাকায় নিয়ে এলো চিকিৎসার জন্য। পা ভালো হয়ে গেছে। আমাকে নার্সদের কোয়ার্টারে রেখেছে। এতোদিনে আমার ডাক এলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ্ থেকে।

সকাল সাড়ে আটটা। এখানে এসেই শাড়ি ব্লাউজ পেয়েছি। নতুন পুরোনো জানি না তবে লজ্জা ঢেকেছে। ডাক পড়লো। বিশাল বপু এক ভদ্রলোক কাঁধে বুকে সব নানা কিসিমের ক্লিপ আটকানো। স্লামালায়কুম স্যার। মনে হলো নিজের গলার স্বর নিজেই শুনতে পেলাম না। তিনি মাথা নেড়ে আমাকে বসতে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন ইংরেজি জানি কিনা। হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম। তারপর বললেন তোমাকে একটা খুব গোপনীয় কাজের দায়িত্ব দেবো। আমার এখানে কয়েকজন অফিসার আছে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে তুমি আমাকে রিপোর্ট দেবে। আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম। বললাম, আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন কেন? আমি তোমার সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করেছি। সাহস করে বললাম, তাদের সম্পর্কে কি ধরনের অভিযোগ আনা যাবে? ও ভালো কথা মুখ্যত তারা স্থানীয় বেঈমানের সঙ্গে যোগাযোগ বা ওঠা বসা করে কিনা। করলে তাদের উদ্দেশ্য কি, আশা করি আমার কথাগুলো বুঝেছো। ঘাড় নেড়ে বললাম, ওই সব অফিসারদের লিস্ট আমাকে দিন। এবার চোখ ছোট করে বললেন, পরে দেওয়া হবে। তাহলে কাজও তো আমি তখন থেকেই আরম্ভ করবো। না কাজ আজ থেকেই শুরু করবে। তোমাকে বিস্তারিত জানানো হবে। এসো, আবার দেখা হবে। মনে হলো ঘর থেকে আমি হেঁটে এগুতে পারছি না। আমার সমস্ত শরীর যেন থর থর করে কাঁপছে। আমি বুঝলাম এ সব অর্থহীন কথা, আমার আরও কোনো বড় সর্বনাশ অপেক্ষা করে আছে। সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে ছিলো। আমাকে যথাস্থানে পৌছে দিলো। ঘরে ঢুকে মনে হলো আমার মাথা ব্যথা করছে জ্বর আসছে একজন সিস্টারকে বলতে সে হাসপাতালে নিয়ে গেল। হ্যাঁ আমার জ্বর এসেছে, ডাক্তার মাথায় এক্সরে করতে বললেন। কিন্তু সব কিছু করে আমাকে আমার জায়গায় ফেরত দিয়ে গেল। সারাদিন শুধু ছটফট করলাম। রাত দশটায় আমার ডাক এলো। ওই বিশাল বপু হাসি মুখে আমাকে অভ্যর্থনা করলো। আমাকে ওর ভালো লেগেছে। সকালে যেসব আলাপ করেছে তা ভুলে যেতে হুকুম করলেন। তারপর দীর্ঘদিন পর আমি আবার পশুর ভোগে লাগলাম। কিন্তু লোকটাকে খুব স্বাভাবিক মনে হলো না। কেমন যেন বিব্রত, অন্যমনস্ক। হঠাৎ আমাকে একটা ধমক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলো। ফিরবার সময় লক্ষ্য করলাম সবাই খুব সন্ত্রস্ত। কোথা থেকে যেন যন্ত্রণা সূচক চিৎকার আসছে। মনে হয় কাউকে মারধর করা হচ্ছে। পরে দেখেছি ওসব টর্চার চেম্বার। কি বীভৎস আমারও তো ওখানে শেষ

হবার কথা ছিল। চারিদিকে তখন কেমন যেন ফিস ফিস আর ব্যস্ততা।

শারীরিক যন্ত্রণা, ক্লান্তি ও মনোকষ্টে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। সাইরেন বেজে উঠলো। চেঁচামেচিতে আর সিস্টারদের কথায় বুঝলাম ইন্ডিয়ানরা বোমা ফেলছে আর নিচের থেকে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট্ ছোড়া হচ্ছে। আমার ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি উঠে গেল। দুদাঁতের পাটিতে যেন করতাল বাজছে। সিস্টাররা নেই সব শেল্টারে গেছে। বোকার মতো আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি মরলেই-বা কি আর বাঁচলেই-বা কি? আবার সাইরেন বাজলো, একে একে সব জায়গায় ফিরে এলো। পরদিন আরও ব্যস্ততা। শুধু ট্রাক আর জিপের আওয়াজ। আমি ঘরেই বন্ধ তবে কেউ কিছু আর বলে না। কোনো কর্মের নির্দেশও এলো না। এতোক্ষণে বুঝলাম কর্মকর্তা সে দিন আমাকে ডেকে কেন পছন্দ করলেন। তারপর তিন-চার দিন এরকম হলো। নির্যাতনের চিৎকারও আসে না; সিস্টাররা শুধু বলাবলি করছে মুক্তি বাহিনী ওদের মেরে ফেলবে। একজন আমার দু'হাত ধরে বললো বহিন, আমরা তো সাধ্যমত তোমার খেদমত করেছি, তুমি আমাদের বাঁচাও। হেসে বললাম, আমিও তো এখন তোমাদের একজন, আমাকে বাঁচাবে কে? আমাকে পেলেও ওরা তোমাদের যা করবে আমার তাই-ই করবে। যে সেন্ট্রি সব সময় রক্তচক্ষু করে তাকাতো, তুই তোকারি ছাড়া কথা বলতো না আজ সকালে দেখি এক সিস্টারের হাত ধরে বলছে ওর দেশে জরু আছে বাল বাচ্চা আছে, ও মরে গেলে তাদের কি হবে। ইচ্ছে হচ্ছিল জোরে হেসে উঠি। শুয়োরের বাচ্চা আমার আব্বা আম্মার কি হয়েছে, কি করেছিস তোরা জানিস না? আমাদের যা করেছিস তোদের শাস্তি হবে তার চেয়েও হাজার গুণ, কুত্তার বাচ্চারা। আজ সবার কথা মনে পড়লো। হয়ত বা বেঁচে যেতে পারি। আবার সবার সঙ্গে দেখা হবে-কি সব ভাবছি আমি, তারাই কি আর বেঁচে আছে। কেউ কোনও কাজ যেন করে না, নিয়ম রক্ষা করে চলেছে। ডাল চাপাতিও পড়ে থাকে। দু'চার জন বাঙালি যারা আছে তাদের মুখ শুকিয়েছে এদের চেয়েও বেশি। এতোদিন দেখলে নাক সিটকাতো। এখন বলে, আপা ভালো আছেন তো? এই তো ছাড়া পেয়ে যাবেন। দেশ স্বাধীন হয়ে গেল বলে। আপনি রেডিও শুনতে পান না। আজ কালের মধ্যেই এরা আত্মসমর্পণ করবে। বন্দি শিবিরে বসে শুনলাম বাইরের আওয়াজ 'জয় বাংলা'; এরা কারা? কারা এ স্লোগান দিচ্ছে? কিন্তু এদের সবার হাতে তো অস্ত্র, এরা কেন ওদের গুলি করে মেরে ফেলছে না। ময়না কিছু বুঝতে পারে না। শেষ পর্যন্ত শুনতে পেলো আজ বিকেল ৪টায় পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করবে। তারপর ও মুক্ত। মুক্ত? কিন্তু কিসের থেকে মুক্তি, যে পাশবিক পরিস্থিতির পথ বেয়ে সে এখানে এসে পৌঁছেছে সে জীবন থেকে তাকে মুক্তি দেবে কে? সে যাবেই বা কোথায়? সত্যিই সন্ধ্যায় বাংলা ও হিন্দীতে জানানো

হলো বাঙালি যারা আটক আছেন তারা নিজের নিজের বাড়িতে চলে যেতে পারেন। কেউ বাধা দেবে না। দৌড়ে বেরুলাম। পথ-ঘাট কিছু চিনি না বড় রাস্তা ধরে দৌড়োচ্ছি। আমার মতো আরো লোক দেখলাম। একজনকে বললাম ভাই শহরে যাবার পথ কোন দিকে। দেখিয়ে দিলো, সেও পালাচ্ছে। রাজাকার ছিল, এখন সবার সঙ্গে না মিশে গেলে মুক্তিবাহিনীরা গুলি করে মারবে।

এক সময় বুঝলাম আর্মি সেনানিবাসের বাইরে এসে গেছি, আর দৌড়োবার দরকার নেই। কিন্তু আমি তো যাবো চাষাড়া, কোন পথে বাস যায়। কতো বাসে করে ঢাকায় এসেছি মিটিং মিছিল করতে। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সেই বক্তৃতা। ময়নার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো। হঠাৎ থেমে গেল ময়না, সেতো মুক্তি পেয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন কি? রাস্তায় একজনকে জিজ্ঞেস করলো বঙ্গবন্ধু কোথায়? লোকটা ওর দিকে এমন করে তাকালো মনে হলো সে পাগল। বুঝলো এভাবে যাকে তাকে সব কিছু বলা ঠিক হচ্ছে না। দেশতো বদলে গেছে, মানুষের আচার আচরণ তো বদলেছেই। শরীর ক্লান্ত, উত্তেজনায় হেঁটে চলেছে। কিছু দূরে গিয়ে সে চেনা পথ পেলো। কোনও রকমে নারায়ণগঞ্জের বাসে সে চড়ে বসলো। সত্যিই সে চাষাড়া যাচ্ছে? বাস ছেড়ে দিলো। হঠাৎ মনে হলো তার কাছে তো একটা পয়সাও নেই। যদি অপমান করে নামিয়ে দেয়। আব্বার নাম বলবে। হাতে পায়ে ধরবে। তবে সত্যি কথা বলা যাবে না। সিস্টারদের কথা মনে পড়লো, মুক্তিবাহিনী যদি মেরে ফেলে। রাস্তা লোকে লোকারণ্য। স্টেনগান থেকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে মুক্তিবাহিনীরা চলেছে, সঙ্গে দু'চারজন হ্যাঁ ভারতীয় সৈন্য ওদের গলায় ফুলের মালা। ওরা চিৎকার করেছে 'জয় বাংলা', ময়নাও বাসের ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠলো 'জয় বাংলা'। বাসের সব মানুষ ওর দেখা দেখি চেঁচিয়ে উঠলো 'জয় বাংলা'। ও কনডাক্টরকে ডেকে বললো ওর পয়সা নেই। কনডাক্টর হেসে বললো, ঠিক আছে আপা, দ্যাশ স্বাধীন অইছে। হগগল কিছুই স্বাধীন। আমারে আরেক দিন দিয়া দিয়েন।

বাড়ির কাছে নেমে দৌড়ে গলিতে ঢুকে দেখলো দরজায় তালা। কিন্তু ঠেলতেই খুলে গেল। ভেতরে ঘন অন্ধকার, চারদিকে সব ছড়ানো ছিটানো। তবে কি ওরা আব্বা আম্মাকে মেরে ফেলেছে। এখন তো রাত। এতোক্ষণে মনে হলো ওর পরনে লুঙ্গী। দরজা বন্ধ করে আস্তে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে সামনে মেঝেতে শুয়ে পড়লো। সকালেই সে কাপড় বদলে সালাম চাচার দোকানে গেল। সালাম চাচা দোকান খুলেছে। তবে জিনিসপত্র নেই। ময়নাকে দেখে বললো, এসে গেছিস তোরা? কি চেহারা হয়েছে তোর। ময়না বললো, চাচা, আমাকে পাঁচটা টাকা দেবেন। আব্বা এলে দিয়ে যাবো। নিয়ে যা, বাবা এলেই দেখা করতে বলিস। মাথা নেড়ে ময়না

আরেকটু এগিয়ে গেল। ডালপুরীর দোকানও খুলেছে। চারটে ডালপুরী এনে বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। পানির একটা জগ আর গ্লাস ভালো করে ধুয়ে পেট ভরে পুরী চারটে খেয়ে প্রাণভরে পানি খেলো। বাবা-মার শোবার ঘরটা ঝেড়ে ঝুড়ে আলমারি খুলে পুরোনো ফেলে যাওয়া চাদর বের করে বিছানা করে ময়না ঘুমিয়ে পড়লো। দরজায় ধাক্কা ধাক্কিতে ঘুম ভেঙে গেল। দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কে? আরে আমি দরজা খোল। আব্বা দাঁড়িয়ে। ময়নাকে দেখে প্রথম দু'পা পিছিয়ে গেলেন তারপর ময়না বলে চিৎকার দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। আব্বাকে ভেতরে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিলো ময়না। ঘর দোরের অবস্থা দেখে চোখ মুছে বললেন, কোনো ভয় নেই, তুই ফিরে এসেছিস, খোকা খবর পাঠিয়েছে আবার সব হবে। তোর মুখ শুকনো কিছুই তো জানি না। ময়না সালাম চাচার কাছ থেকে যে টাকা এনেছে তা আব্বার হাতে দিয়ে সব ঘটনা বললো। মাথা নিচু করে বললো আমি যে এখানে একা এসেছি এ কথা তুমি বাড়িতে বলো না। বোলো আমি আগে তোমার সঙ্গে এসেছি, আম্মারা পরে আসবে। আব্বা বললো, তুই দরজা বন্ধ করে থাক। আমি দু'টো লোক ডেকে আনি বাড়িঘর পরিষ্কার করার জন্য, আর আমাদের দু'জনের জন্য খাবারও নিয়ে আসি। বাবা বাল্বও কিনে আনলেন। সন্ধ্যা নাগাদ সবকিছু এক রকম গোছানো হলো। আব্বা বললেন, তোর আম্মা আমার জন্য খুব চিন্তা করবেন। কারণ কথা ছিল বিকেলে ফিরে ওদের নিয়ে আসবো। কিন্তু তোকে একা রেখে যাবো না। কাল সকালে নাশ্‌তা খেয়ে চলে যাবো। দু'টা নাগাদ ফিরে আসবো। সকালটুকু একা থাকতে পারবি না মা? বাবার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠলো ময়না। আব্বা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে তার সবটুকু কষ্টই যেন নিজের বুকে টেনে নিলেন। রাতে ডালভাত আর আলুসেদ্ধ দিয়ে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলো দু'জনে। তারপর মায়ের আর তার ছোট বোন চায়নার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে যখন জেগেছে সারাবাড়ি তখন রোদে ভরে গেছে। আব্বা শোবার ঘরে নেই। গোসলখানা থেকে পানির শব্দ আসছে। সম্ভবত গোসল করছেন। ওহো আব্বা তো সকালেই আম্মাকে আনতে যাবেন। মুখ হাত ধুয়ে নিলো ময়না। আব্বা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাশতা আনতে গেলেন। আজ সালামের দোকানের পুরী আর ভাজি। ময়নার পেটে যেন রাক্ষস ঢুকেছে। খেয়েই চলছে। আঃ আর কোনও দিন নিজেদের ঘরে বসে খাবে এ কথা তো সে কল্পনাও করে নি। ভাবতে গেলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আব্বা ওকে যে কেউ এলে দরজা না খুলতে বলে সতর্ক করে দিয়ে দুটোর ভেতরেই ফিরে আসবেন বলে গেলেন। ময়না ঘুরে ঘুরে ঘরের টুকি টাকি জিনিসপত্র গোছাতে লাগলো। ওর বেশ কিছু পুরোনো সালোয়ার কামিজ পেলো।

এগুলো আর কষ্ট করে লুট করে নি। ভাগ্যিস আব্বার ডিসপেনসারী ঘরটায় হাত দেয় নি। ওষুধের বাক্সগুলো ঝেড়ে মুছে গুছিয়ে রাখলো ময়না। কাল থেকেই আব্বা চেম্বার খুলতে পারবেন। এবার ওর বিএ পরীক্ষাটা দিতে হবে এবং একটা চাকুরিও যোগাড় করতে হবে। কারণ এ ধাক্কার পর আব্বার নতুন করে জীবন শুরু করতে বেশ কষ্ট হবে। তারপর ভাইয়া এলে আস্তে আস্তে তার ঘটনাটা লোক জানাজানি হবে। তখন আব্বাকে কি সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হবে তা ময়না ভাবতেও চায় না। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলো ময়না। এতো ঘুম কোত্থেকে আসছে সে ভেবে পায় না। উঃ না সে আর ভবিষ্যতের কথা ভাববে না। যে কটা দিন থাকবে বাবা-মায়ের বুকে থেকে একটু শান্তি পেয়ে যাক। সে বাইরে বেরুবে না। কারও সামনে যাবে না। কারণ এ ছোট জায়গায় কি সেই ঘৃণিত সংবাদ এসে পৌছোয় নি? যারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সেইদিন থানায় যারা তাকে হাজতে ঢুকিয়ে দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফিরে এসেছিল তারা কি এ বিজয় গৌরবের কথা এখানকার লোকজনকে বলেনি? তবে সালাম চাচা কিছু জানে না মনে হলো। ডালপুরী ওয়ালাও তো স্বাভাবিক ব্যবহার করলো। তাহলে ওই শয়তানদের কি মুক্তিবাহিনী মেরে ফেলেছে। হতেও তো পারে। আব্বা ডিম এনে রেখে গেছেন। হাতড়ে হাতড়ে সামান্য মসলা পাওয়া গেল। ও ভাত-ডাল আর ডিমের তরকারি রান্না করে রাখলো। এতো বেলায় সবাই কি প্রচণ্ড খিদে নিয়েই না আসবে।

দরজায় কড়া নড়লো, চায়নার গলা পেলো ময়না; দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। চায়না চিৎকার করে ময়নাকে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু মায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো ময়না। মা কঙ্কালসার হয়ে গেছে, মুখের ওপর যেন কেউ কালি লেপে দিয়েছে। মা চিৎকার করে উঠলো 'ময়না'। মা তার হাতের ওপর ঢলে পড়লেন। মুখে চোখে পানি দিয়ে মাকে সুস্থ করা হলো। অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে ময়নার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। যেন চিনতে পারছেন না, অস্ফুটে বললো, ময়না, আমার ময়না। ময়না ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ধীরে সুস্থে সবাই স্বাভাবিক হয়ে এলো। পাঁচদিন পর বড় ভাইয়া ফিরে এলো কিন্তু একা, মন্টু আসে নি। ও অসুস্থ, হাসপাতালে আছে। ওর একটা হাতে স্প্লিন্টার লেগেছিল, ওটা অপারেশন হয়েছে। ওকে আরও দু'সপ্তাহ কোলকাতায় থাকতে হবে। সব খবর শোনা হলো। মন্টুটা থাকলে কতো আনন্দ হতো। ওর বাঁ হাতটায় কিছুটা খুঁত হয়ে গেছে। অবশ্য ওর কাজ কর্মে কোনও অসুবিধা হবে না। ভালো হাসপাতালে আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হলেই চলে আসবে। মাঝে একবার বড় ভাই যাবে। কিন্তু তার আগে চাকুরিতে জয়েন করতে হবে। টাকা পয়সা দরকার। আব্বার অবস্থা তো বুঝতেই পারছো। তাছাড়া ময়নার ব্যাপারটা এতো সহজে নিষ্পত্তি হবে না। লোকজন সবে

আসতে শুরু করেছে। ঘটনাটা ঘটেছিল থানায়; সুতরাং সেখানে তামাসা দেখবার লোকেরও অভাব হয় নি। ঠিক আছে এখন তো আর পেছন পেছন পাকআর্মি তাড়া করছে না। ধীরে সুস্থে ভেবে-চিন্তে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। তার আগে ওর বিএ পরীক্ষাটা দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। ঘরের জিনিসপত্র সব লুট হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে সেগুলোও কিনতে হবে। একা তো, সব দায় দায়িত্বই তার। চায়নাকে স্কুলে পাঠাতে হবে। মন্টু এলে আবার কলেজে যাবে। মা তো শুধু বলে, খাই না খাই কি আসে যায়, আল্লাহ্ তো আমাদের জানগুলো রেখেছেন। ময়নাও তাই ভাবে বেঁচে আছি বলে নানা সুবিধা অসুবিধার বায়নাক্কা। আর যদি এর ভেতরে একজন ফিরতে না পারতো? সত্যিই এর চেয়ে বড় সত্য হয় না। তাইতো আমাদের দেশে বলে, বসতে পারলে শুতে চায়।

এভাবে প্রায় এক মাস কেটে গেল। ছোটভাই মন্টু ফিরে এলো। বাঁ হাতের কব্জিটা নেই, ফেলে দিতে হয়েছে। আম্মার এক দফা কান্নাকাটি সুখের ও দুঃখের মিশ্র অনুভূতি। মন্টু প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। নিঃসন্দেহে সুখের আর হাতখানা গেল সে দুঃখ তো কম না। সংসারে কিছু অনটন বোঝা যায়। কারণ আব্বার প্র্যাকটিস আগের মতো নেই। দশ মাসের অত্যাচারে আর অর্থাভাবে মানুষ মরলেও আর চিকিৎসা করাতে পারছে না। বড় ভাইয়ের মিলের অবস্থা ভালো না। ক্ষমতাসীনরা বাড়ির আসবাবপত্র থেকে আরম্ভ করে মিলের যন্ত্রপাতি পর্যন্ত সরাতে শুরু করেছে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ নেতৃত্বের লোভে রাজনীতির নামে সেখানে হচ্ছে প্রচণ্ড দলাদলি আর যারা সুযোগ সন্ধানী পাকিস্তানি (মনে প্রাণে) তারা ইন্ধন যোগাচ্ছেন তাতে। সুতরাং বড় ভাই চাকুরি খুঁজছে। অস্বস্তি লাগে ময়নার। সে তো যে কোনও একটা প্রাইমারি স্কুলেও তিন চার'শ টাকা মাইনের একটা কাজ করতে পারে। আচ্ছা নার্সিং-এর ট্রেনিং-এ ঢুকলে কেমন হয়? কিন্তু সেখানেও তো সে এখনই নগদ টাকা আব্বাকে এনে দিতে পারবে না। এমন যখন পারিবারিক অবস্থা তখনই ঘটনাটা ঘটলো। নিরুপায় আব্বা হারুণের আব্বার কাছে গিয়েছিলেন। ময়না আর হারুনের সম্পর্কটা দু'পরিবারই বুঝতো। এর শেষ কোথায় তাও তারা স্থির করে রেখেছিলেন। সেই আশায় বুক বেঁধে ময়নার আব্বা গিয়েছিলেন হারুনের বাবার কাছে যদি এখন তারা বিয়েটা দিতেন। কার হারুন ঢাকায় একটা বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থায় ভালো চাকুরি পেয়েছে। হারুনের আব্বা ময়নার আব্বাকে যতোদূর পারা যায় কথা শুনিয়েই ক্ষান্ত হন নি, রীতিমতো অপমান করে চলে যেতে বলেছেন। আব্বা শিশুর মতো কাঁদছেন; ময়না কিছু বুঝবার বা জানবার আগেই আম্মা ছুটে এসে তার দু'গালে কয়েকটা চড় বসিয়ে দিলেন। রাগে কথা বলতে পারছেন না, চিবিয়ে বললো, ফিরে এলি কেন? যে নরকে

গিয়েছিলি সেখানেই থাকতে পারলি না? ওরা এতো লোক মেরেছে, তোকে চোখে দেখলো না? কোন সাহসে ওই পাপদেহ নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছিস বল? বল? আব্বা দৌড়ে এসে আম্মাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, এ তুমি কি করছো? জানো না কি দাম দিয়ে তোমরা আমাকে পেয়েছো? ধিক্কার আমাকে। ও মান দিয়ে আমাকে বাঁচালো আর আমি কিছু করতে পারলাম না ওর জন্যে। তুমি, তুমি কেমন করে ওর গায়ে হাত দিলে ময়নার মা? এবার আম্মা আমার ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন, ক্রমাগত চিৎকার করছেন মা, মাগো তোর এই হতভাগী মাকে ক্ষমা করে দে। আমি পাথর হয়ে গেছি। ছোটবেলা থেকে কতো দুষ্টুমি করেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত মনে পড়ে না আব্বা-আম্মা কেউ কখনো ভুলেও আমার গায়ে হাত দিয়েছেন। আমার সমস্ত দেহটা জ্বলে যাচ্ছে। আঘাতের দুঃখে নয়, অকারণ আপমানে। আমি তো আব্বার জন্যেই থানায় গিয়েছিলাম। আব্বা ছাড়া পেলেন আমি বন্দি হলাম। আর সে কারণে আম্মা আমাকে মরতে বলছেন। অথচ আমি ফিরে এলে ওরা যে খুশি হয়েছিলেন তাও তো মিথ্যে নয়। মায়ের হাত থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত করে নিলাম। ততোক্ষণে বড়ভাই ফিরে এসেছে। সব কিছু শুনে বাবাকে অনুযোগ করলো, তুমি আমাকে বা ময়নাকে না জানিয়ে এ কাজ করতে গিয়েছিলে কেন? তোমার মনে হয় বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আমি সোজা গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। না, আর না। এ বাড়ির অন্ন এবং আশ্রয় দুই-ই আমার উঠে গেছে। ভোরবেলা কেউ ওঠবার আগে ছোট একটা ব্যাগে সামান্য কিছু কাপড়-জামা, ছোট ব্রাশ, তোয়ালে নিয়ে ঘর ছাড়লাম। বড় ভাইকে একটা চিঠি লিখে এলাম। সম্মানজনক আশ্রয় পেলে ওদের জানাবো। আব্বা আম্মাকে সালাম জানিও। আমার খোঁজ করো না। এসে সোজা উঠলাম নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে, ধানমণ্ডীতে। কিছুদিন ধরে কাগজে এ প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পরিচিতি বেরুচ্ছিল।

সাড়ে আটটা থেকে ন'টার ভেতর অফিসে পৌঁছোলাম। ওখানকার অফিসার সুন্দর মতো মধ্য বয়সী এক মহিলা। পরে নাম জেনেছি মোসফেকা মাহমুদ। তিনি সব শুনে বললেন—তোমার আব্বা-আম্মা আছেন তোমাকে আশ্রয় দিতে চান, তবুও কেন তুমি চলে আসতে চাও? আমি তাঁকে সব খুলে বলেছিলাম। ঠিক এ সময় আপা আপনি ওখানে ঢুকলেন। আমি থেমে গেলাম। মোসফেকা আপা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ওঁর সামনে বলতে পারো উনি আমাদের আপা। পরে আপা আপনার নামই শুধু জানলাম না। যখন আপনি, বাসন্তী আপা, জেরিনা আপা, নূরজাহান আপা আমাদের কাছে আসতেন, নিজেদের কথা বলার ছলে আমাদের কথা জেনে নিতেন। আমি আপাতত ওখানে আশ্রয় পেলাম। ওরাই খোঁজ করে চাকুরি দেবেন এবং তখন আমি হোস্টেলে চলে যাবো

মাস খানেকের ভেতর আমি একটা সাহায্য সংস্থায় কাজ পেলাম। বলতে গেলে কনিষ্ঠ কেরানির পদ। কিন্তু আমার জন্য ওটা আশাতীত। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে বাবাকে দু'শ টাকা পাঠালাম। রশিদ এলে বুঝলাম বাবা টাকা পেয়েছেন। পরে একটা চিঠি দিয়ে সব জানালাম। আমি ভালো আছি, সুখে আছি, আবার পড়াশুনা শুরু করেছি ইত্যাদি। মনে হলো আব্বা বেঁচে গেছেন। খুব সুন্দর চিঠি লিখেছেন। বাড়ি যেতে বলেছেন ছুটিতে। এই হোস্টেলে থাকবার সময় জেরিনা আপার কাছ থেকে যে স্নেহ আর উপদেশ পেয়েছি তা কখনও ভুলবো না আপা। ওঁর মৃত্যুর সময় আমি দেশে ছিলাম না, তাই শেষ দেখাটুকু দেখতে পারি নি। উনি আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে খুব মন খুলে আলাপ করতেন এবং বলা বাহুল্য অধিকাংশ আলোচনাই আমার সম্পর্কে।

আমার বিএ পরীক্ষার ফল বেরুলো। ভালো করলাম। চাকুরিতে উন্নতি হলো। একেবারে শক্ত হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করলাম। হারুন নাকি প্রায়ই ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করে আমার ঠিকানা জানতে চায়। ওর বাবার ব্যবহারের জন্য বার বার ক্ষমা চেয়েছেন ভাইয়ার কাছে। আমি গায়ে লাগাই নি। এখন আমার কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই অতএব ওকে একটু নাড়া দেওয়া যেতে পারে। গাইড দেখে ওর অফিসের ফোন নম্বর বের করলাম। হারুন-উর রশিদকে চাইতেই পেয়ে গেলাম। মনে হলো পদমর্যাদা আছে। হ্যালো বলতেই ও চমকে উঠলো। বললো, কে? কে বলছেন? গলা শক্ত করে বললাম, আমি। এক সময় কোনও কালে আপনি আমাকে চিনতেন। নরম গলায় বললো, ময়না, কোত্থেকে বলছো? নাম ঠিকানা, ফোন নাম্বার সব দিয়ে শনিবার আমার সঙ্গে হোস্টেলে দেখা করতে আসতে বললাম। ও ঠিক সময় মতো এলো। আমাদের উল্টো দিকেই একটা চাইনীজ রেঁস্তোরা ছিল ওখানে গিয়ে বসলাম কথা কারও শেষ হয় না। পর দিনের প্রোগ্রাম করে সেদিন দু'জনেই চোখের জলে বিদায় নিলাম। এ কথা সত্যি আমি হারুনকে ভালোবাসতাম। প্রেম চেতনার প্রথম মুহূর্ত থেকে বধূবেশে ওর ঘরে যাবো-এ আমার স্বপ্ন ছিল না, ছিল বাস্তব সত্য। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, মনে হয়েছিল ওকে পাবার অধিকারও আমি হারিয়েছি কিন্তু ওর বাবার ব্যবহার আমাকে প্রতিহিংসার পথে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম আমার বাবার অপমানের প্রতিশোধ নেবো। হ্যাঁ আমি বীরাঙ্গনা, যুদ্ধ করে এসেছি। আমার শেষ জয় পরাজয় হারুন তোমার আব্বার সঙ্গে যুদ্ধের পরিণতি। পরদিন হারুন এলো সন্ধ্যায় ঠিক নির্ধারিত সময়ে বাইরে উদার আকাশ আর কেমন যেনো স্নেহ কোমল স্পর্শ বাতাস বইছে। ময়না বললো, চলো, আজ বাইরে কোথাও গিয়ে বসি। রেঁস্তোরায় বসতে ভালো লাগছে না। হারুনের একটু অসুবিধা, সে নিজে অফিসের গাড়ি চালায় না।

তাই ড্রাইভারের সামনে ময়নাকে নিয়ে যেখানে সেখানে বসতেও পারে না। তবুও বললো সংসদ ভবনের দিকে। গাড়ি রেখে দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে লেকের পাড়ে বসলো। হঠাৎ ময়না হারুনকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, এই ঝালমুড়ি, খাবো। হারুন কৃত্রিম গাম্ভীর্য দেখিয়ে বললো, আমরা কি এখনও ছেলে মানুষ আছি নাকি যে মুড়ি খাবো? খেতে চাইলে রেঁস্তোরায় ঢুকতে হবে। লেকের হাওয়া এবং বস্তু ভক্ষন এক সঙ্গে চলবে না। এক সঙ্গেই চলবে, বলে ময়না ডাকলো মুড়িওয়ালাকে। হারুন মাথা ঘুরিয়ে দেখলো ড্রাইভার দেখছে কিনা। ও চিরকালই একটু শান্তি প্রিয় দুর্বল প্রকৃতির। সে মানুষ হিসেবে সত্যিই ভালো কিন্তু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার মতো ধৈর্য ও মনোবল তার কোনও দিনই ছিল না। তাই সাহস করে নিজে গিয়ে ময়নার সামনে দাঁড়াতে পারে নি। অথচ হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। ময়নার ভাইয়ের সঙ্গে অন্তত সপ্তাহে সে একদিন দেখা করেছে। তাই ওকে ময়নার ঠিকানা, ফোন নম্বর সব দিয়েছে। সে একান্তভাবেই চেয়েছে, হারুন ময়নার সঙ্গে দেখা করুক। অবশ্য ফলাফল সম্পর্কে সে খুব আশাবাদী নয়, এ কথা হারুনকে জানিয়েছে। ময়নার জিদ তার জানা আছে তার ওপর আব্বার সেদিনের শিশুর মতো কান্না সেও তো ভুলতে পারে না।

তবুও সময়ে সব সয়ে যায়, মানুষ অনেক কিছুই ইচ্ছে করে হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক ভুলে যায়, চেষ্টা করে ভুলে যেতে। এতো বোঝানো সত্ত্বেও সে পারে নি মুখ উঁচু করে ময়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে, ময়না আমি এসেছি। চলো তোমার আশ্রয় হোস্টেলে নয়, আমার ঘরে। কতোদিন ওর হোস্টেলের সামনে এসে গাড়ি থামিয়েছে। ভেতরে ঢুকেছে আর তখনই বেরিয়ে এসেছে। নিজের থেকেই যেন ড্রাইভারের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়েছে, না সে হোস্টেলে নেই, বেরিয়ে গেছে। চতুর ড্রাইভার সবই জানে। চুপ করে থেকে সাহেবের মান রক্ষা করে। ময়না নিজের থেকে ফোন না করলে আজও সে দূরেই রয়ে যেতো। কনুই দিয়ে ধাক্কা দিলো ময়না, এই মুখে ক্লিপ আটকেছো? হেসে ওঠে হারুন; তোমার ধ্যান ভাঙাতে সাহস পাই নি। বাজে কথা, জানো আমি প্রাণভরে আকাশ দেখছিলাম। জানো দশটা মাস আমি একবিন্দু আকাশ দেখতে পাই নি। ভেবেছিলাম হয়ত লাশ হয়ে আকাশের নিচে মাটি দেবে আমাকে। কিন্তু আমি তো আর সেই নীল আকাশ, বিকেলের সিঁদুর মাখা আকাশে অথবা কালবৈশেখীর সেই কালি ঢালা আকাশে... ওর কথা শেষ করতে দেয় না হারুন চট্ করে পকেট থেকে টান দিয়ে একটা ডট্ পেন ওর সামনে দিয়ে বলে, কবিতা লিখে ফেলুন নাম থাকবে। ময়না চোখ গরম করে বলে, খালি দুষ্টুমি। তোমার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ নেই। বেশ তো আনন্দ না পেলে দুঃখ নিও না। আমাকে বয়স, উচ্চতা, মোটামুটি চেহারা বলে দাও আমি ধরে এনে দেবো যতো ইচ্ছে গল্প

করো। ওর দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে ময়না বললো, সইতে পারবে? বুকে বালিশ দিয়ে বিছানায় উপুড় হবে নাতো? না বাবা উপুড় না হলেও শোবার ঘরেই থাকবো। ওটা কল্পনাতেও সইতে পারি না ময়না। তাইতো প্রতিটি মুহূর্ত আমি জ্বলেছি। আমি পুড়ে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছি ময়না, তুমি বিশ্বাস করো। ওর কাছে আরও নিবিড় করে বসে ওর হাত দুটো ধরে বলে ময়না, তোমাকে আমি এক বর্ণও অবিশ্বাস করি না হারুন। তুমি তো আমার কথা ভাবতে পারছো। কখনো-বা আশা করেছো আমাদের দেখা হবে, আবার আমরা পুরোনো জীবনে ফিরে যাবো। কিন্তু আমি? আমি প্রথম দিন থেকেই মনের দরজায় কপাট লাগিয়ে দিয়েছিলাম। জানতাম আমি আর কখনও মুক্তি পাবো না। হঠাৎ একদিন আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে। আশ্চর্য জানো হারু, তোমার কথা, আব্বা, আম্মা, মন্টু, চায়না, ভাইয়া কারও কথাই আমার মনে হয় নি। মনে হয়েছে বন্দি বঙ্গবন্ধুর কথা, মনে হয়েছে আমাদের মিটিং-মিছিলের কথা তাও খুব বেশি নয়, জানো হারুন আমার মাথাটা কেমন যেনো শূন্য হয়ে গিয়েছিল। শুধু ভাবতাম আমি কখন মরবো, কেমন করে মরবো। তারপর একদিন...। ওর দিকে তাকিয়ে হারুন শক্ত হাতে ওর মুখ চেপে ধরলো, না, ময়না না, তোমার কষ্টের কথাগুলো আমাকে বলো না। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, চলো, বড্ড খিদে পেয়েছে। কিছু একটা খাবো, তারপর তোমাকে হোষ্টেলে ড্রপ করে চলে যাবো নারায়ণগঞ্জ। পৌছেতে পৌঁছেতে অনেক রাত হয়ে যাবে। মা-ভাইবোন নারায়ণগঞ্জ? অবাক হয়ে ময়না উচ্চারণ করলো। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, মা এ দু'দিনেই আমাকে সন্দেহ করেছেন। আমি তো দেরি করে কখনও বাড়ি ফিরি না। মীরপুর রোডে একটা রেঁস্তোরায় ঢুকে হ্যাম বার্গার আর কেক নিলো। না, পুরো রাতের খাবার তারা খেতে চায় না। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কথা বলা সামান্য স্পর্শ হাসি বিনিময় এর চেয়ে বেশি কিছু না। আর ময়নার তো ভয়ই যেতে চায় না। হারুন সব জানে তো? সব টুকুই কি ভাইয়া ওকে বলেছে? ভাইয়াও তো বিভীষিকার মুহূর্তগুলোর কথা জানে না। জানি না এই খেলার শেষ কোথায়। ময়না ঠিক করেছে হারুন যদি বিয়ের প্রস্তাব না দেয় সেও কিছু বলবে না। এমনিভাবে যদি জীবনটা কেটে যায় যাবে। খুব হাল্কা ছন্দে হোস্টেলে ফিরে এলো সে। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবে, একটা ছোট বাসা নিলে কেমন হয়? হারুনের ইচ্ছে না হলে রোজ রোজ সে নারায়ণগঞ্জ নাই-বা গেল। কিন্তু মুখ ফুটে এ প্রস্তাব দেবে কেমন করে? কি ভাববে হারুন। ভাববে যে জীবন সে যাপন করে এসেছে তেমনই একটা জীবনে সে আবার ফিরে যেতে চায়। না ও আর ভাবতে পারে না।

তবে অফিসে গিয়ে আজকাল সে কিন্তু অতো ক্লান্তি বোধ করে না। আরেকটা জিনিস ময়না নিজেই লক্ষ্য করেছে সে কারও সঙ্গেই প্রয়োজন ছাড়া কখনও একটা

কথাও বলে নি। আজকাল কিন্তু বলে। কুশল জিজ্ঞেস করে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভালোমন্দ আলাপও করে। মনে হয় তার জীবনের জমাট পাথরখণ্ডগুলো বুঝি গলতে শুরু করেছে। সে পাশে কাউকেই সইতে পারতো না। আজকাল কিন্তু অনেক সময় পাশে কাউকে সে কামনা করে। অন্যকে হঠাৎ ডেকে চা খাওয়ায়। তার ঘনিষ্ঠ দু'একজন মেয়ে মন্তব্য করে। ময়নার কানে আসে, হেসে উড়িয়ে দেয়। আগের দিন হলে চাকুরি যেতো। একি হারুনের সান্নিধ্যের ফল, হবেও বা! ময়না গোপনে জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। পরদিন বিকেলের দিকে হারুন ওকে ফোন করলো, ময়না আমি আজ আসতে পারবো না। তাড়াতাড়ি নারায়ণগঞ্জ যেতে হবে। কাজ পড়েছে। যদি কাল না আসি তাহলে হয়তো আর ফোন করবো না। কারণ তাহলে ধরে নিও আমি নারায়ণগঞ্জে আটকে গেছি। তবে পরশু নিশ্চয়ই আসবো। ময়না বললো, এসো, তবে পরশু এসেই ফোন করো। আমি একটু চিন্তায় থাকবো। পরদিন বিকেলে ফোন পেলো ময়না। ও নারায়ণগঞ্জ থেকে কথা বলছে। ওর ছোট বোন আসিয়ার বিয়ের কথা পাকা হলো। আগামী মাসে বিয়ে হয়ে গেলে হারুণের দায়িত্ব কর্তব্য সব শেষ। বড় আপা, মেজো আপার বিয়ে হয়ে গেছে যুদ্ধের আগে। একমাত্র আসিয়াই বাকি ছিল। ওর ছোট দু'ভাই দু'জনেই পড়া শেষ করে চাকুরি করছে। বেশ স্বচ্ছল গোছানো সংসার। তাকে নিয়ে অমন অঘটন না ঘটলে আজ তো তাদেরও সুন্দর ছিমছাম সংসার হতো। বড় ভাই আর সে চাকুরি করতো, মন্টু পড়া শেষ করে যা হয় একটা করতো। সে অবশ্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একটা ব্যাংকে চাকুরি পেয়েছে। এক বছর পর আরেকটা পরীক্ষা হবে। পাশ করলে অফিসারের গ্রেডে যাবে। এতেই আব্বা-আম্মা খুশি। তাছাড়াও দৈনিক শ' দু'শ আব্বা এখনও উপার্জন করেন। তার জন্যে ভাইয়া বিয়ে করছে না। কারণ বলে না। কিন্তু ময়না বোঝে, ভাইয়াকে বোঝাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভাইয়া কোনও কথাই কানে নেয় না।

দু'দিন পর হারুন ঠিকই ফোন করলো। ময়নার কিন্তু দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো। বোনের বিয়ের নাম করে নিজেরও একটা ব্যবস্থা করে আসবে নাতো? অসম্ভব কিছু না। পুরুষের চরিত্র তো তার দেখা হয়ে গেছে। কামনা জেগে উঠলে ওদের কি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথা মনে থাকে? আর ময়নাতো ওর ছোট বেলার বান্ধবীর চেয়ে বেশি কিছু নয়। হারুন বলেছে একটু আগে আসবে। ময়নাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবে। একটু সেজেগুজে থাকতে বলেছে। ময়না রাজি হয়ে ফোন রেখে দেয়। কোথায় নেবে তাকে? কাকে দেখাবে যে সেজেগুজে থাকতে হবে। হবে কোনও বন্ধু বান্ধবীর ওখানে। আসলে ময়না কারও সামনেই যেতে চায় না। হারুন সমস্ত ব্যাপারটা ওর কাছে সহজ করতে চায়। ওকে স্বাভাবিক দেখতে চায়। কিন্তু ময়না কিছুতেই তার

জড়তা কাটাতে চায় না। হারুন এখন জোর করে না। ঠিক করেছে সব কিছু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসুক সেই ভালো। জানি না হারুনকে কতোদিন অপেক্ষা করতে হবে, হোক। সে তো সারা জীবন অপেক্ষা করবার প্রস্তুতি নিয়েই ছিল।

বিকেলে হারুন এলো। ময়নার উপর থেকে ও চোখ ফেরাতে পারে না। মুসুরি ডাল রঙের একখানা জরিপাড় শাড়ি পরেছে। ময়নার গায়ের রঙ ফর্সা। মনে হচ্ছে চারিদিক আলো হয়ে উঠলো। কানে আর গলায় মুক্তো। হারুণের দৃষ্টি দেখে লজ্জা পেলো ময়না। বারে, তুমি তো সেজে থাকতে বলেছো, লজ্জা জড়িত কণ্ঠে বললো ময়না। হারুন বললো, কিন্তু আমার কথাতো রাখে নি। এটা কি সাজা হলো? একখানা সাধারণ তাঁতের শাড়ি পরে তুমি অফিসে যাও না? যাও একটা দামি বেনারসি পরে এসো।

গম্ভীর হলো ময়না, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? বেনারসি? বেনারসি আমি কোথায় পাবো? স্বর তীক্ষ্ণতর হলো। হারুন নিরুত্তাপ গলায় বললো, নেই বেনারসি, বেশ তো চলো আমি কিনে দেবো তোমাকে। গাড়ির কাছে এসে পড়েছে। ময়নার গতি স্তব্ধ হলো। হারুন তুমি আমাকে নিয়ে, আমার বর্তমান অবস্থা নিয়ে কৌতুক করছো। আই এ্যাম সরি, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারবো না আর। হারুন ওর হাত শক্ত করে ধরলো। রাস্তার পাশে সীনক্রিয়েট করো না ময়না। গাড়িতে ওঠো তারপর না হয় আমাকে দু'চার ঘা দিয়ে দিও। ততোক্ষণে ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। গাড়িতে উঠে ময়না আর কোনও শব্দ করলো না, হারুনও রাস্তার দিকে মুখ করে বসে রইলো। সম্ভবত গন্তব্য ড্রাইভারকে আগেই বলে ছিল, সে নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে লাগলো। ঈদগাহ রোডের থেকে ওঠা একটা রাস্তায় গাড়ি ঢুকে থামলো। এবার হারুন নিজেই দরজা খুলে দিল। একেবারে অন্যমনস্ক কেমন যেন অভিভূতের মতো ময়না ওর পেছন পেছন বেরুলো। দোতালায় উঠে একটা দরজায় চাবি লাগালো হারুন। ঘরে ঢুকে বাতি জ্বাললো। সুন্দর ছিমছাম বসবার ঘর, আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনের অভাবও নেই। একটা সোফাসেট আর একটু দূরে একটি বেতের সেট। দু'জায়গায় দুই টুকরো কার্পেট, বেতের দিকে মাখন রঙের আর অন্যদিকে চকোলেট রঙের। ময়না অতিকষ্টে উচ্চারণ করলো, এ তুমি আমাকে কোথায় আনলে হারুন? গলাটা এতো ক্লান্ত যে মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে ওর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। এবার হারুন ওর দিকে এগিয়ে এলো। হাত দুটো ধরে নিজের ভেজা চোখের ওপর বুলিয়ে বললো, তোমার নিজের ঘরে এনেছি ময়না। এসো ভেতরে তোমার ঘর, কিচেন, বাথ, একটি অতিরিক্ত ঘরসহ এ্যাপার্টমেন্টটা বেশ সুন্দর। জানালাগুলো বেশ বড়। ময়না তাকিয়ে দেখলো সুন্দর আকাশ দেখা যায়।

একটু বসি? ক্লান্ত ময়নার কণ্ঠ। নিশ্চয়ই, চলো বসবার ঘরে যাই, নতুবা আবার আমার কোন ব্যবহারে তুমি ক্ষুণ্ন হয়ে পড়বে। একটু সুস্থির হয়ে ময়না বললো, কবে নিয়েছো এ বাড়ি। আমাকে বলোনিতো? এ বাড়ি নিয়েছি '৭৩ সালে তখন তুমি তো আমার কাছে ছিলে না। কেন তোমার পছন্দ হয়নি? ময়না ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো। কেন হবে না। ময়না, আমরা তো আলাদা নই। ভেতরে গিয়ে দুটো কোক, দুটো গ্লাস আর একটা চীপসের প্যাকেট প্লেটে বসিয়ে ট্রে করে নিয়ে এলো। ময়না জিজ্ঞেস করলো, একা থাকো তোমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কি? না না একা থাকি না। নারায়ণগঞ্জের একটা ছেলে আমার কাজ করে, সঙ্গে থাকে। আজ তোমাকে আনবো বলে ওকে ছুটি দিয়েছি। ছেলেটা খুবই কাজের। এবার হারুন একটু অন্তরঙ্গ হয়ে বসে ময়নার পাশে। ওর হাত দুটো তুলে নিয়ে বলে, ময়না, কবে আসবে তুমি আমার এ ঘরে, কবে এ ঘর আমাদের ঘর হবে?

হারুনের হাতের ভেতর ময়নার হাত কাঁপছে, ঘামছে। ও কথা বলতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। হারুন উঠে দাঁড়িয়ে ওকে বুকে টেনে নিলো। বলে, ময়না, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমার বাবা আমাদের বাড়ি থেকে আসবার পর আমার ভাই হাশেম আমাকে সব কথা বলে। আমি কাউকে কিছু বলি নি। কোম্পানির কাছে বাড়ি চেয়েছি। ওরাই এটা ঠিক করে দিয়েছে। ভাড়া ওরাই দেয়। আমি তারপর এক রাতও ও বাড়িতে থাকি নি। সেদিন আসিয়ার বিয়ের কথা ঠিক হতে হতে অনেক রাত হয়ে গেল। বড় ভাইয়ের সঙ্গে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে এসেছি। তুমি ওর কাছ থেকে জেনে নিও। মা তোমাকে খুব ভালোবাসেন ময়না। সব সময় জিজ্ঞেস করেন আমি তোমার খবর রাখি কিনা। এবার মাকে বলেছি। মা বললেন, তোর বাবার তখন মাথা ঠিক ছিল না। তুই বলে দেখ। ময়না রাজি হলে আমরা ওদের বাড়ি গিয়ে প্রস্তাব দিব। মাকে বলেছি ওর মতের দরকার হবে না। সে রাজি হলে আমরা নিজেরাই বিয়ে করে নেবো। মা হাতটা চেপে ধরে বললেন, না বাবা, যেখানেই করিস আমাকে আর ময়নার মাকে ডাকিস। আমরাও মেয়ে মানুষের জাত, এটা ভুলিস না।

ময়না ডুকরে কেঁদে উঠলো সত্যিই হারুণের মা ওকে খুব ভালোবাসতেন। ডাকতেন পাগলী বলে। ময়না এবার বললো, হারুন তোমার এক দেহে এত গুণ জানতাম না। হারুন লাল হয়ে বললো, দেখো ময়না, স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে হয়, সম্মান করতে হয়, নাম ধরে ডাকতে নেই। ওগো, হ্যাগো বলতে হয়। ময়না বললো, ব্যাস, মাত্র এই? না না আরও আছে। রোজ সকালে স্বামীর পা ধুয়ে দেবে, এই লম্বা চুল দিয়ে পা মুছে দেবে! ব্যাস ব্যাস আর না, সব শেষে শক্ত একটা লাঠি দিয়ে ঐ পা দুটো ভেঙে দেবে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি যে বলো, নাও এটুকু মুখে দাও। রাতের

খাবার আজ আর রেঁস্তোরায় নয়। হাকিম রান্না করে রেখে গেছে। ভাতটা আমি করে নেবো। আর চাইলে তুমিও করতে পারো। হারুণের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে ময়না বলে আমার বড় ভয় করে হারুন; সবল হয়ে হারুন বলে কিসের ভয় ময়না? আমার দিকে তাকাও, আমার এ বিশাল বুকের ভেতর থেকে কে তোমার কি ক্ষতি করবে? আমার উপর ভরসা করতে পারো না? পারা তো উচিত হারুন, তবুও কেন জানি না কিসের ভয় আমার। আমি জ্ঞানত স্ব ইচ্ছায় কোনও পাপ, কোনও অন্যায় করি নি। তবুও পর্বত প্রমাণ অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে আজ দু'বছর পথ চলেছি। আমি বড় ক্লান্ত হারুন। একা একা আর পারছি না। শোনো, আগামী মাসের সতেরো তারিখে আসিয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছে। তুমি যাবে না। কিন্তু খালাম্মা খালু সবাইকে আব্বা গিয়ে দাওয়াত করে আসবেন এবং আমার বিশ্বাস তাদের অন্তরে যতো ব্যথাই তারা পান না কেন, দাওয়াতে তারা ঠিকই আসবেন। তারপর আম্মা-আব্বা গিয়ে সব কথাবার্তা বলে আসবেন।

ময়না হঠাৎ মুখ তুলে বললো, বিয়ে কিন্তু ঢাকায় হবে। নিশ্চয়ই বলে পাশের ঘরে চলে গেল হারুন। একটু পরে একটা শাড়ির বাক্স নিয়ে এলো। কমলা রঙের এটা দারুণ কাজ করা বেনারসি। ময়না, এই শাড়ি দিয়ে আমি আজ নতুন করে তোমার মুখ দেখলাম। ছিঃ ছিঃ কি যে ছেলেমানুষী করো, লজ্জায় কুঁকড়ে গেল ময়না। হারুন উঠে এসে ওর হাত ধরে বললো, প্লিজ ও ঘরে গিয়ে শাড়িটা পরে এসো। ওর কথা ফেলতে পারে না ময়না, শাড়িটা পরেই আসে। বাঃ চমৎকার! আমার রুচির প্রশংসা করলে না ময়না? রাজ্যের লজ্জা ওকে ঘিরে ধরেছে। ধুপ করে একটা সোফায় বসে পড়লো ময়না হাত থেকে ছোট বাক্সটা বের করে একটি ছোট ডায়মন্ড আংটি ময়নার অনামিকায় পরিয়ে দিলো হারুন। সহজাত রীতিতে ময়না নিচু হয়ে হারুনকে সালাম করতে গেলে বন্দি হলো তার হাতের ভেতর। হারুন অনুমতি নিয়ে তার চোখের ওপর উষ্ণ ওষ্ঠ ছোঁয়ালো, তারপর যথাস্থানে।

রাত দশটায় বাড়ি ফিরে এলো ময়না বেবিট্যাক্সি করে। আজ হারুন তাদের প্রথম অভিসারের লগ্নে আর কারও উপস্থিতি চায় নি। কি দ্রুত কেটে গেল মাসটা, আসিয়ার বিয়ে হয়ে গেল, ময়নাদের বাড়িতে হারুণের বাবা-মা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। চোখের জলে সব ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে গেল। বিয়ে হলো ঢাকায়। দু'তরফের আত্মীয়, বন্ধু সবাই এলেন. কয়েকজন তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নারায়ণগঞ্জের জোহা সাহেবও এসেছিল।

বলাবাহুল্য ময়না হোস্টেল ছেড়ে দিলো। ওর সৌভাগ্যে সত্যিই অনেকে ঈর্ষাকাতর হলো। চারমাস পর হারুনকে কোম্পানি থেকে একটা ব্যবসায়িক ট্যুরে ইউরোপের কয়েকটা দেশে পাঠালো। ময়নাও দু'মাসের ছুটি নিয়ে মহানন্দে হারুণের

সঙ্গী হলো। কতো দেশ দেখলো, কতো লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো, কতো শপিং করলো সবার জন্যে। কিন্তু পথে চলতে চলতে হঠাৎ করে একটা মুখকে কেমন যেন পরিচিত মনে হয়। ময়না ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ে। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। হারুন লক্ষ্য করেছে তবে এ নিয়ে ওকে কিছু বলে নি। ভাবে সময় মতো সব ঠিক হয়ে যাবে। ময়না ভাবে দেশে ফিরে গিয়ে এবার সে একটা সন্তান চাইবে হারুণের কাছে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। মানুষ করে রেখে যেতে হবে তো।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের খবর ওদের কানে পৌঁছালো পর দিনই। দু'জনেই ভীষণভাবে বিচলিত। ময়নার কান্না থামাতে পারে না হারুন। ও শুধু বলছে, বাবা তোমার জন্যে সব দিলাম, তবুও তোমাকে রাখতে পারলাম না। হারুন আমি ঢাকা যাবো, বাড়ি যাবো। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডেকে ওকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হলো। না, পরদিন সকালে ওকে সুস্থ মনে হলো তবে কিছুটা দুর্বল। হারুন তার নির্ধারিত কাজে বেরিয়ে গেল, ময়না সারাদিন বিশ্রামই নিলো।

সফর শেষ করে সেপ্টেম্বরে দেশে ফিরে এলো ওরা। বাইরে খুব একটা পরিবর্তন চোখে পড়ল না কিন্তু সর্বত্রই যেন একটা ভয় এটা শংকা। বঙ্গবন্ধুর কিছু ঘনিষ্ঠ সাথী কেউ স্বেচ্ছায় কেউ বাধ্য হয়ে মুস্তাক মন্ত্রীসভায় যোগ দিলেন। জেলে গেলেন তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও আরও বহু আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী। ময়নাকে আবার পুরোনো ভয় পেয়ে বসেছে। হারুন কার সঙ্গে পরামর্শ করবে বুঝে পায় না। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার কিন্তু পুরোনো গণ্ডির মাঝে ময়নাকে ফেলতে তার সাহস হয় না। আস্তে আস্তে ময়না স্বাভাবিক হলো। অফিসে যায় আসে তবে বাইর বিশেষ যেতে চায় না। একটা সুখবর অন্তঃসত্ত্বা হলো ময়না। সবাই খুশি বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি। হারুন চায় মেয়ে আর ময়না অসম্ভব জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে না 'ছেলে'। মেয়ে আমি চাই না। অপ্রত্যাশিত না হলেও আরেকটা ধাক্কা এলো নভেম্বরে।

খালেদ মোশারফসহ আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধা নিহত হলেন। পথে হঠাৎ করে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর, শোনা গেল। হারুন বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো ময়নার জন্য। কিন্তু না এবার সে ভবিষ্যত মাতৃত্বের আনন্দে ও কল্পনায় বিভোর। বাইরের হুজুগ, চার নেতার মৃত্যু তাকে আঘাত করলো বলে মনে হয় না। শুধু মাঝে মাঝে বলতো কি যে হবে, কি যে হবে তাই ভাবি।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। পুত্রসন্তান, হারুন নাম রাখলো গৌতম। ময়না হেসে সম্মতি দিলো। অবশ্য দু'তরফ থেকে ডজন খানেক নামকরণ হয়ে গেল। তিন মাসের ছুটি। ময়নার মা এসে সঙ্গে আছেন। শাশুড়ি মাঝে মাঝে আসেন কিন্তু থাকতে পারেন না। হঠাৎ করে একদিন ময়না আবিষ্কার করলো, ইদানীং হারুণের

মুখ যেন কিছু মলিন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। জিজ্ঞেস করলে বলে না না, ও কিছু না। তুমি আমাকে নিয়ে বেশি ভাবো কিনা। একটু মনোযোগ দাও নিজের দিকে। কিন্তু ময়নার চোখ ফাঁকি দিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ময়নাকে বলে, কারা যেন টেলিফোনে প্রায়ই ওকে ভয় দেখায়। ময়নাকে নিয়ে যা তা কথা বলে। মুক্তিযোদ্ধার ওস্তাদী ওরা শেষ করে দেবে। ময়না উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, তুমি থানায় একটা ডায়েরি করে রাখো। অবশ্য সাহস থাকলে সামনে আসতো। যতো সব ভীতুর দল। এ নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না। কি করবে আমাদের? না ময়না, করতে ওরা সবই পারে। '৭১-এ দেখেছো না এদের চেহারা, এদের চরিত্র। তাই একেবারে উপেক্ষা করতে পারি না। তবে মনে হয় কিছুদিন ঘ্যান ঘ্যান করে নিজে থেকেই থেমে যাবে। ময়না ভাইয়াকে কথাটা বলে। ভাইয়াও নাকি ওরকম ফোন কল পাচ্ছে। বললো, আমি খুব একটা ভয় না পেলেও সাবধানে থাকি। চায়নার বিয়ে হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম। বিয়ে তো ঠিক হয়েই আছে। গৌতম মহারাজের আগমনের জন্য দিন স্থির করতে একটু দেরি হয়ে গেল। এভাবেই দিন গড়িয়ে যায়। চায়নার বিয়ে হয়ে গেল। গৌতমের আকিকা হলো। ধুম ধামের অভাব নেই। ফোন কল কমে এসেছে। হয়তবা থেমে গেল তবে প্রতিবারই কিন্তু একটা কণ্ঠ নয়। একেক বার একেক জন অথবা কণ্ঠ বিকৃত করে তাও হারুন জানতে পারে না।

আসিয়ার ভাশুর বিদেশে থাকেন। দেশে এসেছেন। সেই উপলক্ষ্যে হারুণের আম্মা অনেককে দাওয়াত করেছেন। হারুন আর ময়নার যাবার কথা কিন্তু হঠাৎ গৌতমের শরীরটা খারাপ করায় ও যেতে পারলো না। মা তো এ যজ্ঞের বাবুর্চি হবার জন্য আগেই বেয়ানের কাছে চলে গেছেন। দশটার ভেতরই হারুন চলে গেল। ময়নার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমনিতেই ওদের নারায়ণগঞ্জে যাওয়া হয় না। তার ওপর গৌতমটা কি বাঁধিয়ে বসলো। হতভাগা ছেলে আর অসুস্থ হবার সময় পেলো না।

বেলা সাড়ে বারোটায় হঠাৎ ফোন এলো নারায়ণগঞ্জ থেকে। বড়ভাই ফোন করেছে। হারুন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওরা ওকে নিয়ে এক্ষুনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে আসছে। ও যেন বাসায় থাকে। আর কিছু জিজ্ঞেস করবার সুযোগ ময়না পেলো না। পাগলের মতো একবার জানালায় একবার দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত হারুণের অফিসে ফোন করে খবর পেলো। হারুন এ্যাকসিডেন্ট করেছে, ওকে ঢাকায় আনা হয়েছে মেডিক্যাল কলেজে। এক্ষুনি ময়নার কাছে গাড়ি যাচ্ছে। ময়না বুয়ার হাতে গৌতমকে বুঝিয়ে দিয়ে কোনও মতে শাড়ি জড়িয়ে তৈরি হতেই অতি পরিচিত গাড়ির হর্ণ তার কানে এলো। দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে বসলো। কি হয়েছে ড্রাইভার, সাহেব? ড্রাইভার কি উত্তর দিলো বোঝা গেল না। মেডিকেল কলেজে

ইমার্জেন্সীর সামনে ভাইয়া ও অফিসের লোকজন দাঁড়ানো। ময়না ওদের সঙ্গে দৌড়ে ঢুকলো। রক্তভেজা বিছানায় শুয়ে আছে হারুন। হারুন নেই। বাসার সামনে কটা লোক কি নিয়ে যেন ঝগড়া হাতাহাতি করছিল। হারুন ওদের থামাতে গিয়েছিল। ও পাড়ার ছেলে নামকরা মুক্তিযোদ্ধা সবাই ওকে মানে আর হারুনও সে ভাবে চলে। যারা কাছে ছিলেন তারা বলছেন, হঠাৎ কয়েকটা লোক ছুটে পালায়। পরে মনে হলো ঝগড়া, ফ্যাসাদ সব বানানো। এতদিনে প্রতিপক্ষের কাজ হাসিল হলো। ময়নার জ্ঞান ছিল না। ওকে বাসায় আনা হলো। মা, চায়না, ননদ, আসিয়া সবাই এসে পৌঁছেছে। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল ময়না জানে না। শুধু এটুকু উপলব্ধি করলো তার ভাঙা কপাল এবার ভেঙে শত টুকরো হয়ে গেল আর কখনোও জোড়া লাগবে না।

অফিসে খুবই ভালো ব্যবহার করলো। ময়নাকে একটা উপযুক্ত চাকুরি দেওয়া হলো এবং বাড়িটাও ওর নামে এ্যালোটেড হলো। ময়না শুধু পুরোনো অফিসকে জানালো তার যদি ভালো না লাগে তাহলে কি তারা ওকে আবার নেবেন। তারা শুধু আশ্বাস নয়, আশ্বস্ত করলেন ময়নাকে।

নতুন জায়গায় কাজে যোগ দিলো ময়না। হারুন নেই তাও ভাবতে পারে না। ছোট গৌতমকে নিয়ে সব ভুলতে চায় ময়না। ভাবে আল্লাহ্ কি আমার জন্য শুধু দুঃখই সঞ্চয় করে রেখেছিলেন? তাহলে ক্ষণিকের সুখের মুখ কেন দেখালেন, কেন? দিন চলে যায়। ময়নারও যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হলো তার নতুন বস তার সুবিধা-অসুবিধার সম্পর্কে একটু বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। ময়না দেখেও দেখে না। শুনেও শোনে না। কিন্তু এভাবে কতোদিন চলে, সাত বছর হয়ে গেল হারুন চলে গেছে। গৌতম না এলে ও তো বিষ খেয়ে সব যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে পারতো। এখন মাঝে মাঝে গৌতম সব অদ্ভুত প্রশ্ন করে। ওর বাবাকে কারা মেরেছে? কেন মেরেছে, কি করেছিল ওর বাবা? ময়না উত্তর দিতে পারে না। ইতোমধ্যে আব্বা মারা গেছেন তাই মা বেশির ভাগ সময়ই ওর কাছে থাকেন। ভাবি বড় ভালো মেয়ে। সংসার ভালোবাসে তাই মাকে আর ভাবতে হয় না। ময়না এখন মনে মনে গৌতমের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। ময়মনসিংহ ক্যাডেট স্কুলে একদিন ও গেল। হ্যাঁ দশ বছর বয়স হয়েছে। সুতরাং ও ছেলেকে আনতে পারে। পরীক্ষা দিতে হবে। গৌতম বাবার মতোই লেখাপড়ায় ভালো। পরীক্ষা দিলো, খুব ভালো ফল করলো। একদিন স্যুটকেস গুছিয়ে ময়না গৌতমকে ময়মনসিংহ রেখে এলো। তারপর বাসা খুঁজতে শুরু করলো ওর কলিগের সহায়তায়। এ বাড়ি পেয়ে কোম্পানির সাজানো বাড়ি ছেড়ে দিলো। বস্ দুঃখ করলেন, অফিসে অনেকেই আছে যাদের বাড়ির একান্তই প্রয়োজন। তারপর দশ বছর পরে ওর পুরোনো অফিসে ফিরে এলো। ময়না টাকা

চায়না। চায় শান্তি। এ অফিস চাকুরি দিয়েছিলো একজন দুঃস্থ বীরাঙ্গনাকে, আর ওখানে মিসেস হারুন-অর-রশীদ সে লেবাস ও ছেড়ে এলো। ওর ঠিক এখন টাকার দরকার নেই। ও ছোট একটা ফ্ল্যাট কিনে ভাড়া দিয়েছে। ঐ টাকা থেকে গৌতমের সব খরচ চলে যায়। আর ময়নার তো বলতে গেলে কোনো খরচই নেই। মা চলে গেছেন। শ্বশুর-শাশুড়ি আগেই গেছেন। ছেলের শোক সহ্য করা ওদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

আপা, আমি আবার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি একজন বীরাঙ্গনা। যারা বারাঙ্গনা বানাতে চেয়েছিল তারা আমার স্বামীকে নিয়েছে। কিন্তু আমি বেঁচে আছি গৌতমের মা হয়ে। গৌতম হবে মুক্তিযোদ্ধার ছেলে মুক্তিযোদ্ধা। বাবা দেশ স্বাধীন করে গেছে। গৌতম সে দেশের জঞ্জাল সরিয়ে সোনার বাংলা গড়বে। এই সন্তানকে গড়ে তোলাই আজ বীরাঙ্গনা ময়নার শপথ।

ছ য়

আমার পরিচয়? না, দেবার মতো আমার কোনও পরিচয় আজ আর অবশিষ্ট নেই। পাড়ার ছেলে মেয়েরা আদর করে ডাকে ফতি পাগলী। সত্যি কথা বলতে কি আমি কিন্তু পাগল নই। যারা আমাকে পাগল বলে আসলে তারাই পাগল। এ সত্যি কথাটা ওরা জানে না।

বাবা-মা নাম রেখেছিলেন ফাতেমা। আমি প্রথম কন্যা সন্তান আমার জনকের। দাদি আদর করে বলেছিলেন দেখিস এ মেয়ে আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। হযরতের কন্যা তো বিবি ফাতেমা। একটু বড় হয়ে নিজের নামের মাহাত্ম্য বুঝতে শিখেছি, একটু গর্বও ছিল সেজন্য। আমাদের বাড়ি ছিল খুলনা শহরের উপকণ্ঠে বর্তমান শিল্প শহর খালিশপুরের কাছে সোনাডাঙ্গায়। অবশ্য পাকা দালান নয়, কিছুটা ইট গাঁথা টিনের চাল। বেশ কয়েকটা আম, একটা কাঁঠাল, একটা চালতা আর একটা আমড়াগাছ ছিল। সেগুলোর জায়গা আমি এখনও দেখিয়ে দিতে পারি। কি যে বলি, ওখানে তো এখন কয়েকতলা উঁচু বাড়ি। যাই হোক; বাড়িতেই লাউ, কুমড়া, শিম, পুঁই শাক সবই হতো। বাবা ছিলেন চাষী কিন্তু অন্যের ক্ষেতে কাজ করতেন না। তাঁর নিজের জমির ধানেই পরিবার চলে যেতো। জমি ছিল শহর থেকে ৫/৬ মাইল দূরে। বাবা খুব পরিশ্রমী ছিলেন। জমির কাজে মজুর রাখতেন আর নিজে প্রতি হাটবার শাক সবজি, তরকারি এলাকা থেকে সস্তায় কিনে শনিবার আর মঙ্গলবার শহরের হাটে বিক্রি করতেন। তাতে যা লাভ হতো তা থেকেই ঐ হাট থেকে তিনি সপ্তাহের লবণ, মরিচ, সাবান, তেল ইত্যাদি কিনে আনতেন।

আমরা ছিলাম পাঁচ ভাই বোন। আমি বড়, তারপর তিন ভাই, সব ছোট একটি বোন, সবাই ডাকতো আদুরী। কারণ ভাইদের কোলে কোলে ও বড় হয়েছে। আর ছিলেন সবার মাথার উপর দাদি। দাদাকে আমি দেখি নি। তিনি আমার জন্মের আগেই মারা গেছেন। বাবা একমাত্র ছেলে, তার আর কোনও ভাই-বোন নেই। একটি ছিমছাম সুখী পরিবার। আদুরী ছাড়া আমরা সবাই স্কুলে যেতাম। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সবাই দুধভাত খেতাম, তারপর ছুটতাম খেলতে। পাড়ার মেয়েরা মিলে

দৌড় ঝাঁপ করতাম। ছুটির দিনে পুকুরে বাজি ধরে এপার ওপার করতাম সবাই। ওঃ আমার চোখে পানি; ও সব কথা ভাবলে পানি যে আপনিই আসে আপারা, বাঁধ মানে না। মাঝে মাঝে বাবা আমাদের শহরে নিয়ে যেতেন সিনেমা দেখাতে। উল্লাসিনী সিনেমা, পিকচার প্যালেস ওঃ সে সব কি বই দেখেছি!

এভাবেই চলছিল জীবন। আমি যে বছরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবো সে বছরে শুরু হলো গোলমাল। আমরা মেতে গেলাম। পাকিস্তানিদের গোলামি আর করবো না। আমাদের দেশ থেকে দস্যুরা সব কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পাট বিক্রি করা পয়সা দিয়ে ওরা ইসলামাবাদে স্বর্গপুরী গড়ে তুলেছে আর আমরা দিন দিন গরীব হয়ে যাচ্ছি। এসব কথা বলবার জন্য শেখ মুজিবকে জেলে ধরে নিয়ে গেল সঙ্গে আরো মিলিটারী বাঙালি অফিসার ও রাজনৈতিক নেতাকেও গ্রেপ্তার করলো। বললো, শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে যোগসাজসে পাকিস্তান ধ্বংস করতে চেয়েছিলো। মামলার নাম হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। বাব্বা সে কি মিটিং, মিছিল, বক্তৃতা, শ্লোগান। সবাই ভুলে গেলাম। বাবা পর্যন্ত মাঝে মাঝে হাটবারে তরকারি বেচতে যেতেন না। বলতেন ফাতেমার মা, শেখ মুজিবের যদি ফাঁসি হয় তাহলে আমাদের বেঁচে থেকে লাভ কি? ঢাকায় ছাত্ররা সব কিছু ওলট-পালট করে ফেলেছে। তারপর একদিন-উঃ সে কি আনন্দ শেখ মুজিব ছাড়া পেয়েছেন। সবাই তার গলায় ফুলের মালা পরিয়েছে। খুলনা শহরেও সে কি আনন্দ উৎসব। পুলিশ সব দূরে দাঁড়িয়ে দেখলো, কাছে এলো না। মনে হলো ওরাও খুশি।

পাড়ার দু'চারজন মুরুব্বি গোছের লোক বলতেন ফাতেমা একটু রয়ে সয়ে চলো। মেয়ে মানুষের এতো বাড়াবাড়ি ভালো না। যেদিন পুলিশ মিলিটারী ধরবে, সেদিন বুঝবে। দু'হাতের দুটো বুড়া আঙুল দেখিয়ে বলতাম, বিবি ফাতেমাকে ধরা অতো সোজা না, আপনারা ঠিক থাকবেন, তাহলেই হবে। আমার পরের ভাইর নাম সোনা মিঞা। ওর বয়স চৌদ্দ বছর; তারপর মনা, আর সব শেষে পোনা। ওরা দু'বছর পর পর। ওরাও আমাদের মতোই ক্লাস আর করে না। সোনা আর মোনা বড় বড় ছেলেদের পেছনে নিশান হাতে দৌড়োয়। তারপর আস্তে আস্তে সব শান্ত হলো। আবার আমরা পড়াশুনা শুরু করলাম। কিন্তু আমরা একটু অস্বস্তিতে ছিলাম। কাছেই খালিশপুরে বিহারী ভর্তি। ওরা সব সময়েই কেমন যেন দাম্ভিক ব্যবহার করতো; বড় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতো। একবার তো রায়ট লেগে গেল, মরেছিলও অনেক লোক। রায়টটা হয়েছিল শ্রমিকদের ভেতর। তাই আমাদের একটু সাবধানে থাকতে হতো। এবার এলো নির্বাচনের পালা। সে কি আনন্দ, সব ভোট বঙ্গবন্ধুর। তখন আর তিনি শেখ মুজিব নন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মিটিং করতে খুলনা এসেছিলেন, এক নজর দেখবার জন্য আমরা সব ভেঙে পড়েছিলাম। গান্ধী পার্কে দেয়ালের ওপর

চড়ে এক নজর দেখেছিলাম তাকে। উঃ সে আমি ভুলতে পারবো না। চারদিক থেকে গেছো মেয়ে, গুণ্ডা মেয়ে করে চেঁচাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি তবুও বঙ্গবন্ধুকে না দেখে নামছি না। আর নামলেই-বা কি? লাফ দিলেই তো কারও না কারও ঘাড়ে পড়বো। উঃ সে কি উত্তেজনা। মনে আছে মা বল্লো, কি হলো, আজ যে ভাত খেলি না। হেসে বললাম-- মা আমার পেট ভরে গেছে খুশিতে। তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছে মা, তুমি বঙ্গবন্ধুকে দেখলে না। আর কি চোখ মা...। থাক হয়েছে, ওঠ এবার।

হয়ে গেল নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু হবেন এবারের সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। ইঃ দেখবো এবার এই বিহারীর বাচ্চাদের। ওই নাসির কথায় কথায় বলে বাঙালি কুত্তা। দেখবো কে কাদের কুত্তা। কিন্তু এখন তো আর সবুর সইবে না, কিছুই ভালো লাগছে না। পরীক্ষাটাও আবার সামনে। আমি জানি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হলে এ বছর আর পরীক্ষা দেবো না শুধু আনন্দ আর ফুর্তি। পার্লামেন্ট বসছে না। ভুট্টো ঘোরাচ্ছে। পরিস্থিতি ভালো না। বেশ কয়েক জায়গায় গুলি চলেছে। বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করলেন। সব বন্ধ। হাসপাতাল, পানি, বিদ্যুৎ ব্যাংক ছাড়া সব বন্ধ। বঙ্গবন্ধু বলেছেন ওদের আমরা ভাতে মারবো, পানিতে মারবো। ভুট্টো সাহেব এলেন সদলবলে, মিটিং করলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে, তারপর ছেড়ে গেলেন পূর্ব পাকিস্তান চিরকালের জন্য।

২৫ মার্চ পাকিস্তানের সকল বন্দুক, কামান, ট্যাঙ্ক, গর্জে উঠলো বাঙালি হত্যার জন্য। যতোক্ষণ ঢাকার সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল সব জানা গেল। তারপর শুধু গুজব আর গুজব। পরে জানলাম, যা ঘটেছে গুজব সেখানে তুচ্ছ। বঙ্গবন্ধু বন্দি হলেন। তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেল বিচার হবে। দাঁত কিড় মিড় করে ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণ দিল। বিহারীরা গর্জে উঠলো। আমরা সব বাড়িঘর ছেড়ে পালাবো ঠিক করলাম। কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররা সব চলে গেল। কেউ কেউ ওদের হাতে পড়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। মিলিটারি আসছে। বিহারীরা শ্লোগান দিচ্ছে, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর। সামনে যা পেলাম নিয়ে সবাই গ্রামমুখী হলাম। কিন্তু নাসির আলীর হাত থেকে মুক্তি পেলাম না আমি আর পোনা। পোনাকে কোলে নিয়ে, আমি দৌড়োচ্ছিলাম, তাই সবার পেছনে পড়েছিলাম। ধরে ফেললো আমাকে, আমার গায়ের জোরও কম না। ওর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছি দেখে হঠাৎ পোনাকে তুলে একটা আছাড় দিলো। ওর মাথা ফেটে মগজ বেরিয়ে গেল। আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। নাসির আরও দু'তিন জনকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো ওদের বাড়ির দিকে। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে। বাহাবা দিচ্ছে কেউ কেউ। আমি শুধু বোবা চোখে তাকিয়ে দেখছি। অবশ্য এদের মধ্যে বাঙালি ছিল কিনা আমি দেখি নি তবে আজ মনে হয় নিশ্চয়ই ছিল, তা না হলে আমাদের

এত বড় সর্বনাশ করলো কে?

আপা, ফাতেমা মরলো, ওই দিনই, ওই বস্তিতেই। বাপ ছেলে একই মেয়ের ওপর বলাৎকার করেছে শুনেছেন আপনারা? ওই পিশাচরা তাও করেছে। আমি একা নই আমাদের সোনাডাঙ্গা গ্রাম থেকে মা মেয়েকে এনেছে এক সঙ্গে, দু'জনকে পরস্পরের সামনে ধর্ষণ করেছে। হায়রে পাকিস্তানি সেনারা, কোথায় ছিল তখন তারা। তারা যখন আমাদের পেয়েছে আমরা তখন সবাই উচ্ছিষ্ট। চার-পাঁচদিন পর আমাদের একটা খোলা ট্রাকে করে যশোর নিয়ে এলো। আমরা দু'হাতে মুখ ঢেকে বসেছিলাম। জনতা হর্ষধ্বনি দিচ্ছিলো। চোখে দেখি নি, কিন্তু মেয়ে মানুষের গলাও শুনেছি। জানি আপনারা বিশ্বাস করবেন না। কি করে করবেন? নিজেরা অমন বিপদে পড়েননি? আমার গা টা কেঁপে উঠলো। সত্যিই তো এমন বিপদের মুখোমুখি তো ছিলাম তবুও কিন্তু আল্লাহ্ বাঁচিয়েছেন? কি বললেন আপা, আল্লাহ্ বাঁচিয়েছেন। একটু তীর্যক হেসে ফাতেমা বললো, আল্লাহ্ কিন্তু বড় লোকের ডাক খুব শোনেন, গরীবের দিকে কান দেবার সময় কোথায়? ওর ম্লান হাসি দেখে মনে পড়লো একাত্তরে অসহযোগ আন্দোলনের সময় মীরপুরের বিহারীরা কিছু ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলো। আমার একটি ছোট নাতনি তার বাবা-মার সঙ্গে দ্বিতীয় রাজধানীতে ছিল। আমাকে ফোন করে ভয়ে কাঁদছিল। আমি বললাম, নানু আল্লাহ্কে ডাকো। ও আরো জোরে কেঁদে উঠে বললো, নানু আল্লাহ্ বাংলা বোঝেন না। কতো ডাকছি শোনে না। মনে হলো লীনার অসহায় শিশুকণ্ঠ আমি আবার শুনলাম। আপা সারাদিন রাত আল্লাহ্কে ডেকেছি, কি লাভ হয়েছে? আজ আমার খেতাব ফতি পাগলী। যশোরে নামমাত্র মূল্যে আমরা বিক্রি হলাম। অর্থাৎ নাসির আলী হয়তো কারো হাতের পিঠ চাপড়ানো পেয়েছিল। দৈহিক নির্যাতন সয়ে এসেছি। পাকিস্তানি সৈন্য দেখলে ভয় করতো কিন্তু ওদের ভেতর ভালোমন্দ ছিল। কিন্তু নাসির আলীরা সত্যিই বেঈমান, কুত্তার বাচ্চা। অবশ্য জানেন আপা, সোনা আর তার সঙ্গের মুক্তিযোদ্ধারা নাসিরকে টুকরো টুকরো করেছে, কিন্তু ওদের দুঃখ কুকুর ধরে এনেছিল কিন্তু কুকুর ওর গোশত খায় নি। আপা, কুকুরেরও একটা জাত বিচার আছে। ওরা তো মানুষ না, তাই রক্ষা।

এখানে খাওয়া দিতো। ডাল, রুটি, ভাজি, রুটি আর সকালে চা-ও রুটি খেতাম। জানেন, মায়ের দেওয়া দুধ ভাত ফেলে দিয়েছি। কিন্তু শত্রুর দেওয়া জঘন্য খাবার পেট পুরে খেয়েছি। কারণ আমি ঠিক করেছিলাম আমি বাঁচবো, আমাকে বাঁচতে হবে এবং পোনার হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবো। আমার তো সবই গেছে, আছে শুধু জানটুকু। এটুকুই আমি পোনার জন্য জিঁইয়ে রাখবো। যদি কখনও ছাড়া পাই ওই নাসিরকে আমি দেখে নেবো। তবে আমার কেন জানি না বিশ্বাস ছিল

বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, বঙ্গবন্ধু ফিরে আসবেন। কিন্তু যখন ভাবতাম আমি আর ওদের মাঝে ফিরে যাবো না, বিজয়ী বঙ্গবন্ধুকে দেখতে পারবো না তখন চোখ ফেটে পানি আসতো, বুক ভেঙে যেতে চাইতো। কিন্তু আপা, আমি পেয়েছি। ঢাকায় সোনা আমাকে দূর থেকে বঙ্গবন্ধুকে দেখিয়ে এনেছে কিন্তু তখন কেন যেন আমার মনে হলো বঙ্গবন্ধুর চোখের আগুন অনেকটা নিভে এসেছে। হয়তো-বা দেশ স্বাধীন হয়েছে এখন সর্বত্রই শান্তি দরকার। সোনা সেনাবাহিনীতে কাজ পেলো, মনা কলেজে ভর্তি হলো। কিন্তু আমি?

যশোরে আমাদের একটা ব্যারাক মতো লম্বা ঘরে রাখলো। অনেক মেয়ে ২০/২৫ জনের কম না। সবাই কিন্তু খুলনার না। বরিশাল, ফরিদপুর, যশোর এসব জায়গারও ছিল। তবে বেশির ভাগই আমার চেয়ে বয়সে বড়। একটাই মাত্র ১৪/১৫ বছরের বাচ্চা মেয়ে ছিল। খুব ফিস ফিস করে কথা বলতে হতো। দু'পাশের দরজাতেই পাহারাদার, আর শকুনীর মতো জমাদারণীগুলো তো ছিলই। তবুও মনে হতো এরা নাসির আলীর চেয়ে ভালো। নাসিরের লোকজন আমাকে সমানে পিটিয়েছে, দেখে দাঁত বের করে হেসেছে। পানি পানি করে চিৎকার করলে মুখে প্রস্রাব করে দিয়েছে। আমি কখনো ভাবতেও পারি নি মানুষ নামের জীব এমন জঘন্য হতে পারে। পরে অবশ্য বুঝেছি আগুন থেকে তপ্ত কড়াইয়ে পড়েছি। একটা নারীদেহ যে এমন বীভৎসভাবে বিকৃত উপভোগ্য হতে পারে তা বোধ হয় মনোবিজ্ঞানীরাও জানে না। অতগুলো মেয়ে এক সঙ্গে। শেষে মনে হতো আমরা সবাই ঘৃণা, লজ্জা, ভয়কে জয় করে ফেলেছি। একদিন এমন একটা কুৎসিত ঘটনা ঘটলো যা আপনাকে আমি কি করে বলবো ভেবে পাচ্ছি না। তবুও বলতে হবে, কারণ মানুষ না হলে জানবে না এই ফতি পাগলী তার দেশের জন্যে কি নির্যাতন সহ্য করেছে। একটা হিংস্র সিপাই ছিলো, সবার সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করতো। আমার সঙ্গে অতিরিক্ত দুর্ব্যবহার করতো। কারণ আমি জানি না। হয়তো–বা আমার দৃষ্টিতে ঘৃণা থাকতো বা অন্য কিছু। পাশ দিয়ে গেলেই একটা লাথি ছুড়ে দিতো। অথবা মাথায় একটা চাঁটি মারতো। চুপ করে সইতে হতো কারণ এর তো কোনও প্রতিকার নেই।

লোকটা একদিন মনে হলো নেশা করে এসেছে, ইসলামে নাকি মদ্যপান নিষিদ্ধ ও সব আইন কানুন এই মেনীমুখো বাঙালি মুসলমানদের জন্যই প্রযোজ্য। ওদের অনেককেই আমি মাতাল অবস্থায় দেখেছি। অফিসাররা তো নিয়মিত ক্লাবে বাড়িতে সর্বত্রই মদ খেতো। সিপাইরা আলাপ করতো।

একদিন পাড় মাতাল হয়ে এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমাকে উলঙ্গ করে কামড়ে খামচেও ওর তৃপ্তি হলো না, ওর পুরুষাঙ্গটা জোর করে আমার মুখের

ভেতর ঢুকিয়ে দিলো। আমি নিরুপায় হয়ে আমার সব কটা দাঁত বসিয়ে দিলাম। লোকটা যন্ত্রণায় পশুর মতো একটা বীভৎস চিৎকার করে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিলো। আমি জানি আজই আমার শেষ দিন। আমাকে টেনে নিয়ে আমার পরনের লুঙ্গিটা দিয়ে আমার চুলের ঝুঁটি বেঁধে চেয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে পাখার সঙ্গে লটকে দিয়ে সুইচ অন করে দিলো। কয়েক মুহূর্ত চিৎকার করেছিলাম। তারপর আর জানি না, অন্য মেয়েরা বলেছে প্রথমে জানোয়ারগুলো হেসে উঠেছিল কিন্তু ভয়ে মরিয়া হয়ে মেয়েগুলো চিৎকার করায় বাইরে থেকে এক সুবেদার এসে পাখা বন্ধ করে দেয় ও আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যায়। ওই পশুটার কোর্ট মার্শাল হয়, তারপর আর ওকে দেখি নি। ৩/৪ দিন হাসপাতালে ছিলাম মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে। কিন্তু জ্বর ছেড়ে দিতেই আমাকে আবার ওই ব্যারাকে পাঠিয়ে দিলো। অবশ্য কয়েকদিন আমার উপর কোনও নির্যাতন করে নি ওই পশুরা। কিন্তু আবার যথাপূর্বম তথা পরম।

বাইরের কোনও খবর পেতাম না। কিচেন থেকে একটা ছোকরা আমাদের খাবার দিয়ে যেতো। বয়স বছর কুড়ি হবে। বলতো, আপামণি কয়টাদিন একটু সয়ে থাকেন যা মাইর খাচ্ছে এরা বেশি দিন টিকবে না। কিন্তু ভয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারতো না। এই লাঞ্ছিত মেয়েগুলোও কূটনামীতে কম যেতো না। এমনি করে একটা জমাদারণীর নামে লাগিয়েছিল একটা মাগুরার মেয়ে। জমাদারণীটাকে নাকি শেষ পর্যন্ত মেরেই ফেলেছিল। ওই মেয়েটার সঙ্গে আমরা কেউ কথা বলতাম না, কিন্তু খুব ভয় পেতাম যদি বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলে। কিছুদিন পর ওকে অন্য কোথাও নিয়ে গেল। আমরা কিছুটা ভয়মুক্ত হলাম। কতোদিন হবে জানি না তবে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। ভোররাতের দিকে কম্বল গায়ে দিই। আশ্বিন মাসে হবে বোধ হয়; একদিন আমাদের ছ'জনকে নিয়ে গেল। আমার কেন জানি না মনে হলো। যশোর থেকে কিছু লোকজন সরিয়ে ফেলবে। কারণ এটা তো ভারতের সীমান্ত। আগে কলকাতা যাবার সময় দেখেছি একটা বাঁশ টানা দিয়ে দু'দেশ ভাগ করা। কে জানে কি হচ্ছে বাইরে? আমাদের রাতে নিয়ে এলো তাও চোখ বেঁধে। যেখানে এলাম মনে হয় শহরতলীতে, লোকজন গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ নেই। অবশ্য সেটা বোধ হয় ভোররাত ছিল। সকালে দেখলাম গ্রামের মতো। ঘরে চারটে জানালা ছিল। কিন্তু অনেক ওপরে। ওগুলো দিয়ে আলো বাতাস আসে, কিন্তু বাইরের জগৎ দেখা যায় না। তবুও আলো আসে, দিন হয়, রাত কাটে। এটুকু তো অন্তত বোঝা যায়। লোকজনগুলোও অপেক্ষাকৃত কম হিংস্র এবং এখানে রোজ রাতেই তারা আমাদের উপর হামলা করতো না। মনে হলো এটা কোনও মধ্যবর্তী স্টেশন মতো। এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় যাবার পথে ওরা এখানে নামে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ

দিয়ে খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম করে। হঠাৎ করে হৈ চৈ হয় আবার সব শান্ত হয়ে যায়। এক এক দিন সদলবলে হামলা করে। পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা হয় আমাদের নিয়ে। তারপর আধমরা করে ফেলে রেখে আবার চলে যায়। এখনে আমরা নিচু গলায় কথা বলতে পারি কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে মন খুলে কথা বলার সাহস পাই না। জানি না তো কে কেমন, কার মনে কি আছে? যদি আবার লাগিয়ে দেয়। তবুও খাটো মতো একটা মেয়ে ছিল বরিশালের, নাম চাঁপা। সম্ভবত হিন্দু মেয়ে। ও দেয়ালে কান পেতে পেতে অনেক কথা শুনতো আর আমাকে বলতো। ও প্রায় সব সময়ই জানালার নিচে চুপ করে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতো। একদিন বললো, আমাদের এখানে অনেক লোক আসছে। শীঘ্রই ইন্ডিয়া যশোর আক্রমণ করবে। যশোরে যেসব অস্ত্র আছে তা দিয়ে ওদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই যশোর আক্রান্ত হলেই ওরা আত্মসমর্পণ করবে। এজন্য যাতে বেশি লোকক্ষয় না হয় সেজন্য ওদের একটু ভেতরে রাখবে। আত্মসমর্পণের পর তো আর অন্তত জানে মারবে না। আমার শেষের দিকে মনে হতো এসব কথা চাঁপা শোনে নি, কারণ অতো পুরু দেয়াল ভেদ করে শোনা কঠিন কাজ। তার উপর এসব কথা কি আর ওরা অতো জোরে জোরে বলবে। মনে হলো দিন রাত এসব কথা ভেবে ও নিজের মনেই এমন সব সিদ্ধান্তে এসেছে। শেষের দিকে আমার ভয় ভয় করতো, ও পাগল হয়ে যাবে নাকি। একেই আমার নিজের মাথায় যন্ত্রণা তার ওপর চাঁপার ওই সব আজগুবি কাহিনী আমাকে অস্থির করে তুললো। কিন্তু একদিন চাঁপা উত্তেজিতভাবে আমাকে এসে বললো, ফাতেমাদি, অনেক সোলজার এসেছে। আমি ক্রমাগত ট্রাকের শব্দ পাচ্ছি। খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে আমিও শুনলাম সত্যি সত্যি ট্রাকের চাকার শব্দ। একটু পরেই ভেতরে অনেক লোকের চলাফেরা ধুপধাপ শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু আগের মতো হট্টগোল নেই। সবাই যেন বেশ সংযত আচরণ করছে।

আমি চাঁপাকে জিজ্ঞেস করলাম, চাঁপা তুমি এতো সব জানো কি করে? চাঁপা হাসলো, জানি কি করে? আমি বরিশালের মেয়ে। আমাদের দেশের মুকুন্দদাসের নাম শুনেছো? বললাম, স্বদেশী যাত্রা তো? কয়েকটা গানও আমি জানি। চাঁপার মুখও উজ্জল হয়ে উঠলো, জানো? অশ্বিনী দত্তের নাম শুনেছো? বললাম, শুনেছি কিন্তু ওর সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। আসলে আমি তেমন শিক্ষিত ঘরের মেয়ে নই চাঁপা। তাই অতো কিছু জানি না। চাঁপা একটু চুপ করে থেকে বললো, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এই যুদ্ধ পর্যন্ত আমার বাবা ৮/৯ বছর জেলে ছিলেন। এখন কোথায়? আমি প্রশ্ন করলাম। চাঁপা মুখ তুলে ওপরের দিকে দেখালো, বাবা স্বর্গে গেছেন। যাকে বলে শহীদ হয়েছেন। বাবা, মা ও আমার ছোট ভাইকে মেরে আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে। বড় তিন ভাই আছে, জানি না তারা মুক্তিবাহিনীতে আছে, না

তারাও শহীদ হয়েছে। তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললাম, না, না, ওরা আছেন। তুমি ফিরে গিয়ে ওদের পাবে। উত্তরে চাঁপা বললো, মিথ্যে সান্ত্বনা দিও না ফাতেমাদি। আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমাকে যখন স্পর্শ করেছে তাও আবার পাকিস্তানি সৈন্য, আমি কিভাবে ঘরে ফিরে যাব? তাহলে তুমি কি করবে? করবো একটা কিছু তবে মরবো না। আমি হেরে যাবো না ফাতেমাদি। স্বাধীন বাংলাদেশে আমি স্বাধীন ভাবেই বাঁচবো। আশ্চর্য! রাত হলো, খাবার এলো কিন্তু রাতের অতিথিরা কেউ এলো না। চাঁপাকে জড়িয়ে ধরলাম। চাঁপা সুখবর তোমার কথাই ঠিক, জানোয়াররা গর্তে ঢুকেছে। নিঃশব্দে রাত পার হল। ফাতেমার মনে হলো দূরে বহুদূরে সে 'জয়বাংলা' ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। যুদ্ধের কামানের বন্দুকের আওয়াজ আসছে। সেও কি চাঁপার মতো মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে গেলো? চাঁপাও শুনেছে ওই শব্দ। সামনে একজন অফিসার এসে বললো, তোমাদের ছুটি দিয়ে দিলাম। তোমরা চলে যেতে পারো। চাঁপা রুখে দাঁড়ালো, আপনারা ছুটি দিলেই তো ছুটি নিতে পারি না স্যার। আমরা কোথায়, বাড়িঘর থেকে কতো দূরে কিছুই জানি না। তাছাড়া বিপদের দিনে আপনারা আমাদের জায়গা দিয়েছেন এখনও এক সঙ্গেই থাকবো। ভাগ্যে যা আছে সবার একরকমই হবে। ওর স্বচ্ছন্দ বাচনভঙ্গি আর ইংরেজি ও উর্দু ভাষার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। দু'জন অফিসার কি যেন কানে কানে ফিস ফিস করে বললো। শেষ পর্যন্ত বললো, ঠিক আছে তোমরা থাকো। তিন-চারজন যাবার জন্যে খুব চেঁচামেচি শুরু করলো। চাঁপা তাদের বললো, বোনেরা ধৈর্য ধরুন। এখন আপনারা বাইরে বেরুলে শত্রুর গুপ্তচর মনে করে আপনাদের গুলি করে মারবে মুক্তিবাহিনীরা। তাছাড়া আপনাদের দেখলে ওরা এদেরও খোঁজ পাবে। এখানে যুদ্ধ হবে। তার চেয়ে এরা যখন আত্মসমর্পণ করবে আমরা ওদের সাহায্য চাইবো, ওরা আমাদের বাড়ি-ঘরে পৌঁছে দেবে। যশোর থেকে গাড়ি এলো, মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর। এরা হাত তুলে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। ভারতীয় বাহিনীর একজন অফিসার আমাদের আলাদা একখানা ট্রাকে করে নিয়ে গেল। চাঁপা আর আমি জড়াজড়ি করে বসলাম–চাঁপা তোকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবো, যাবি? আমরা কিন্তু মুসলমান। চাঁপা বললো, আমার কোনো জাত নেই ফাতেমাদি। আমি তো মৃত। এই আমি চাঁপার লাশ। যে আমাকে জায়গা দেবে আমি তারই কাছে যাবো। আমাদের সোজা খুলনায় নিয়ে এলো। তারপর সব নাম ঠিকানা নিয়ে বললো টাকা পয়সা দিলে যেতে পারবো কিনা। বললাম পারবো, আর চাঁপাও আমার সঙ্গে যাবে।

একশ টাকার একখানা নোট হাতে করে রিকশা চেপে সোজা এসে উঠলাম সোনাডাঙ্গায় আমাদের বাড়িতে। বাবা আছেন। আমাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললাম, বাবা পোনাকে বাঁচাতে পারি নি তার বদলে তোমার জন্যে আরেক

মেয়ে এনেছি। চাঁপা বাবার পায়ে হাত দিতেই বাবা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমরা দু'জনে গোসল করে কাপড় বদলে মুড়ি আর গুড় নিয়ে বসলাম। বাবা বললেন, মাকে আনতে গেছে সোনা, তারা এসে পড়লো বলে। সোনা কাল ফিরেছে। অনেক রাতে। বাবা, মনা কেমন আছে? ভালো, কিন্তু সেও তো ছিল না। সে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ছিল। ও ফিরেছে ৪/৫ দিন আগে। শরীর এক এক জনের যা হয়েছে দেখলে চিনতে পারবি না মা। তোমার শরীর এমন করে ভেঙে গেছে কেন বাবা? তোর কথা ভেবে আমি আর তোর মা এক মিনিটও সুস্থির থাকতে পারি নি মা। নাসের আলী এখানে নানা কথা রটিয়েছে। আমরা অবশ্য দিনের বেলা আর এ বাড়িতে আসি নি। কখনও কখনও মনা রাতের বেলা এসে ঘুরে যেতো, ওর বন্ধু বান্ধবরাই বলেছে তুই নেই, তোকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে, মেরে ফেলেছে এইসব। সব মিথ্যে কথা বাবা, ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমি দূরে একটা গ্রামে চলে গিয়েছিলাম। সেখানেই তো ছিলাম। দেখো ভালোই আছি। বাবা আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন কিন্তু বুঝলাম আমার কোনও কথাই বিশ্বাস করলেন না। চাঁপাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন, ওকে অভয় দিলেন। সোনা, মনা ফিরে এলে ওর ভাইদের খবর এনে দেবে। ও অবশ্য ভাইদের কথা কিছুই বলে নি। এর ভেতর মা এসে পড়লেন। মাকে দেখে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম মায়ের গায়ের রঙ যেন পুড়ে কালো হয়ে গেছে, ক'খানা হাড়, চামড়া দিয়ে ঢাকা, আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছেলে মেয়ে দু'জনের জন্যেই কেঁদে আকুল হলেন। সোনার খবর তারা আগেই পেয়েছিলেন।

পেটের জ্বালা বড় ভয়ঙ্কর। মা উঠলেন, যাই হোক ডাল ভাত আলু সেদ্ধ করে সবাইকে খাওয়ালেন, নিজেও বোধহয় দশ মাস পর ভাত মুখে দিলেন। কিছুটা ভাত পাতের পাশে ঠেলে রাখলেন, মনে হলো পোনার ভাগটা সরিয়ে রাখলেন। আপা এ সর্বনাশ যার পরিবারে হয়েছে সেই শুধু এ বেদনার গভীরতা বোঝে। অন্যদের ক্ষমতা নেই এ দুঃসহ জ্বালা যন্ত্রণা উপলব্ধি করবার। আস্তে আস্তে সবই স্বাভাবিক হতে লাগলো। বাবা ক্ষেত-খামারে যান, আগের মতো বাজার হাটও করেন, ভাইয়ারাও কলেজে যায়, কিন্তু আমার কথা কেউ কিছু বলে না। একদিন বাবাকে বললাম, বাবা আমি কলেজে যাবো না? বাবা মাথা নিচু করে রইলেন। বললাম, কি হলো? কথা বলছো না যে, আমাকে আর পড়াবেনা? বাবা চাঁপাকে দেখিয়ে বললেন, তুই কলেজে গেলে ওই মেয়েটির কি উপায় হবে? কেন ওকেও স্কুলে ভর্তি করে দাও। বাবা বললেন, সেখানে তো ওর পরিচয়, ওর বাবার নাম সবই লাগবে দেখি কি করি। পরদিন সকালে বাবা গেলেন মতীন উকিলের বাড়ি। তাঁকে সব খুলে বললেন চাঁপার কথা এবং পরামর্শ চাইলেন। সতীশ বাবু রাজনীতি করেন। সকলে তাকে মান্যগণ্যও

করে। চাঁপার বাবার পরিচয় পেয়ে তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন, আমাকে দিন সাতেকের সময় দিন আমি ওর একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেবো। শেষ পর্যন্ত চাঁপার ব্যবস্থা হলো। ঢাকায় নার্সিং এ চাঁপা ভর্তি হলো। এখন সামান্য টাকা পাবে অবশ্য তাতে ওর হয়ে যাবে। তারপর ট্রেনিং শেষ হলে ভালো মাইনে পাবে। চোখের জলে বুক ভিজিয়ে চাঁপা চলে গেল। তবে আজও চাঁপা ছুটি হলেই আমাদের বাড়িতে আসে। ও বিয়ে করেছে একজন মুসলিম ডাক্তারকে। ওর দু'টি মেয়ে। চাকুরি ছাড়ে নি। মোটামুটি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আপা, পরের আশ্রিত আশ্রয় পেলো কিন্তু আমার কোনও গতি হলো না। কলেজে আর গেলাম না, প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বিএ পাশ করলাম। তারপর কত জায়গায় গেলাম চাকুরির আশায়, কিন্তু না, বীরাঙ্গনাকে জায়গা দিয়ে কেউ ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে রাজি না। স্কুলে চাকরি হবে না। মেয়েদের সামনে একজন চরিত্রহীন নষ্টা মেয়েকে আদর্শ রাখা যায় না। আমি পাগল হবার মতো অবস্থায় এলাম আপা। শেষ পর্যন্ত বাবা ঠিক করলেন আমার বিয়ে দেবেন। শুরু হলো পাত্র খোঁজা। অবশ্য যেখানেই বাবা কথা বলেছেন সবই খুলে বলেছেন। শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় বাবার সবকিছু মন মতো হলো কিন্তু ছেলে ম্যাট্রিক পাশ। মা বললেন, সে কি করে হবে? আমার মেয়ে বিএ পাশ, বিয়ে দেবো ম্যাট্রিক পাশের সাথে। লোকে হাসবে না? তুমি আরেকটু দেখো ততোদিনে বাবারও ধৈর্যচ্যুতি হতে বসেছে। না, ছেলের স্বাস্থ্য, চেহারা ভালো, যথেষ্ট জমিজমা আছে, খাওয়া পরার অভাব হবে না। তিন ভাই, এটিই সবচেয়ে ছোট। বড়রা কেউ লেখাপড়া করে নি। এই ছোট ছেলেই করেছিল। তারপর ব্যবসায় ঢুকে যায় ফলে আর পড়াশুনা করা হয়ে ওঠে নি।

শুভদিন শুভক্ষণে বিয়ে হয়ে গেল। ফাতেমা সত্যিই সুখী হলো। তাহের বেশ উঁচু মনের ছেলে। ফাতেমা নিজের কথা বলতেই তাহের তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। ও সব বলো না ফাতেমা, আমরা তোমাদের রক্ষা করতে পারি নি। আমরা আমাদের কর্তব্য করি নি। আর সেজন্য শাস্তি দেবো তোমাদের, তা হয় না। তুমি আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, আমরা তোমাকে মাথায় করে রাখবো। মিথ্যে কথা বলে নি তাহের। সে ফাতেমাকে মাথায় করেই রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধের ওপর বই বেরুলেই ফাতেমাকে কিনে এনে দিতো। তাহের বুঝেছিল একখানা শাড়ির চেয়ে ফাতেমার কাছে একখানা বই অনেক বড়। ফাতেমার শ্বশুরও বেশ বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ। একদিন এসে খবর দিলেন ফাতেমাকে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াবার জন্য পাড়ার লোকেরা তাঁকে ধরেছে। ফাতেমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তিনি ওদের বলবেন। ফাতেমার ইচ্ছা পূর্ণ হলো। তার স্কুলে চাকুরিও হয়ে গেল। শ্বশুর মাইনে নিতে না করে দিলেন। ফাতেমা কিন্তু তাতে রাজি হয় নি।

সকাল সকাল ভাত খেয়ে স্কুলে চলে যায় ফিরে আসে বিকালে দুটোর সময়। শাশুড়ি সন্তুষ্ট না, ফাতেমা বোঝে। নানা রকম ভাবে তাঁকে খুশি করতে চেষ্টা করে কিন্তু তিনি গাল ফুলিয়েই থাকেন, ছেলের কাছে নানা কথা বলেন। তাহের একদিন বললো, ফাতেমা, আম্মা যখন চান না, তখন তুমি কাজটা না হয় ছেড়েই দাও। এক সময় ফাতেমা অন্তঃসত্ত্বা হলো। শাশুড়ি আরো ক্ষেপে গেলেন। পাঁচ-ছ'মাসের গর্ভাবস্থায় তাকে চাকুরি ছাড়তে হলো। শাশুড়ি তার দৈহিক অবস্থা নিয়ে নানা কটু কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাহেরের ব্যবসারও বেশ উন্নতি হচ্ছে। সে নিত্য নতুন জিনিস এনে ঘর সাজিয়ে তুলছে। ফাতেমা বাপের বাড়িতে খুব কম যায়। নেহায়েৎ বাবা নিতে এলে তাঁকে ফেরায় না, না হলে যেতে চায় না। দায় মুক্ত হবার জন্য যে তার বাবা একটি অশিক্ষিত পাত্রের হাতে তাকে সমর্পণ করেছেন এটা ফাতেমা ভুলতে পারে না। মনা ভালো চাকুরি করে। এখন ক্যাপ্টেন। বিএ পাশ মেয়ে বিয়ে করেছে। যদিও ওরা সবাই ওকে ও তাহেরকে খুবই মান মর্যাদা দেয় তবুও ফাতেমার কোথায় যেন একটা অসম স্তরের কাঁটা ফুটে থাকে, সে তেমন করে সহজ হতে পারে না। বাবা-মা ভাবেন, নিজের অনেক বড় ঘর সংসার ফেলে সে কেমন করে থাকবে। অন্য জায়েরা নিজের বাড়িতে থাকে। বুড়ো শ্বশুর শাশুড়িকে তারই দেখতে হয়।

একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে হলো ফাতেমার। নাম রাখলো চাঁপা। খবর পেয়ে চাঁপা এলো দেখতে। কতো কিছু এনেছে ফাতেমার মেয়ের জন্য। ওর স্বামী ডঃ করিম আসতে পারেন নি, ছুটি পান নি। চাঁপার একটি ছেলে দু'বছর বয়স। শাশুড়ির কাছে রেখে এসেছে। ফাতেমা খুব রাগ করলো এমন ভাবে বাচ্চাকে ও দুলাভাইকে রেখে আসবার জন্য। মুখের আদল কিন্তু অনেকটা চাঁপার মতোই। ও পেটে থাকতে ফাতেমা দিন-রাত চাঁপাকেই ভেবেছে। এ নিয়ে দু'বন্ধুর কতো গল্প কতো হাসাহাসি। তাহের যত্নের ক্রুটি করে নি। দামি একটি শাড়িও এনে দিয়েছে ফাতেমার হাতে চাঁপাকে দেবার জন্যে। চাঁপা খুব খুশি হয়ে বললো, ভাই, আমার পিতৃছুলে কেউ নেই। আপনি হইলেন আমার ভাই। না, চাঁপার ভায়েরা কোনও যোগাযোগ রাখতে রাজি হয় নি। তাই শেষ পর্যন্ত চাঁপা দেশের ছেলে ডঃ করিমকে বিয়ে করেছে। ভালোই করেছে, নইলে কোথায় ভেসে যেতো তার কি ঠিক ছিল। আজ যদি ফাতেমার বাবা-মা না থাকতেন তাহলে সোনা, মনা, কি তার জন্যে এতোটা করতো। কখনই না। বাপ-মায়ের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় ভাইদের পক্ষ থেকে কি তা আশা করা যায়, না আশা করা উচিত? চলে গেল চাঁপা। ফাতেমার দিন আর কাটে না। চাঁপা তো তার শাশুড়ির কাছেই থাকে সর্বক্ষণ শুধু কাঁদলে ওর কাছে নিয়ে আসেন খিদে মেটাবার জন্য। ফাতেমা বিরক্ত হয় আবার ভাবে ও বৃদ্ধ মহিলা কি নিয়ে থাকবেন। পেয়েছেন একটা খেলনা, সারাদিন তাই নিয়ে খেলেন। ওকে তেল

মাখান, কাজল পরান, গান গেয়ে ঘুম পাড়ান। উনি একটা পরিপূর্ণ জীবন পেয়েছেন। এবার ফাতেমা তাহেরকে ধরে বসলো শ্বশুরকে বলে তার আগের চাকুরিটা পাইয়ে দেবার জন্য। তাহের এই কথায় রাজি হলো না। বললো, তুমি এখন ঘরের গিন্নি। সংসার তোমার মাথায়। মা তো অষ্টপ্রহর চাঁপাকে নিয়েই আছেন, তুমি কেন নিজেকে সুখী ভাবতে পারো না ফাতেমা। আমি তো তোমাকে পেয়ে বেহেশ্‌তে বাস করছি। ফাতেমা বলে, তাহের তুমি দেখলে না চাঁপাকে? ইচ্ছে হলো হুট করে দেখতে এলো। আমি যেতে পারবো ওভাবে ওর ছেলেকে দেখতে? কেন পারবে না? আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে জানি কিন্তু আমি নিজের থেকে নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারবো না কেন? জানো, চাঁপা নিজে উপার্জন করে, স্বাবলম্বী, তাই ইচ্ছেমতো চলাফেরাই শুধু নয় কাজ কর্মও করতে পারে। দেখো আমি যদি কাল মাকে দেখতে যেতে চাই তাহলে তোমার মায়ের অনুমতি নিতে হবে, কেন? কে বলেছে অনুমতি নিতে হবে ফাতেমা? এসব কি তোমার মাথায় ঢুকছে? মা কি কখনও কোনোদিন তোমাকে ও বাড়িতে যেতে বারণ করেছেন? ফাতেমা মুখ নিচু করে বসে থাকে। আজকাল তাহেরেরও সব সময় ফাতেমার এই অকারণ আপত্তি আর জিদ ভালো লাগে না। অথচ মা তাকে খুবই ভালোবাসেন, বৌ অন্ত প্রাণ। ফাতেমাও মাকে নিজের মায়ের চেয়ে কম ভালোবাসে না, তাহলে কেন এই জটিলতা?

ফাতেমা আজকাল প্রায়ই বলে ওর মাথায় একটা যন্ত্রণা হয়। কঁকিয়ে কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে যায়। মা বার বার বলছেন, তাহের বউকে ভালো ডাক্তার দেখা। ডাক্তার দেখানো হলো। মাথার এক্স-রে হলো। কিন্তু রোগের প্রকৃত ইতিহাস ফাতেমা কাউকে বলতে পারলো না। শুধু বললো পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছে। ডাক্তার খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। বললেন—ঢাকায় নিয়ে গিয়ে একজন বড় ডাক্তার দেখিয়ে আনেন। ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন। ফাতেমার বড় বড় চোখ থেকে মুক্তোদানার মতো চোখের জল ঝরে পড়ে। মনে হয় ওর সব সৌভাগ্য বুঝি ধুয়ে গেল। ফাতেমা আবার সন্তানসম্ভবা। চাঁপার বয়স মাত্র দু'বছর। শ্বশুর-শাশুড়ির খুশির সীমা নেই, বউকে কতো যে যত্ন করেন, ফাতেমার চাকুরি করবার পাগলামীও কিছুটা কমেছে, সম্ভবত পরিস্থিতি উপলব্ধি করে। এর ভেতর একটা দুঃসংবাদ পেলো ফাতেমা চাঁপার চিঠিতে। 'ফাতেমাদি, আমি এখন স্বাধীন বাংলার স্বাধীন নাগরিক। করিম আমাকে তালাক দিয়েছে। অবশ্য বাবলুকে আমি রেখে দিয়েছি। ওর বয়স এখন পাঁচ, আমার শাশুড়ি আমার জন্য খুব কান্নাকাটি করেছেন। মনে হয় বাবলুকে ছেড়ে উনি বাঁচবেন না। আমি মাঝে মাঝে বাবলুকে ওর কাছে দিয়ে আসি। কিন্তু এভাবে তো আর বেশিদিন চলবে না। করিম এখানকার এক লেডী ডাক্তারকে বিয়ে

করবে ঠিক করেছে। মহিলার রুচি দেখে আমি অবাক হলাম। আমি কিছুদিন আগে ঢাকায় পাঁচকাঠা জমি কিনেছিলাম। করিম হঠাৎ ওর নামে লিখে দেবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি শুরু করে। ও ওখানে চেম্বার করবে। কিন্তু জমি আমার নামে থাকলে ক্ষতি কি? রোজ রোজ এক কথা নিয়ে ঝগড়া ঝাটি আমার ভালো লাগে না। আমি ব্যবস্থা করবার জন্য উকিলের কাছে গেলাম। উনি জমির কাগজপত্র সাবধানে রাখতে বললেন এবং পরিষ্কার বললেন, আপনার স্বামীর কোনও কুমতলব আছে আপনি সাবধানে থাকবেন। শেষে সত্যিই একদিন বলে বসলো জমি ওকে লিখে না দিলে ও আমাকে তালাক দেবে এবং দিলোও তাই। আমি প্রতিবাদ করি নি। কারণ সে একটা হৃদয়হীন লম্পট এ আমি আগেই বুঝেছিলাম। তাই নিঃশব্দে সরে এসেছি। আমার জন্য কষ্ট পেয়ো না। ফাতেমাদি, এতো দুঃখ পার হয়ে যখন এসেছি তখন নিশ্চয়ই বাবলুকে বড় করতে পারবো। তাহের ভাইকে বলো সময় ও সুযোগ পেলে তোমাদের কাছে থেকে বেরিয়ে আসবো।' চিঠি পড়ে তাহের অবাক হয়ে গেল। বললো, আমরা অশিক্ষিত মূর্খ, ভাইসাহেব শিক্ষিত, একজন ডাক্তার এমন কাজ করলেন কি করে? তাহের বললো, চিঠির উত্তর আমি দেবো। তুমি আর এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না লক্ষ্মীটি। ফাতেমা এখন আর তর্ক বিতর্ক ঝগড়াঝাটি করে না? সব সময়ই প্রায় চুপ চাপ থাকে না হয় বইপত্র পড়ে। তাহের লক্ষ্য করে, তার বিদ্যায় যতোটুকু কুলায় সে বই পছন্দ করে কিনে নিয়ে আসে। তাহেরের বাবা-মা দু'জনেরই বয়স হয়েছে, ফাতেমা চেষ্টা করে ওদের সেবাযত্ন করতে। কিন্তু ওর অসুস্থতার জন্য শাশুড়ি ওকে কিছু করতে দেয় না। একটা কাজের বুয়া রেখেছেন। এখন ও নিজেই সব দেখাশুনা করেন।

ছেলে হয় ফাতেমার। একেবারে তাহেরের মুখ। সবাই খুব খুশি। ফাতেমাও খুশি, কিন্তু মাসখানেকের ভেতর আবার সেই মাথার যন্ত্রণাটা বাড়লো। সারারাত বসে থাকে, ঘুমায় না। তাহেরকে বলে, চুপ, শোনো, ওই যে বুটের শব্দ। ট্রাকের শব্দ পাচ্ছোনা ওঃ বাবা আমার মাথা ছিঁড়ে গেল আমায় ছেড়ে দাও। তাহের বুঝতে পারে কি অমানুষিক অত্যাচারের ভেতর দিয়ে ওর দিন কাটছে। এক এক সময় ওকে বুকে নিয়ে তাহের কাঁদে, ভাবে কি করবে ওকে নিয়ে। একদিন বাড়ির কাজের ছেলেটা হাঁপাতে হাঁপাতে দোকানে এসে হাজির। ভাবি বাড়িতে নেই, কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছে। দাদি আম্মা কাঁদছে। তাহের ছুটে বেরিয়ে গেল। ওর বাপের বাড়িতেই আগে গেল। ওরা বললো, কয়েকদিন আগে একবার এসেছিল কিন্তু আজ তো আসে নি। তাহেরের মাথায় বজ্রপাত হলো। আল্লাহ্ এ তুমি আমার জীবনে কি অঘটন ঘটালে। ফাতেমার মতো একটা সহজ সরল, নিষ্পাপ মেয়ের ভাগ্য এমনিই বিড়ম্বনায় ভরে যাবে? তাহের আর দেরি না করে বিহারী কলোনীর দিকে ছুটলো তার

হুণ্ডা নিয়ে। রাস্তায় মনার এক বন্ধু হাত উঁচু করে তাকে থামিয়ে বললো, বুবু বিহারী কলোনীর দিকে গেছে। আমি অনেক সাধলাম। তাহের ছুটে গিয়ে দেখলো খুব ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে ফাতেমা আর নিজের মনে বিড় বিড় করছে। তাহের ওর সামনে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে আস্তে ওর কাঁধে হাত দিতেই ও চমকে উঠলো, তারপর তাহেরকে জড়িয়ে ধরে হাত জোড় করে কেঁদে উঠলো, তুমি? তুমি এসেছো? এই যে এইখানে, আমার ছোট ভাই পোনাকে নাসির আলি আছড়ে মেরেছিল। জানি, আমি সবজানি, ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললো তাহের। ফাতেমা বাড়ি চলো। বাচ্চারা কাঁদছে। অতি সহজে সে তাহেরের হোন্ডার পেছনে উঠে বসলো এবং স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িতে এলো। যেন কিছুই হয় নি। শাশুড়িকে দেখে ছুটে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, আম্মাগো, আমার বড় কষ্ট গো আম্মা। জানিরে মা, আমি সব জানি। আমার বুকে আয়, তোর মন শান্ত হবে। তাহের, ওর আব্বা কারও চোখই আর শুকনো ছিল না। বাচ্চা দুটোও কাঁদতে শুরু করেছে। এবার তাহের মরিয়া হলো ওর চিকিৎসার জন্য। চাঁপা লিখেছে ও ফাতেমাকে নিয়ে কলকাতা যাবে। ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তাহের যেন ফাতেমার পাসপোর্ট নিয়ে ঢাকায় আসে। সম্ভব হলে যেন হাজার কুড়ির মতো টাকার যোগাড় করে, আর সম্ভব না হলে যে-ভাবেই হোক চাঁপা টাকার যোগাড় করবে।

তাহেরের অবস্থা বেশ ভালো। জমির আয় ছাড়া এখন ও ধান চালের ব্যবসাও করে। নির্দিষ্ট সময় তাহের ফাতেমাকে নিয়ে ঢাকায় গেল। তবে যাবার সময় চাঁপা আর খোকনের জন্য বেশ মন খারাপ করলো। শাশুড়িকে বার বার সাবধানে থাকতে বললো, শ্বশুরের পা ধরে সালাম করে ওর বুকে মুখ রেখে কেঁদে বললো, আব্বা আমার জন্য দোয়া করবেন। যেন ভালো হয়ে ফিরে এসে আপনার ও আম্মার সেবা করতে পারি। শ্বশুর তো শিশুর মতো হাউ মাউ করে কাঁদলেন। তাহেরের হাতে হাত ধরে বললেন, বাপ, আমার মায়ের অযত্ন করিস না। চাঁপা সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। ভিসা নিতে একদিন সময় লাগলো।

যে ডাক্তারের কাছে চাঁপা ফাতেমাকে নিয়ে গেল তিনি চাঁপার বাবার খুব অনুগত রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। সুতরাং ফাতেমার যত্নের অভাব হলো না। সব দেখে শুনে তিনি বললেন, ওর মাথায় একটা অপারেশন করতে হবে। আশা করি ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। যে কথা তাহের জানে না সেই কথাই চাঁপা ডাক্তারকে বললো। সে নির্মম কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সে নিজেও কেঁদে উঠলো। ডাক্তার নিচু হয়ে চাঁপাকে প্রণাম করলো। দিদি, আপনারা প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আশ্চর্য এতো ত্যাগ স্বীকার করে দেশ স্বাধীন করলো বাঙালিরা, আর মা-বোনের দেয়া ত্যাগের মূল্য দিতে পারলো না। দুর্ভাগ্য সে দেশের!

ঠিক মতো অপারেশন হলো। সব সুদ্ধ দশদিন থাকতে হলো ডাক্তারের ক্লিনিকে। ঔষধ পত্রের দাম ছাড়া ডাক্তার একটি পয়সাও নিলেন না। তাহের বোকা বনে গেল। তাহের চাঁপাকে বললো, দিদি, আপনি একটা ব্যবস্থা করুন। চাঁপা পাঁচ হাজার টাকা ডাক্তার চৌধুরীকে দিয়ে বললো, টাকা জমা রাখেন ডাক্তার সাহেব। আমাদের মতো কোনও হতভাগিনীর যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে খরচ করবেন। আর ডাক্তারের বউকে একটা দামি শাড়ি, ফল, মিষ্টি, নিয়ে দু'জনে বাড়িতে দেখা করতে গেল। যে সম্মান তারা সেদিন করেছিল ফাতেমা তা কখনও ভুলবে না। ঢাকা ফিরে এলো। তাহের কলকাতা থেকে আব্বাকে ফোনে দু'দিন পর পরই খবর জানিয়েছে। ঢাকা ফিরেই ফোন করে জানালো, ফাতেমা খুব ক্লান্ত। চাঁপার ওখানে দু'দিন থেকে ফিরে আসবে। আল্লাহ্র রহমতে ওরা সবাই ভালো আছে। আসলে তাহেরের বড় ইচ্ছা চাঁপা আর ফাতেমাকে নিয়ে ঢাকায় একটু ঘোরাফেরা করে। ফাতেমা কলকাতা থেকেই চাঁপার জন্য শাড়ি, বাবলুর জন্য জামা কাপড় খেলনা, নিজের ছেলেমেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি সবার জন্য প্রাণভরে জিনিসপত্র এনেছে। ঢাকায় খুব ঘুরে বেড়ালো। সাভার শহীদ স্মৃতিসৌধ দেখতে নিয়ে তাহেরকে বললো ফাতেমা, শহীদ হলে এখানেই তো থাকতাম। তাহের সহজ হেসে বললো, আমাকে পেতে কোথায়? ফাতেমা কৃতজ্ঞতায় চোখ নামিয়ে নেয়। মীরপুর গেল, রায়ের বাজার গেল শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে চাঁপাকে নিয়ে বত্রিশ নম্বরে গেল বঙ্গবন্ধুর বাড়ি দেখতে। আশ্চর্য চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে বঙ্গবন্ধু ওপরে ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, ওর মাথার দিকে। হাসছেন, বললেন, আমি তোদের বীরাঙ্গনা বলে ডেকেছি। তোরা কি ব্যর্থ হতে পারিস। কখনোই না। আমার আশীর্বাদ রইলো তোদের ওপর। সেন্ট্রি ঢুকতে দিতে চায় না। ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন সব শুনে ওদের নিয়ে ভেতরে গেলেন। সামনে বঙ্গবন্ধুর বিশাল প্রতিকৃতি। ওখানে সালাম করে ফাতেমা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। পথে পা দিয়ে আফসোস করলো, খেয়াল নেই কিছু ফুল থাকলে ভালো হতো। অবশ্য আগে তো বুঝতে পারি নি যে ভেতরে যাবার সৌভাগ্য আমার হবে। আনন্দ উল্লাসের ভেতর দিয়ে ফিরে এলো ওরা। চাঁপাকে শুধু ফাতেমা বললো, তুই আমাকে জীবন দিলি, আমি তো তোকে কিছুই দিতে পারলাম না। চাঁপা ওকে জড়িয়ে ধরে বললো, ফাতেমাদি, তুমি তো নিজেকেই আমায় দিয়ে দিয়েছো। আমি আর কি চাইবো বলো? তবে যখন মন চাইবে তোমার শান্তির সংসারে গিয়ে কয়টা দিন থেকে আসবো।

একেবারে প্রথম জীবনে উচ্ছলতা নিয়ে ফিরে এলো ফাতেমা। শ্বশুর-শাশুড়ি আনন্দে আত্মহারা। ফাতেমা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে ভরে দিলো। কারণ ও মনে করতে পারে না চাঁপাকে কখনও কোলে নিয়েছে কিনা। গাল ফুলিয়ে

খোকন দাঁড়িয়ে আছে দাদির হাত ধরে। কোলে নিতে গেলে ছোট দুটো হাত দিয়ে ঠেলে দিলো। সবাই হেসে উঠলো। খোকন লজ্জায় দাদির শাড়িতে মুখ লুকালো।

অনেক দিন আগের কথা, তেইশ বছর পার হয়ে গেছে। ১৯৭৩ সালে আমি খুলনা গেছি। দৌলতপুর কলেজে আমার কয়েকজন ছাত্র ছিল। ইচ্ছা ওদের একটু খোঁজ খবর নেয়া, কে কেমন আছে, দেশের খবর নেয়া ইত্যাদি। দেখলাম এক মহিলা কলেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি চাও তুমি? রক্তচোখ মেলে বললো, কলেজে পড়বো। বুঝলাম মেয়েটি স্বাভাবিক নয়। বললাম, তোমার নাম কি? নাম? ফতি পাগলী, হয়েছে। এবার যান। একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করায় বললো, উনি একজন বীরাঙ্গনা। উনি অসুস্থ, প্রায়ই আসেন। ঘুরে ঘুরে চলে যান। বাড়ি কাছেই, সোনাডাঙা। আমার সঙ্গে গাড়ি ছিলো। অনেক বুঝিয়ে ওকে নিয়ে গেলাম ওদের বাড়িতে, ওই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। ওর বাবা-মা ও দু'ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। কাহিনী শুনলাম। বললাম ঢাকা পূর্ণর্বাসন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। আমরা চিকিৎসা করাবো। ওরা শুনলেন কিন্তু তাৎক্ষণিক কোনও জবাব দিলেন না, ওদের ঠিকানা নিলাম। ওর ভাই দু'বার ঢাকায় এসে ওর খবর আমাকে দিয়ে গেছে। তারপর চাঁপা এসেছে, যোগাযোগ করেছে। ওর বিয়েতেও গিয়েছিলাম। এই হচ্ছে আমার বিবি ফাতেমার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র।

আমি যে ক'জন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎ পেয়েছি তাদের মধ্যে সর্বাধিক নির্যাতিত এই ফাতেমা। হয়তো তার নামের রক্ষাকবচ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আজ তাহের একজন প্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যবসায়ী। ফাতেমার মেয়ে চাঁপা আইএসসি পড়ে। সে তার খালাম্মা অর্থাৎ চাঁপার মতো ডাক্তার হবে। খোকন হতে চায় সাংবাদিক। ফাতেমা অনেক সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে। সে আজ সত্যিই মহিয়সী গরিয়সী ফাতেমা, আর বঙ্গবন্ধুর মানসকাম্য বাংলার বীরাঙ্গনা।

সাত

এ পাড়ার অনেকেই আমাকে চিনতো, চিনতো বললাম এ জন্যে যে, সে আজ বাইশ বছর আগেকার কথা। '৬৮ সালে বিয়ের পর আমি এ পাড়া থেকে চলে যাই। মৌচাক মার্কেট থেকে সোজা রামপুরা টিভি ভবনের দিকে মুখ করে সাত আট মিনিট হাঁটলেই দেখবেন হাতের দু'পাশে পর পর বেশ কয়েকটা গলি। ওরই একটাতে আমরা থাকতাম। তখন মিনা বললো ওকে এলাকার সবাই চিনতো। তখন তো ঢাকায় এমন মানুষের মাথা মানুষ খেতো না। ফাঁকা ফাঁকা বাড়িঘর। আমাদের পৈত্রিক বাড়ি নোয়াখালি। হাসছেন কিনা জানি না ছোটবেলা থেকেই দেশের নামটা বললে মানুষ নানা রকম মুখভঙ্গী করে। মা ফরিদপুরের মেয়ে। ওরা দু'জন কেমন করে যে এতোটা পথ অতিক্রম করে এক সূত্রে বাঁধা পড়লেন তারও ইতিহাস আছে। দাদু আর নানা দু'জনেই ঢাকায় কালেকটারিয়েটে চাকুরি করতেন। থাকতেন অল্প ভাড়ায় শহর থেকে দূরে, এখানে ছোট একতলা বাড়িতে। তাদের ঘনিষ্ঠতা অতি সহজে আমার বাবা-মাকে এক করেছিল। আমরা দুই বোন এক ভাই। ভাই বড়, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তখন কমার্স নিয়ে পড়ে, আমি মেজো, বিয়ের সময় সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে বিএ পড়ি। বেশ ধুম ধাম করেই সাধ্যাতীত খরচ করে বাবা প্রথম মেয়ের বিয়ে দিলেন। স্বামী হাসনাত তখন অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে চাকুরি করতেন। খুব তুচ্ছ চাকুরি নয়। আমাদের সংসার চারজনের মোটামুটি ভালোই চলে যেতো। সত্তর সালে আমার প্রথম মেয়ে ফাল্গুনীর জন্ম হয়। দু'পরিবারের প্রথম সন্তান। আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল সবার জীবনে। বাবা একেক দিন অফিস ফেরত সেই সদরঘাট থেকে ফার্মগেট চলে আসতেন। নাতনিকে আদর সোহাগ করে চলে যেতেন। আমার শাশুড়ি খুব খুশি, রোজ রোজ বেয়াইয়ের দেখা পাচ্ছেন। আমার শ্বশুর মারা গেছেন প্রায় বছর দশেক আগে। বাচ্চা থাকতো তার দাদির কাছে। আমাদের সিনেমা থিয়েটার বেড়ানো কোনোটারই কমতি ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে জাতির ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো। গণ-অভ্যুত্থান বিস্ফোরনুাখ আগ্নেয়গিরির আকার নিলো। তবুও বেশ একটা আনন্দে ছিলাম। দেশ স্বাধীন হবে।

কিন্তু ২৫শে মার্চের রাতে সকল মজার সমাপ্তি ঘটলো। ২৬শে সবাই ঘরে বন্ধ। স্বামী ২৫শে মার্চ ঢাকায় আসেন নি। গাজীপুরে রয়ে গেছেন। ২৭শে মার্চ সকাল থেকে লোকের মুখে মুখে এমন সব খবর আসতে লাগলো যে ভয় হলো, ফাল্গুনীর আব্বা বেঁচে আছে তো? শাশুড়ি কেঁদে কেঁদে বিছানা নিলেন। বাবা-মার খবর নেই। কে যোগাযোগ করবে। তরুণ ছেলেকে পথে বের করলে মিলিটারী গুলি করে মারবে। ওঃ সে কি দোজখের যন্ত্রণা! তিনদিনের দিন হাসনাত ফিরে এলো। ফ্যাক্টরী আক্রান্ত। অনেকে মারা গেছে। আল্লাহ্‌র মেহেরবান যে ও ফিরে আসতে পেরেছে। আমার ফাল্গুনীর কিসমতে ওর আব্বা বেঁচেছে। চারদিন পর আব্বা এলেন। বড় ভাইয়ের খবর পেয়েছেন লোক মারফত, সে এখন বাড়িতে আসবে না। এলেই বিপদ, তাই আব্বা মাকে আর মুন্নীকে নিয়ে দেশে চলে যাচ্ছেন। তিনি এসেছেন আমাদের নিতে। কিন্তু আমার শাশুড়ি ছেলেকে রেখে যেতে কিছুতেই রাজি হলেন না। দশ বছর আগে স্বামী হারিয়েছেন। এই ছেলে দু'টি নিয়ে তার জীবন। বললেন, বেয়াই সাহেব, আপনি আমিনাকে আর ফাল্গুনীকে নিয়ে যান। বাবা উত্তর দিলেন, ঠিক আছে। আপনি হাসনাতকে বলুন, আমি এখনই ওদের নিয়ে যাবো। কিন্তু আমার স্বামী কিছুতেই আমাদের যেতে দিলেন না। বাবার সঙ্গে অযৌক্তিক তর্ক করলেন। মিলিটারীরা নাকি তিনদিনে সব ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। শেখ মুজিব বন্দি, তার সঙ্গী–সাথীরা হয় মরেছে না হয় পালিয়েছে। আপনি আম্মাকে নিয়ে দেশে যান। প্রয়োজন হলে আমরা পরে যাবো। তখন কি যাবার সুযোগ পাবে বাবা? না পেলে যাবো না। বাবা আর কথা বাড়ালেন না। হাতটা তুলে আমার শাশুড়িকে সালাম জানালেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে হঠাৎ বাঁ হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। বাবার অভিজ্ঞতায় বাবা বুঝেছিলেন সেই আমাদের শেষ দেখা। ওরা শহর রাখবে না। আর বাবা মার খবর পাই নি। মাসখানেক আমরা ওভাবেই রইলাম। আমার দেওর ও স্বামী ঘর থেকে বেরুতো না। ঘরে যা ছিল তার থেকে অল্প স্বল্প করে দিন চলে যাচ্ছিল।

দিনটা একভাবে কাটে। কিন্তু রাত হলেই গা ছম ছম করে। এক মাস পার হতেই প্রায় রোজই ফার্মগেটে গোলাগুলি হতো। আমরা থাকতাম ইন্দিরা রোডে, একটু ভেতরে, তাই সুস্পষ্ট কিছু বোঝা যেতো না। তবে মাঝে মাঝে মনে হতো গুলি দু'পক্ষের। ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতো। সে-বার বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে বৃষ্টিও হয়েছিল অসম্ভব রকম। সারারাত মনে হয় কান খাড়া করে বসে কাটাতাম। আস্তে আস্তে লোকজন চলাচল শুরু হলো। আমার স্বামীর অফিস থেকে তলব এলো। আমরা শাশুড়ি-বৌ অনেক নিষেধ করলাম। কিন্তু ও শুনলো না। পরদিন ফিরে এসে বললো, না অথারিটি ঢাকায় থাকতে দেবে না। ওখানেই থাকতে হবে, ইচ্ছে করলে তোমরাও যেতে পারো। শাশুড়ি এবার বেঁকে বসলেন। উনি বিরক্ত হয়ে একাই চলে গেলেন।

আমি শাশুড়ির ওপর অসন্তুষ্ট হলাম। মনে মনে ভাবলাম, ভদ্রমহিলা তার ছোট ছেলের নিরাপত্তার কথাই ভাবলেন। অন্নদাতা বড় ছেলের দিকটা একটুও চিন্তা করলেন না। উনি মাসের প্রথম দিকে এসে মাইনের টাকা দিয়ে যান এবং একরাত থেকেই পরদিন গাজীপুর ফিরে যান। গোলাগুলির শব্দ এক রকম গা সওয়া হয়ে গেছে। এর ভেতর একদিন কি জানি কি হলো। বাড়ি ঘরের দরজা ভেঙে অল্পবয়সী ছেলেদের ধরে নিয়ে গেল। এবার ভয় পেলাম। এর ভেতর আজ দু'তিন দিন ফাল্গুনীর খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকতে পারছি না। বেরুতেই ভয় করে। কিন্তু সেদিন দুপুরের পর সে হঠাৎ ফিট হয়ে গেল। এখনও তার বয়স দু'বছর হয় নি। আমি পাগলের মতো দৌড়ে বেরিয়ে একটা রিকশা নিয়ে কাছেই বড় রাস্তার উপর একটা ডিসপেনসারিতে ঢুকলাম। কপাল ভালো ডাক্তার ছিলেন। সিস্টার ওকে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলো। ঠিক এই সময়ে হঠাৎ রাস্তায় গোলাগুলির শব্দ হলো। দু'তিনটা জিপ এসে থামলো। ডাক্তার রোগী দেখছে দেখে হঠাৎ আমার হাত ধরে টান দিলো। আমি চিৎকার করে উঠলাম। ডাক্তার কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ততোক্ষণে দু'তিন জনে কিল, লাথি, থাপ্পড় দিয়ে আমার চুল ধরে আমাকে জিপে নিয়ে তুললো। দু'তিন দিন অচৈতন্য পড়ে রইলাম। জ্ঞান এলে ভাবি আমার ফাল্গুনী কি বেঁচে আছে। যদি মার্চ মাসে বাবার সঙ্গে চলে যেতাম তাহলে তো এমন হতো না। শুধু হাসনাতের গোয়ার্তুমির জন্য আমাদের মা-মেয়ের প্রাণ গেল।

শুরু হলো অত্যাচারের পালা। শকুন যেমন করে মৃত পশুকে ঠুকরে ঠুকরে খায় তেমনি, কিবা রাত্রি কিবা দিন আমরা ওই অন্ধকার দোজখে পচতে লাগলাম। মাঝে মাঝে তারা ওপরে ডাকতো আমাদের। আমরা গোসল করতাম, কাপড় বদলাতাম তারপর আবার অন্ধকূপে। কারা আমাদের উপর অত্যাচার করতো, তারা বাঙালি না বিহারি, পাঞ্জাবি না পাঠান কিছুই বলতে পারবো না। ব্যাধিগ্রস্ত হলে তাকে নিয়ে যেতো। ভাবতাম যখন রোগে ধরবে অন্তত সেই সময়ে তো বাইরে যেতে পারবো, হাসপাতালে নেবে। পরে জেনেছি, হাসপাতালে নয় চিরকালের জন্য আলো হাওয়া দেখিয়ে দিতো। অর্থাৎ নির্বিচারে হত্যা করতো। মুক্তির পর অনেক মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে যাদের পেট চেরা, চোখ তোলা ইত্যাদি অবস্থায়। বুঝতে পারছেন কি অত্যাচার গেছে সেখানে। আমি এসেছি আগস্টে অর্থাৎ অনেকের তুলনায় অনেক দেরিতে। ফিস ফিস করে কথা বলতাম, বিভীষিকাময় কাহিনী শুনতাম। একমাত্র বাইরের ব্যক্তি আসতো জমাদারণী। সে কিছু সত্য কিছু কাল্পনিক কাহিনী শুনিয়ে যেতো। নানা রকম উপদেশ দিতো যাতে সহজে বাচ্চা না আসে। কারণ যদি বাচ্চা পেটে আসে আর ওরা যদি জানতে পারে তাহলে তো অমন করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খেলতে খেলতে মেরে ফেলবে। আস্তে আস্তে অন্ধকার চোখে সয়ে গেল। আবছা

আলোতেও অন্যকে দেখতে পেতাম, চিনতে পারতাম। মেরী নামের একটি খ্রিশ্চিয়ান মেয়ের সঙ্গে এর ভেতরেই আমার একটু ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। ও কলাকোপা বান্দুরার মেয়ে। চন্দ্রঘোনা হাসপাতালে নার্স ছিল। খাবার দেবার সময় হঠাৎ করে একটা জোরালো বাতি জ্বালাতো ফলে সবাই দু'হাতে চোখ ঢাকতাম, অনেকক্ষণ কিছু দেখতে পেতাম না। চোখের সামনে নীল নীল গোল বলের মতো ঘুরে বেড়াতো। বুঝতাম বেশিদিন এভাবে থাকলে অন্ধ হয়ে যাবো। কেনই-বা আমাদের এভাবে রেখেছে? পরে জেনেছিলাম বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধিদের এনে দেখাতো মেয়েদের ওপর অত্যাচার মিথ্যা কথা, কারণ ছাউনিতে কোনো মেয়েই নেই। অথচ আমরা অসংখ্য মেয়ে তখন ভূ-গর্ভের বাংকারে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি।

হঠাৎ করে গোলাগুলির আওয়াজ বেড়ে গেল। জমাদারণী বললো, সারাদেশে যুদ্ধ হচ্ছে আর পাকিস্তানিরা হেরে গিয়ে ঢাকায় এসে জমা হচ্ছে। ঢাকা শহরেও মুক্তিবাহিনী ঢুকে গেছে। ততোদিনে মুক্তিবাহিনীর নাম ও তার সংজ্ঞা আমার জানা হয়ে গেছে। বিশ্বাস হতো না, এতো কামান বন্দুকের সঙ্গে বাংলাদেশের খর্বাকার, কৃশ, অনাহারক্লিষ্ট যুবকেরা যুদ্ধ করছে। আর কি হচ্ছে তাতো জানি না। হঠাৎ বোমা পড়তে শুরু করলো। সে কি শব্দ! মাটি কেঁপে কেঁপে উঠলো। ভাবলাম সবাই মিলে মাটি চাপা পড়ে এখানেই মরে থাকবো। কোন দিন কোন সময়ে আমাদের কঙ্কালগুলো আবিষ্কার হবে। পাঁচ ছ'দিনের ভেতর সব শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। দিন-রাত শুধু গাড়ির শব্দ আর ওপরে লোকজনের আনাগোনা। আস্তে আস্তে শব্দ, চলাফেরা সবই কেমন যেন স্তিমিত হয়ে উঠলো। আমাদের দিন-রাতের অতিথিরা অনুপস্থিত। মেয়ে মানুষের রুচি অন্তর্হিত হয়েছে। এখন সম্ভবত জান বাঁচাবার চিন্তা। জমাদারণী বললো, পাকিস্তানিরা সারেন্ডার করবে। কিন্তু আমাদের? আমাদের কি হবে? বেঁচে গেলে আর কি! কেন আমাদের মেরে ফেললো না? আর মারা হবে না। যদি মুক্তি এসে দেখে তোমাদের মেরে ফেলেছে তাহলে তো ওদের কচু কাটা করবে। একটু ধৈর্য ধরো। সবাই বেরুতে পারবে।

সত্যিই একদিন সব চুপচাপ হয়ে গেল। আমাদের বাইরে ডাকা হলো। কোথায় নেবে? সেই জোরালো বাতিটা জ্বলে উঠলো। কে একজন বললো, বাহার আইয়ে মাইজী, মা আপনারা বাইরে আসুন। কি শুনছি আমি, আমাকে 'মা' সম্বোধন করছে। আর চারমাস আমি ছিলাম কুত্তী, হারামী, হারামজাদী, বন্যজীবের চেয়েও ইতর। হঠাৎ এতো আপ্যায়ন। মানুষকে বিশ্বাস করতে ভুলে গেছি। ভাববার সময় নেই। হাত ধরে ধরে আমাদের কংকালসার দেহগুলোকে মনে হয় যেন টেনে বের করলো। কেউ চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো, কেউ বোকার মতো কেউ হিস্টিরিয়া রোগীর মতো হেসেই চলেছে। আমাদের সবাইকে একটা ঘরে নিয়ে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় বদলাতে

বলা হলো। আমরা এতোদিনে সেপাইদের মতো হুকুম মানতে বাধ্য হয়ে গেছি। আচরণ করেছি পোষা কুকুরের মতো, এরপর খেতে দেওয়া হলো রুটি মাখন কলা। যন্ত্রের মতো কম বেশি সবাই খেলাম তারপর পাশেই একটা অফিস ঘরের মতো জায়গায় নিয়ে একে একে আমাদের নাম ঠিকানা নিলো। যাদের ঢাকায় ঠিকানা আছে তাদের ঢাকা ও গ্রামের দুটো ঠিকানাই নিলো। কেউ কেউ নিজের দায়িত্বে চলে গেল। আমরা ওখানেই রইলাম তিনচার দিন। যাদের বাবা নিতে এসেছেন তাদের ভেতর কয়েকজন বাবার সঙ্গে চলে গেল। মেরীকে নিয়ে গেলেন তেজগাঁ থেকে আসা একজন সিস্টার। সিস্টার ঠিক মায়ের মতো মেরীকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলেন। মেরীর সঙ্গে আমার আবারও কয়েকবার দেখা হয়েছে। ও হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ওর নিজের পেশায় নিযুক্ত আছে। বিয়েও করেছে একজন ব্রাদারকে। স্বপ্ন দেখছিলাম, হঠাৎ একজন বাঙালি অফিসার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোথায় যেতে চাই। আমি মাস দু'য়েকের অন্তঃসত্ত্বা। বললাম, আমাদের মতো মেয়েদের জন্য আপনারা কি কোনো আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছেন? নিশ্চয়ই, আপনি সেখানে যেতে চান? ঘাড় নাড়লাম। এই দেয়ালের বাইরে যেতে চাই আমি। এতো মূল্য দিয়ে কেনা স্বাধীন বাংলার বাতাস বুক ভরে নিয়ে দেখতে চাই, কেমন লাগে। ধানমন্ডি এলাম, ওখানে ডাক্তার নার্স সবাই আছেন। আমাকে দেখে বললেন, তুমি গর্ভবতী, আমরা গর্ভপাত করাবো। তোমার সম্মতি আছে। উত্তেজিত হয়ে বললাম, ডাক্তার সাহেব এখনই করুন। সস্নেহে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তোমাকে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। তুমি খুব দুর্বল, একটু খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নাও। ঠিক হয়ে যাবে। বললাম, ডাক্তার বাড়িতে আমার ফাল্গুনী নামে মেয়ে আছে, আমাকে দয়া করুন। তোমার মেয়ে আছে, আচ্ছা দেখি। তারপর এক সিস্টারকে ডেকে বললেন, সিস্টার মাথার চুল কেটে ভালো করে স্যাম্পু করে দিন। এতো বড় চুল কিন্তু এটা তো জট পাকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে। সম্ভবত মাথায় ঘাও হয়ে গেছে। একটু যত্ন করে ওর ব্যবস্থা করে দিন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলাম। কাটা চুলের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। সত্যিই আমার বড় বড় চুল ছিল। একদিন হাসনাত জিদ ধরলো আমাকে খোপা বেঁধে দেবে। চিরুনি ব্রাশ আর আমার চুলের সঙ্গে যুদ্ধ করে এক গোছা চুল ছিঁড়ে তবে থামলো। ওঃ ভাবতেও মাথাটা টন টন করে উঠলো। এই ববকাটা মেমসাহেবী মাথা দেখে কি ও রাগ করবে, না ঠাট্টা করবে। নিজের মনেই একটু হাসলাম। দশদিন পর আমার গর্ভপাত করানো হলো। তিনমাস হয়েছিল। আল্লাহ্ আর একমাস দেরি হলেই তো ওরা বুঝতে পারতো আর আমাকে বাইরে নিয়ে কি করতো? অস্ফুট চিৎকারে মুখ ঢাকলাম। সিস্টার দৌড়ে এলেন কি হয়েছে? চোখের পানি মুছে বললাম, কিছু না। এরপর সাতদিন বিশ্রাম নিয়ে পথে পা দিলাম। টাকা চাইতেই পেলাম। ওরা বলে

দিলেন বাসা খুঁজে না পেলে যেন ফিরে আসি, ওরা ব্যবস্থা করে দেবেন। বাসার সামনেই রিকশা থেকে নামলাম। কেউ তাকিয়ে দেখলো না। দরজার কড়া নাড়লাম। আম্মা দরজা খুলে দিয়ে এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলাম, ফাল্গুনী? আমি তো জানি না ও বেঁচে আছে কিনা, কার কাছে আছে? মা বললেন, ও ভালো আছে চাচার সঙ্গে বেড়াতে গেছে। মা চা আর মুড়ি খেতে দিলেন। বহুদিন পর তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। বললেন, যাও তোমার ঘরে যাও, গোসল করে কাপড় চোপড় বের করে পরে নাও। মাথার দিকে তাকাতেই বললাম, খুব অসুখ করেছিল আম্মা, হাসপাতালে মাথায় পানি দেওয়ার জন্য চুল কেটে দিয়েছে। আহা, কি হাল হয়েছে আমার মায়ের। আম্মা আমার বাবা-মা তো সবাই ভালো আছে? ওরা তো আর গ্রাম থেকে ফিরে আসেন নি। তোমার মা তো ভাত-পানি ছেড়েছেন তোমার জন্য। ছোট খোকা এলেই ওদের খবর পাঠিয়ে দেবো। ফাল্গুনীকে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার বাপ দিলো না। মিনার মনে হয় একবার ছুটে যায়। তাদের ঐ ছোট বাড়িটায় যেখানে হাসি আনন্দ ছাড়া দুঃখ সে কখনও দেখে নি, আজ তার জন্য মা মরতে বসেছে। মা'তো জানে না তার মেয়ে কতোবার মরেছে আর কেমন লাশ হয়ে ফিরে এসেছে।

অনেকক্ষণ ধরে গোসল করলো মিনা। নিজের পছন্দ মতো শাড়ি, ব্লাউজ পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বসেছে এমন সময় ফাল্গুনী এলো চাচার সঙ্গে। প্রথমে সে মাকে চিনতে পারে নি । কোলে যাবে না। কান্না জুড়ে দিলো। তারপর বোধোদয় হলো। ফাল্গুনীকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভাবলাম আল্লাহ্ ওর জন্যেই তুমি আমাকে ফিরিয়ে এনেছো। লক্ষ শোকর তোমার কাছে। বহুদিন পর একসঙ্গে ভাত খেলাম সবাই। আম্মা, কাল থেকে আবার আমি রাঁধবো, কতো কষ্ট গেছে আপনার। মাগো এ কষ্টের জন্য শরীর ভাঙেনি, দিনরাত তোমার কথা ভাবতে ভাবতে একেক সময় মনে হতো আমি কি পাগল হয়ে যাবো। যখন তিনমাস পার হয়ে গেল, তখন বুঝলাম তুমি আর নেই। যে দিন দেশ স্বাধীন হলো সেদিনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়েছিলাম। যদি তোমাকে বন্দি করে রেখে থাকে তাহলে অন্তত ফাল্গুনীর জন্যেও তুমি ছুটে আসবে। বুড়ো আম্মাকে ভুলে থাকলেও ওকে কি ভুলতে পারো? শাশুড়ি বউ দু'জনেই গলাগলি হয়ে তিনমাসের জমাট বরফ গলিয়ে বুক হালকা করলাম। তখনও কি ছাই জানি এরপর বুকে বরফ যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো জমে থাকবে।

হাসনাত এখন বাড়ি থেকেই যাতায়াত করে। সেও গাজীপুর থেকে পালিয়ে একটা গ্রামে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পর ফিরে এসেছে। এই বিরানপুরীতে আমি আর ছোট খোকা না খেয়ে না ঘুমিয়ে দিন কাটিয়েছি বৌমা। ওঃ! তাহলে বীরপুরুষও পালিয়েছিলেন! শুধু জিদ করে আমার কপালটা পোড়ালো। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

দরজায় কড়া নড়ে উঠলো, ভয়ে আশংকায় আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। আম্মার গলা শুনলাম, বললেন, বড় খোকা দেখো কে এসেছে। দু'পা এগিয়ে আমাকে দেখে হাসনাত ফেটে পড়লো। বললো, তুমি এখানে কেন? মরবার জায়গা পাওনি? ঐ তো ধানমন্ডি লেকে কতো পানি, যাও। কোন সাহসে তুমি আমার বাড়িতে ঢুকেছো। আম্মা ওর মুখে হাত চাপা দিতে গিয়েছিলেন। ও ধাক্কা দিয়ে আম্মাকে ছোট খোকার গায়ের ওপর ফেলে দিলো। ভয় পেয়ে ফাল্গুনী মা, মা চিৎকার করে আমার দিকে হাত বাড়ালো। এক হেঁচকা টানে হাসনাত মেয়েকে সরিয়ে নিলো। না ও তোর মা নয়, ও এক ডাইনি, আমাদের খেতে এসেছে। এতক্ষণে আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড একটা ধমক দিলাম। কাপুরুষ, লজ্জা করে না তোমার আমাকে এ কথা বলতে। কেন আমার বাবাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে? বলো, জবাব দাও? তারপর চাকুরি রক্ষা করতে ছুটলে গাজীপুর। সেখান থেকে শেয়াল কুকুরের গর্তে। ঘরে বুড়ো মা, শিশু কন্যা, স্ত্রী, যুবক ভাই সব ফেলে কেমন নিশ্চিন্তে দশ মাস কাটিয়ে এলে। ওই সময় কি করেছো না করেছো আমরা জানি? রাজাকার হয়েছিলে কিনা তাও তো বলতে পারবো না। যখন বিয়ে করেছিলে, আমার হাত ধরেছিলে, তখন কেন এ দায়িত্ব নিয়েছিলে? তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো, কিন্তু আমিও তোমাকে ঘরে থাকতে দেবো না। হঠাৎ ঘুরে ফাল্গুনীকে কোলে নিয়ে আমি বাইরের দিকে পা বাড়ালাম। হাসনাত আমাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে মেয়েকে কেড়ে নিলো। ছোট খোকা আমার হাত ধরে রাস্তায় পা দিলো। ওর মুখে কথা নেই, কিন্তু হাতটা শক্ত করে ধরা। রিকশা ডাকতেই আমি চোখ মুছে বললাম, ভাই আমি কিন্তু বাবার কাছে যাবো না। ছোট খোকা মাথা নিচু করে বললো, না ভাবি আমি তোমাকে সেখানে নেবো না। চলো ধানমন্ডি পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি করে জানলে আমি ওখানে আছি। বিব্রত ছোট বললো, ওখান থেকে ভাইয়ার নামে চিঠি এসেছিল। আমি লুকিয়ে পড়েছিলাম। তারপর তোমার সঙ্গে দেখা করতেও গিয়েছিলাম। ওরা বললো তুমি হাসপাতালে অসুস্থ। তাই আর দেখা করে আসতে পারি নি। ভাবি আমি একটা চাকুরি পেলেই তোমাকে নিয়ে আসবো। যেমন চাকরিই হোক, পাবো নিশ্চয়ই একটি না একটি। ফাল্গুনীর জন্য ভেবো না খালাম্মার কাছে ওকে রেখে আসবো। মুন্নী আছে, আমি আছি। মার জন্য বাড়ি থেকে চলে যেতে পারি না, না হলে ভাইয়ার সঙ্গে এ বাড়িতে থাকতে আমার রুচি হয় না। বলতে বলতে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পৌঁছে গেলাম। ও মাঝে মাঝে আমার খবর নেবে। আর মনে চাইলেই বাসায় যেতে বললো। আজ হঠাৎ ও কিছু বুঝতে পারে নি। কিন্তু ভবিষ্যতে এমন আর হবে না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো ভাবি। ওর মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে মুখ ঢেকে দোতলায় উঠে গেলাম।

আশ্চর্যজনকভাবে রাতে ভালো ঘুম হলো। আগস্টের পর থেকে এমন নিশ্চিন্ত ঘুম আমি একরাতও ঘুমাই নি। সকালে শরীরটা খুব হাল্কা মনে হলো। মনে হয় সব বন্ধন আমি ছিন্ন করে এসেছি। আমি মুক্ত। আমি আমার নিজের। হয়তো বাবা-মায়ের ওপর অবিচার করলাম। কিন্তু নিজের স্বার্থে আমি মুন্নীর সর্ব সুখ বঞ্চিত করবো কেন? পরে অবশ্য বড়ভাই নিয়মিত এসেছেন, প্রয়োজনে আমাকে সাহায্যও করেছেন অনেক।

আমি সরাসরি মোসফেকা আপার সঙ্গে দেখা করে সেক্রেটারিয়েল ট্রেনিং ক্লাসে ভর্তি হতে চাইলাম। আমি বিএ পাশ শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। বললাম, প্রয়োজনে আমি আপনাকে সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ থেকে সার্টিফিকেট এনে দেবো। উনি বললেন, শুধু বিএ রোল নাম্বার ও বছরটা দিয়ে দাও আমরাই সার্টিফিকেট নিয়ে নেবো। তুমি গেলে দেরি হবে। ভর্তি হয়ে গেলাম। বেইলী রোডে ক্লাস করতে আসতাম। আরও তিন-চারটি মেয়ে ছিল তারা সবাই মেট্রিক পাশ। দশমাস সময় কেটে গেল। কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আমি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে চাকুরি পেলাম। বেতন মোটামুটি মন্দ নয়। উন্নতির সুযোগ আছে। বেতন পাবার পর আপাকে ধরে আমি বেইলী রোডে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে এলাম। আশ্চর্য! এখানে কোনও মেয়ে কোনও দিন বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখায় নি আমার অতীত নিয়ে। সবাই কর্মরত তবুও এর ভেতর আমরা গল্প গুজব করতাম, পাশের মহিলা সমিতিতে গিয়ে নাটকও দেখতাম। শাড়ি কিনতে যেতাম। ১৯৭৫ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিনে বত্রিশ নম্বর গিয়েছিলাম। সবার মাথায় হাত দিয়ে তিনি দোয়া করলেন। অবশ্য আমি নিজেই নিচু গলায় বলেছিলাম, বঙ্গবন্ধু আমরা বীরাঙ্গনা। 'আরে তাইতো তোরা আমার মা।' আজও সেই কণ্ঠস্বর, সেই উন্নত মস্তিষ্ক, প্রশস্ত ললাট আর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ যেন আমার অন্তরে চির ভাস্বর। হারিয়ে গেলেন আমার পিতা যিনি আমাকে দেবীর সম্মান দিয়েছিলেন। আজ মনে হয় এ মাটিতে দয়ার্দ্রহৃদয়, উদার চেতা, পরোপকারীর ঠাঁই নেই। স্বার্থান্ধের হাতে তার নিধন অনিবার্য।

হায়দার অর্থাৎ আমার দেবর, ছোট খোকা, বিকম পাশ করলো বেশ ভালোভাবে। আমার ব্যাংকের কর্তৃপক্ষকে ধরলাম। জানালাম আমার সন্তানের লালন পালনের দায়িত্বভার তারা নিয়েছে। ওনারা সব শুনলেন এবং ছোটখোকাও চাকুরি পেয়ে গেল। আমারই ব্যাংকে। এখন ওর সঙ্গে আমার ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে পরামর্শ করার প্রয়োজন। দু'জনে একটা রেস্তোরাঁয় বসলাম। বললো, ভাবি, এবার তো একটা বাসা ভাড়া নিয়ে আমরা এক সঙ্গে থাকতে পারি। বললাম, পারি, কিন্তু থাকবো না। মাথাটা খুব নিচু করে বললো, ভাইয়া বিয়ে করেছেন, আমাদের বলে নি কিন্তু আমি জানি। জয়দেবপুরেরই একেবারে গ্রামের এক রাজাকারের মেয়ে। ঐ সময় সে ও বাড়িতেই ছিল। তাই আজ মিনার ভাষায় সর্বতোভাবে সে ওদের কর্তা হয়েছে। মিনা মাথায়

হাত দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। সেই হাসনাত কি করে এমন হলো। ওই মায়ের ছেলে? না মিনা আর ভাবতে পারে না। হায়দার বললো, ভাবি, আজ না হয় এসব আলাপ আলোচনা থাক আরেক দিন হবে। ঠিক আছে, বলে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো মিনা। বললো, ছোট চলো একবার ফাল্গুনীকে দেখে আসি, আমার কেমন যেন অস্থির লাগছে। তাই চলো ভাবি। মার অবস্থা ভালো না। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কি হবে ভাবি আমাদের?

সারাটা পথ রিকশায় মিনা চুপ করে বসে রইলো। সমস্ত অতীত ভীড় করে এসে তার সামনে দাঁড়ালো। সেই বিয়ের দিন, তার পরের আনন্দের দিনগুলো। ফাল্গুনীর জন্মের পর সেই উল্লাস। সবই কি কৃত্রিম ছিল না, মেয়েদের জীবন নিয়ে একটা পুরুষ যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। ইচ্ছে মতো তাকে ভোগ করেছে। নতুন খেলনা পেয়ে পুরাতনকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। সে কোথায় পড়লো, ভেঙে কতো টুকরো হলো তার দিকে ফিরে তাকাবারও অবকাশ নেই। কিন্তু ও কি চিরদিন এমনিই থাকবে? নাঃ এসব কি ভাবছে মিনা? তার কাছে হাসনাত মারা গেছে দু'বছর আগে, নতুন করে এ হারাবার শোক কেন?

যথারীতি কড়া নাড়তে আম্মা এসে দরজা খুলে দিলেন। এ কি চেহারা হয়েছে আম্মার! রঙটা যেন পুড়ে কালো হয়ে গেছে, মাথার চুল মনে হয় অর্ধেক শাদা হয়ে গেছে। সে কতো দিন আসে না? মাত্র তো মাস ছয়েক হবে। ধীর পদে মিনা এগিয়ে এসে আম্মার হাত ধরলো। হঠাৎ পাঁচ বছরের শিশুর মতো আম্মা ওর বুকে আছড়ে পড়লেন। আর কত শাস্তি তোমরা আমাকে দেবে বৌমা। বিষ খাইয়ে মেরে ফেলো! বুড়ো মায়ের প্রতি কর্তব্য করো। অনেক কষ্টে মিনা ওকে থামালো, জোর করে বসিয়ে দিলো। বললো, আম্মা, ও ওর কাজ করেছে আমরা আমাদের কাজ করবো। কালই বাসা দেখে আমরা জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাবো। তারপর হায়দারের বিয়ে দিয়ে আপনার ঘর সাজিয়ে দেবো। ফাল্গুনী থাকবে। আমি আসা যাওয়া করবো। অসহায়ভাবে আম্মা মিনাকে ধরে বললেন, তুমি যেও না বউমা, ও আমাকে মেরে ফেলবে। গতকাল এসেছিল, তোমার কাপড় চোপড় গয়নাগাটি নিয়ে যেতে চায়। গয়না আমি আগেই তোমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, ওসব ফাল্গুনীর প্রাপ্য। আর জামা কাপড় সব তোমার বাবার দেওয়া। ওই পশু আমার গায়ে হাত দিয়েছে বলে আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন। শাশুড়িকে শান্ত করে মিনা আজ প্রায় তিন বছর পর বাবার বাড়িতে পা দিলো। সেখানে শুধু কান্না; আনন্দ, না দুঃখের মিনা বুঝতে পারছিল না। এই তিনবছরে মুন্নী অনেক বড় হয়েছে, সুন্দরও হয়েছে। ওর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো মিনা। এ যেন দশ বছর আগেকার সে।

হায়দার বাইরের ঘরে ফাল্গুনীর সঙ্গে খেলছে, মুন্নী ওকে চা দিয়ে এলো। বাবা-

মার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করে বললো, বড়ভাই এলে কথা বলো, তারপর আমাকে জানিও। বাবা তুমি এসো আমার হোস্টেলে। কোনও অসুবিধা নেই। দিন সাতেকের ভেতর ফার্মগেটের বাসা ছেড়ে রামপুরায় বাসা নেওয়া হয়েছে। মায়ের কাছাকাছি এসে আম্মাও অনেকটা ভালো আছেন। এদিকে মুন্নীর সঙ্গে হায়দারের বিয়ে হয়ে গেল। হাসনাতকে কেউ জানাবার প্রয়োজনও মনে করলো না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো মিনা। যাক–সবাই ঘর পেয়েছে। তাকে বাড়ি এসে থাকবার জন্য অনুরোধ করেছে হায়দার, আম্মা এমন কি বাবা-মাও অনেকবার বলেছেন। কিন্তু না, যে ঘর মিনা ছেড়ে এসেছে সেখানে সে আর ফিরে যাবে না।

অফিসে শফিক আর সে পাশাপাশি টেবিলে বসে। অনেকটা অন্তরঙ্গ হয়েছে, তারা নিছক বন্ধু, ঐ পর্যন্তই। একবার কতো সাহস যুগিয়েছে শফিক। কিন্তু মিনা জানে যেদিন তিনি তার সব পরিচয় পাবেন বিদ্যুৎ গতিতে সরে যাবেন। সে পুরুষকে যেটুকু চিনেছে তাতে এর থেকে মহৎ কোনও ধারণা পোষণ করবার কারণ সে খুঁজে পায় নি। তবুও সবাই যখন ঘর পেয়েছে তখন মিনার অবসরও একটু বেড়েছে বৈকি। একদিন শফিকের প্রস্তাব অনুসারে সিনেমাও দেখে এলো। কিন্তু বাইরে আসতেই একটা লোক কুৎসিৎ ইঙ্গিত করে সিটি বাজিয়ে উঠলো। শফিক এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই মিনা তাকে ধরে ফেললো। ছিঃ ইতরের সঙ্গে ইতরামি করলে নিজের সম্মান থাকে? একটু দূরে সে হাসনাতকে সরে যেতে দেখেছে। মরাল কাওয়ার্ডটা সামনে আসেনা কেন? দু'জনে এগিয়ে একটা বেবীতে চড়লো তারপর একেবারে হায়দারের বাসায়। আম্মা, মুন্নী খুব খুশি। ওরা টিভি দেখছিল বন্ধ করে দেওয়ায় ফাল্গুনী কেঁদে ফেললো। মিনা একে একে আম্মা, মুন্নী ও হায়দারের সঙ্গে শফিকের পরিচয় করিয়ে দিলো। ফাল্গুনীকে বললো, তোমার আঙ্কেল শফিক চাচা। ফাল্গুনী হেসে এগিয়ে এসে বললো, শফিক চাচা, খুব ভালো, তুমি টিভি দেখো? বলতেই শফিক উঠে গিয়ে টিভিটা খুলে দিল। ফাল্গুনী মহাখুশি কিছুক্ষণ গল্প করে, চা খেয়ে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শফিক চলে গেল। মিনা রয়ে গেল। বহুদিন পর আম্মা ও ফাল্গুনীর সঙ্গে রাতে ঘুমালো। কাল শুক্রবার অতএব তাড়া নেই। শফিক রাতেই হোস্টেলে ফোন করেছে। ফাল্গুনী স্কুলে ভর্তি হয়েছে। মুন্নী হায়দারের চোখের মণি। বাবা রোজ একবার আসেন ওর টানে। আম্মাও দু'একদিন পর পর ফাল্গুনীকে এসে দেখে যান। বড় ভাইয়ার বিয়ের কথা চলছে। বাবা বলেছেন, এ বিয়েতে মিনা উপস্থিত থাকবে। ইতিমধ্যে হায়দারের কথায় এবং চেষ্টায় মিনা হাসনাতকে তালাক দিয়েছে, তা না হলে ওই পশুটা তার পেছন ছাড়তো না।

সকালে চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে জানালার কাছে বসে মিনা ভাবছিল, মাত্র চারটি বছরে তার জীবনের সব জল ছবি হয়ে মুছে গেল। স্বামী, সন্তান, শাশুড়ি,

দেবর, জা এরা তো প্রকৃত অর্থে আজ তার কেউ নয়। ফাল্গুনীই-বা তার কতোটুকু? কি দিয়েছে সে ফাল্গুনীকে। স্বার্থপরের মতো তাকে দূরে রেখেছে। না, না, জোরে মাথা নাড়লো মিনা, সে স্বার্থপর নয়। একটা সহজ স্বাভাবিক পরিবেশে সে বড় হোক এটাই মিনা চেয়েছিল। আজ মুন্নী, হায়দার ওর বাবা-মা, ও সম্পূর্ণতা পেয়েছে। কিন্তু তাকেও তো এক জায়গায় নোঙর ফেলতে হবে। দেবর জায়ের ঘাড়ের ওপর এসে চড়ে বসা আর ওদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো ব্যাপারে নাক গলানো কি তার উপযুক্ত কাজ? আম্মা বেশ সেবা পাচ্ছেন। আজকাল সে মাঝে মাঝে বাবা-মায়ের কাছে যায়। ওখানে গেলে মনেই হয় না ওর জীবনে এতোগুলো ঘটনা ঘটে গেছে। ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। মুন্নীর ভালো বিয়ে হয়েছে, যখন তখন ফাল্গুনীকে কাছে পাচ্ছেন। তারা এখন সম্পূর্ণ সুখী। কালই মিনা ভেবেছিল আগামী সপ্তাহে ছুটির দিনটা সে বাবা-মার সঙ্গে কাটাবে। মা এখন ছেলের বিয়ের আলোচনায় মত্ত। বাবা মাঝে মাঝে কাছে থেকে বলেন, আরে সবই তো হলো, নিজের কথা কি ভেবেছিস? কেন বাবা, ভালোই তো আছি। আমার তো কোনও অসুবিধা নেই। না, মীনা তুমি এতই যখন বোঝো তখন নিজের ভবিষ্যৎও একটু চিন্তা করো। ফাল্গুনী বড় হবে, মানুষ হবে, বিয়ে হবে, পরের ঘরে চলে যাবে। আম্মা একদিন চোখ বুজবেন। হায়দার মুন্নীরও নিজেদের সংসার হয়েছে। আমি ও তোমার মা যখন থাকবো না, তখন? তখনকার কথাটা ভেবে দেখেছো? হাসে মিনা। ভাববো বাবা, ভাববো।

সত্যিই কাল সারারাত মিনার ভালো ঘুম হয় নি। খুব আজে বাজে স্বপ্ন দেখেছে। শফিক হাবভাবে তাকে ভবিষ্যতের কথা বলতে চেয়েছে। কিন্তু মিনা সাহস করে না। সত্য কথা বলতে কি পুরুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। হাসনাতের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেম ভালোবাসা বিশ্বাস সব কিছুরই মৃত্যু হয়েছে। তবে ওর বাবার কথাটাও ফেলবার নয়। সবাই তো একদিন নিজের বৃত্তে স্থির হবে সেদিন তার কি হবে? না আজ মন দিয়ে শুনবে শফিক কি বলতে চায়।

আশ্চর্য! শফিক আজ অফিসে আসে নি। কোনও দরখাস্তও পাঠায় নি। শফিকের সঙ্গে তার সৌহার্দ্যের কথা অনেকেই জানে। তাই দু'চার জন তাকে প্রশ্ন করলো, শফিক সাহেবের কি হয়েছে? গম্ভীর মুখে উত্তর দিলো, জানি না। ছুটির আধঘণ্টা খানেক আগে হায়দার এসে দাঁড়ালো। ভাবি একটু আগে বেরুতে পারবে, কিছু কথা আছে। মিনার হাত-পা কাঁপছে। জীবনে আর কোনও নির্মম সত্য সে শুনতে চায় না। তাড়াতাড়ি হাতের কাগজগুলো গুছিয়ে নিয়ে বললো, চলো। দু'জনে একটা রেস্তোরাঁ পর্যন্ত হেঁটে এলো। কারও মুখে কোনো কথা নেই। হায়দার চিরকালই কম কথা বলে। বসে চায়ের অর্ডার দেওয়া হলে মিনা হায়দারের হাতটা চেপে ধরলো, কি হয়েছে ছোট? আমার ফাল্গুনীর কিছু? আরে না না, তুমি এতো ভাবতে পারো ভাবি।

ফাল্গুনীর কিছু না হলে তোমার ছোট অফিসে আসতে পারে না? বোসে চা খাও, সব বলছি। চায়ে চুমুক দিতে একটা স্বস্তির আঃ সূচক শব্দ করলো মিনা। নাও, এখন বলো আমি তৈরি, হেসে বললো মিনা। হায়দার গম্ভীর মুখেই বললো, ভাবি শফিক ভাইকে গুণ্ডারা ছুরি মেরেছে। মুহূর্তে চোয়াল শক্ত হলো মিনার। কেন? কি করেছিল সে? কিছুই করে নি। যারা মেরেছে তাদের দু'জন ধরা পড়েছে। একজন ভাইয়ার নাম বলেছে। দু'হাতে মাথা চেপে মিনা শুধু উচ্চারণ করলো ছিঃ ছিঃ ছিঃ এতো নিচে নেমে গেছে ওই লোকটা। তারপর? তারপর কি হলো? শফিকের কোথায় লেগেছে? ডান হাতে ভালোমত জখম হয়েছে। বুকে মারতে চেয়েছিল, পারে নি। শফিক ভাই পুলিশকে বলেছে সে কাউকে চেনে না। হয়তো-বা টাকা-পয়সার জন্যে করেছে। কিন্তু আমি জানি কদিন ধরেই ভাইয়া শফিক ভাইয়ের পেছনে লেগেছে। আমি কাল রাতেই জয়দেবপুর গিয়ে তাকে ধরেছি। বলেছি, শফিক ভদ্রলোকের ছেলে তাই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতে-জানো ভাবি আমার কথা শেষ করতে দিলো না আমার পা দুটো ধরে হাউ মাউ করে কাঁদলো। বললাম, কাঁদো তুমি যা করেছো তাতে তোমার বাকি জীবনভরই কাঁদতে হবে। তবে আমাদের কাঁদাবাঁর চেষ্টা করো না, তাহলে জেলের ভাত ছাড়া তোমার জন্য আর কোনও পথ থাকবে না। আসলে চাকুরি যাবার ভয়ে অস্থির, আর কোনও দিন এ পথ মাড়াবে না। ওর কথা শেষ হলে মিনা আস্তে আস্তে বললো, কি মানুষ কি হয়েছে–সংসর্গই সব চেয়ে বড় কথা।

ভাবি চলো এবার শফিক ভাইকে একটু দেখতে যাওয়া দরকার। মিনা সজোরে মাথা নাড়লো, না না, সে আমি পারবো না ছোট। কোন মুখ নিয়ে সেখানে যাবো? তার মা কি ভাববেন? কিছু নয়। চলো আমার সঙ্গে। তুমি যে কিছু জানো তা যেন শফিক ভাই বুঝতে না পারেন। তাহলে আমি খুব ছোট হয়ে যাবো। অগত্যা দু'জনে উঠলো। হায়দারের সঙ্গে একটা বেবীতে উঠলো। শফিক থাকে সিদ্ধেশ্বরী। একটা বহুতল বাড়ির তেতলায়। সুন্দর ফ্ল্যাট। কলিং বেল টিপতেই একজন বৃদ্ধবয়সী মহিলা দরজা খুলে দিলেন। ছোট ওর পূর্ব পরিচিত মনে হলো। কারণ তিনি সাগ্রহে বললেন, এসো বাবা, এসো। ছোটর গলা ভারি, খালাম্মা, মিনা নিচু হয়ে সালাম করতে গেলে উনি হাত দুটো ধরে ওকে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, এসো মা, দেখতো কেমন গেরো। এতো বলি সাবধানে থাকিস, তোর মাথার উপর কেউ নেই। কার সঙ্গে কথা বলছো মা? বলতে বলতে বছর কুড়ি একুশের একটি ছেলে এসে ঘরে ঢুকলো। এই যে আয়, হায়দারের ভাবী এসেছে। আসসালামু আলাইকুম ভাবি। আসুন আসুন ভাইয়া ও ঘরে। রফিকের মুখে ভাবি সম্বোধন কেমন যেন লজ্জায় কুঁকড়ে যায় মিনা। কারণ সেও বোঝে না। ঘরে ঢুকতেই শফিক শোয়া থেকে উঠে বসলো। মা হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠলেন। রফিক ধরে বসিয়ে দিলো। বিছানার পাশে চেয়ারে বসলো মিনা ·

কেমন যেন অপরাধের গ্লানিতে চোখ তুলতে পারছেনা সে। শফিক বললো, ও কি? আমার কিছু হয় নি। ভালোভাবে গুলিটা বের করে ফেলেছে। তবে হাসপাতালে থাকতে বলেছিল... ওর কথা শেষ করতে দিলো না রফিক। না উনি থাকলেন না। আশ্চর্য লোক তুমি ভাইয়া!

এসময় চা দিয়ে গেল কাজের মেয়েটা। চা খেতে খেতে শফিকের মা অনেক কথা বললেন। বললেন, দেখো তো মা, তার ভাঙা মন সে আর বিয়ে করবে না, কি এমন হয়েছে? এমন তো সব ঘরেই হচ্ছে এখন। তোমরা তো একসঙ্গে কাজ করো। একটু বুঝিয়ো তো মা। শফিককে আরোগ্য লাভের শুভেচ্ছা জানিয়ে মিনা বেরিয়ে এলো। হায়দারকে ছেড়ে দিয়ে নিজেই একা রিকশা নিয়ে হোস্টেলে ফিরে এলো। কি হয়েছে শফিকের পরিবারে যেজন্য সে বিয়ে করতে চায় না। যাকগে আমি মরছি নিজের জ্বালায়। হোস্টেলে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলো তিনবছর তো হয়ে এলো। এ বছরে তো হোস্টেলও ছাড়তে হবে। একটা এক ঘরের ফ্ল্যাটের চেষ্টা করতে হবে।

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ ও মন নিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লো। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না, কেউ একজন বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে গেছে। ঘড়িতে তিনটা। উঠে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় বদলে আবার শুয়ে পড়লো সে। ঘুম ভাঙলো সাড়ে সাতটায়। কোনও মতে স্নান সেরে তৈরি হয়ে অফিসে ছুটলো সে। ফোন এলো শফিকের কাছ থেকে, আজ যেতে বলেছে। মিনা বললো, আজ সম্ভব হবে না। অনেক কাজ, কাল যাবে। ইচ্ছে করে সে সময় নিলো। তাছাড়া সত্যিই আজ তার বিশ্রাম প্রয়োজন নইলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। আজ তার মনে পড়ছে গত সপ্তাহে শনিবার বিকেলে সে আর শফিক যখন অফিস থেকে বেরুচ্ছিল তখন আরও দু'তিনটা লোকের সঙ্গে সে হাসনাতকে যেন দেখেছিল। ঐদিন সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু কাল সে নিশ্চিত যে হাসনাত শফিককে চেনাবার জন্য হয়তো নিজেই এসেছিল, কিন্তু কেন? স্ত্রী-সন্তানকে পথে ফেলে দিয়ে যেমন ইচ্ছে একজনকে ঘরে নিয়ে সুখেই তো আছে সে। তার ওপর আমি সুখী হতে চাইলেই তার আক্রোশ। না, মিনা এবারে বাবার কথাই শুনবে। দেখি শফিকই বা কি বলে। হায়দার বলা সত্ত্বেও মিনা আর শফিকদের বাড়িতে গেলো না। ওর মার এক কথা. ও আর বিয়ে করতে চায় না। তাহলে কি শফিক বিবাহিত? স্ত্রী জীবিত না মৃত? কে জানে দেখি না শফিক তাকে কিছু বলে কিনা। মনে হয় বলবে কারণ কদিন আগেই তাকে দু'একদিন বলেছে, চলো মিনা আমরা কোথাও যাই একটু বসে গল্প করি। তোমাকে যে আমার অনেক কিছু বলবার আছে। মিনা গায়ে লাগায় নি। শুধু শুনেছে ওর বাবা ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন। মাত্র বায়ান্ন বছর বয়সে জিপ এ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। ওরা দুই ভাই আর মা। মা একটা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। পরবর্তীতে বাবার রেখে যাওয়া টাকা পয়সা এক করে ঐ

ফ্ল্যাটটা কিনেছেন। তাকে মানুষ করেছেন। ছোট ভাই এমবিএ পড়ে আগামী বছর পাশ করে বেরুবে, তারপর আর তাদের কোনও সমস্যা থাকবে না। মিনা বোঝে তাকে এসব কথা বলবার অর্থ কি? এও এক রকম চাকুরির দরখাস্তের সাথে বায়োডাটা দেওয়া। মিনা সবই বোঝে কিন্তু আজও পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

দিন দশেক পর শফিক জয়েন করলো। মুখটা বেশ ভার। মিনা বোঝে শফিকের এ সঙ্গত অভিমান। আস্তে আস্তে মেঘ কেটে গেলো। শফিকই তাকে চায়ের দাওয়াত করলো। কিছুটা হেঁটে গিয়ে দূরে একটা রেস্তোরাঁয় বসলো ওরা। চা সামনে নিয়ে শফিকই কথা শুরু করলো, মিনা, আজ তোমাকে একটা কথা বলা আমি খুবই সঙ্গত মনে করছি। কারণ আমি তোমার কাছে একটা আবেদন করবো তার আগে আমি নিজেকে তোমার কাছে পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরতে চাই। মিনা, আমি বিবাহিত। একটু যেন চমকে উঠলো মিনা, দৃষ্টি প্রসারিত করে যেন শফিককে ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলো। ছ'বছর আগে আমি সালেহাকে বিয়ে করি। মন জানাজানি শুরু হয় তারও আগে। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে বলে প্রথমটা মায়ের আপত্তি ছিল। পরে অবশ্য ওর ব্যবহারে মানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর, সালেহা মাকে ঠিক সইতে পারলো না। পদে পদে মাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে লাগলো, আমার মুখের দিকে চেয়ে মা সবই সয়ে গেলেন। শেষে না পেরে একদিন আমাকে বললেন, শফিক তুই আলাদা বাসা নে। আমাদের গরিবী হাল বৌমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। আমি চমকে উঠলাম, তা হয় না মা, তুমি যে কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের মানুষ করেছো, আজ তোমাকে ফেলে যাবো আমি? কিন্তু বাবা, আমিও তো আর পারছি না। তোর বাবা আমাকে হীরা জহরৎ না দিতে পারেন, কিন্তু কোনও দিন অসম্মান করেন নি। শফিক নত মস্তকে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অফিস থেকে ফিরে এসে চা খাবার সময় সালেহাকে বলতেই সে বারুদের মতো ফেটে পড়লো। মায়ের ব্যাপার নিয়ে প্রচন্ড রকম কথা কাটাকাটি হলো। শেষে মা এসে ওদের শান্ত করলেন। বললেন, বউমা, কোনও রাগ বা ক্ষোভ থেকে বলছি না, এ বাড়ি আমার। আমি পথে পা দেবোনা। শফিক উপার্জনক্ষম তাই তাকে বলেছি তোমাকে নিয়ে অন্য কোথাও থাকতে। আমি বুঝতে পারছি তুমি আমাকে সহ্য করতে পারছো না। যখন তখন অপমান করছো। আমার আরেকটি ছেলে আছে সে যদি তোমাকে অপমান করে সেটা হবে আমার জন্য আত্মঘাতী। তাই একথা বলছেন, উত্তর দিলো সালেহা, আপনারা অর্থের দিক থেকে দরিদ্র এটা জানতাম, কিন্তু আপনাদের মন এতো ছোট তা আমার জানা ছিলো না। আমি আজই মায়ের বাড়িতে চলে যাবো। মা হাতে ধরে সাধতে গেলে হাত ছেড়ে আনতে গিয়ে মাকে একটা ধাক্কা দিলো। মা পড়ে গেলেন। দু'ভায়ে মাকে ধরে তুলে তার ঘরে নিয়ে গেলাম। আমার ঘরে এসে দেখি সালেহা নেই। পরে একদিন আমি অফিসে থাকা

অবস্থায় এসে তার জিনিসপত্র সব নিয়ে গেল। মাসখানেক পর আমি তালাকের চিঠি পেলাম। নিঃশব্দে তাকে মুক্তি দিয়েছি কারণ আমার মায়ের অপমান সহ্য করা আমার জন্য যেমন কঠিন, মাকে ছেড়ে যাওয়া কঠিনতর। প্রায় চার বছর হয়ে গেল আমাদের জীবন এভাবেই চলে যাচ্ছে মিনা। সব শুনেও যদি তুমি আমাকে গ্রহণ করো নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো। সেদিন ওখানেই শেষ হলো।

পরদিন শফিককে বললাম, আজ আমি চা খাওয়াবো চলো। শফিক উৎফুল্ল মেজাজেই চললো। চা নাশ্‌তা সামনে নিয়ে বললাম, শফিক আগে খেয়ে নাও তারপর আমার কাহিনী শুরু করবো। কারণ আমি তোমার মতো ভালোমানুষ নই। শফিক খাবারে হাত দিলো। মিনা ওর হাতটা চেপে ধরলো, ওকি? অমন করে খাচ্ছ কেন? তুমি হুকুম করলে তাই। মিনা হেসে ফেললো, বেশ খাও। খাওয়া শেষ হলে শফিক একটা সিগারেট ধরালো, তারপর সুখটান দিয়ে বললো, কে আরম্ভ করবে, তুমি না আমি? না না তুমি তো কাল বলছো, আজ আমার পালা। তোমার অনুমতি পেলে আজকের পালাটাও আমি গাইতে পারি—ওপর দিকে চোখ তুলে বললো শফিক। তার মানে? মিনার কণ্ঠে বিস্ময়। তাহলে শোনো, মিনা নামে মালিবাগে এক দুরন্ত মেয়ে ছিল। বিয়ে হলো তার হাসনাত নামের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে যিনি অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে চাকুরি করেন। তাদের একটি ফুট ফুটে সুন্দর মেয়ে হলো নাম তার ফাল্গুনী। মিনা হা করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দেশে বর্গী এলো, মিনাকে বর্গীরা ধরে নিয়ে গেল, তাদের কয়েদখানায় চারমাস আটকে রাখলো। মিনা শফিকের হাতটা জোরে চেপে ধরলো। শফিক ধীরে ধীরে তার হাতটা আলগা করে বলে চললো, তারপর মেয়েটি বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেলো। কিন্তু অপবিত্র আখ্যা দিয়ে স্বামী তাকে ঘর থেকে বের করে দিলো। স্বামী ততোদিনে অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। মেয়েটি শাশুড়ি দেওরের কাছে সন্তান রেখে সরকারি সহায়তায় পড়াশুনা করলো, চাকুরি নিলো। এখন বেশ ভালোই আছে তবে একটি সূক্ষ্ম বেদনার কাঁটা, মেয়েটি তার কাছে থাকে না। কিন্তু তার ছোট বোনের সঙ্গে দেওরের বিয়ে হয়েছে। মেয়েটি চাচা চাচীকেই বাবা মা জানে। তাদের সুখের সংসারে আরেকটি মেহমান এসেছে ছেলে। কিন্তু দু'জনে সমান আদরে বড় হচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে... স্থান কাল ভুলে গিয়ে মিনা শফিকের মুখ চেপে ধরলো। শফিক থেমে বললো, কোনও রকম ভুল-ভ্রান্তি হয় নি তো? হুবহু বলতে পেরেছি? জ্বী, একেবারে দশে দশ বললো মিনা। কিন্তু তোমাকে এসব কথা কে বলেছে? ছোট? না মিনা, বড়ই এসে বলেছেন অনুগ্রহ করে। তোমার মতো বাজে মেয়ের থেকে যেন দূরে থাকি আমি। দূরে গেলে না কেন? উৎসুক দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করে মিনা। সবার বিচার তো একরকম হয় না। তার কাছে যে খারাপ আমার কাছে সে শুধু ভালো নয়, খুব বেশি ভালোও তো হতে পারে। চলো

আজ উঠি। মার শরীরটা বিশেষ ভালো নেই। দরকার হলে ডাক্তার ডাকবে। আমি আসবো তোমার সঙ্গে, জিজ্ঞেস করে মিনা। এলে খুশি হবো। খুশি মনে দু'জনেই একটা রিকশায় বসলো। এক রিকশায় দু'জনেই এই প্রথম।

এরপর আর দেরি হয় নি। মুন্নী ও হায়দারের বলে এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে রেজিস্ট্রি করে একেবারে শফিকের বাড়িতে উঠেছে। ওর মা আগে থেকেই খুব খুশি ছিলেন। এখন আনন্দে আত্মহারা হলেন। বীরাঙ্গনা মিনার সংগ্রাম শেষ হলো।

কিছুদিন আগে এক বিয়ে বাড়িতে দেখা। ওর সঙ্গে অবশ্য প্রায়ই আমার দেখা হতো বেইলী রোড কর্মজীবী হোস্টেলে। আমার ভগ্নীতুল্য বান্ধবী জেরিনা তখন ওখানে কাজ করতো। মাঝে মাঝে ওর ঘরে গিয়ে বসতাম। চোখ নিচু করে মিনা বেরিয়ে যেতো অথবা ঘরে ঢুকতো। কিছু জিজ্ঞেস করলে খুব কুণ্ঠিতভাবে জবাব দিতো। বলতাম, জেরিনা এই মেয়েগুলোর বুকে আগুন জ্বেলে দিতে পারিস না, ওরা কেন মাথা নিচু করে চলে? নীলিমাদি তোমাদের এ সমাজ ওদের চারিদিকে যে আগুন জ্বেলে রেখেছে তার উত্তাপেই ওরা মুখ তুলতে পারে না। বেশি বেশি বক্তৃতা দিও না। ওদের সম্পর্কে জেরিনা খুব বেশি স্পর্শকাতর ছিল। তবে জেরিনা ওর বিয়ের খবর শুনে গিয়েছিল এবং ওদের একদিন নিজের বাড়িতে দাওয়াত করে খাইয়েছিল। আমার কিন্তু সেটুকু সৎ সাহস বা আগ্রহ হয় নি। মিনা যেনো আগের চেয়েও সুন্দরী হয়েছে। খোঁপায় ফুল, একটা হাল্কা নীল রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে। রূপে যেন দশদিক আলো হয়ে গেছে। খুব ব্যস্ত। বছর দশেকের একটি মেয়েকে আমার কাছে এনে বললো, সালাম করো খালামনি। আপা, এ শ্রাবণী আমার মেয়ে। সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়লো ওর তো ফাল্গুনী নামে একটি ফুটফুটে মেয়ে ছিল। নিজেকে সংযত করলাম। বললাম, কার বিয়েতে এতো ব্যস্ত তুমি? কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, আমার মেয়ের, আর জোরে বললো, আপা আমার দেওর আর বোনের বড় মেয়ে ফাল্গুনীর বিয়ে। আনন্দ বেদনায় মিনার চোখে বান ডেকেছে। উঠে দাঁড়িয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। চোখ মুছে বললো, দোয়া করবেন মায়ের দুর্ভাগ্য যেন ওকে স্পর্শ না করে। কঠিন গলায় বললাম, দুর্ভাগ্য? কি বলছো তুমি মিনা। ঠিকই আপা, আমি মাফ চাই। আমি বীরাঙ্গনা, মহাপুরুষের বাক্য ব্যর্থ হয় নি। আজ আমি মাতৃগর্বে গর্বিত এক মহিয়সী নারী। আপা আমি খুব খুশি। মিনা পা ছুঁতে গেল। ওকে তুললাম। বহুদিন পর হৃদয়ের একটা বোঝা কমে গেল। তাহলে এ বাংলাদেশে এখনও সৎ মানুষ আছে যারা মিনার মতো মেয়েকে নিয়ে সুখের নীড় রচনা করবার স্পর্ধা ও সাহস রাখে। মনে মনে উচ্চারণ করলাম 'জয় বাংলা, বাংলার জয়।'